প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৫৯

প্রকাশক :

এন. চক্রবর্তী

অমর সাহিত্য প্রকাশন

৭ টেমার লেন,

কলিকাতা

মুদ্রাকর :

এককড়ি ভড়

নিউ শক্তি প্রেস

১০ রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন

কলিকাতা ৬

আলোকচিত্র :

শ্রীমতী সুজয়া গুহ

শ্রীশম্ভুনাথ দাস

ও

শ্রীদীপককুমার সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ-শিল্পী :

শ্রীঅজিত গুপ্ত

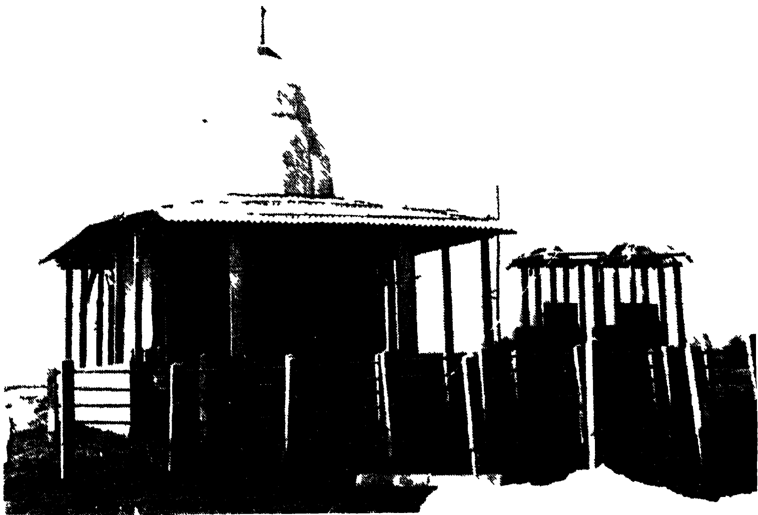
পনেরো টাকা



সাগর বাতিঘর



কপিলমুনি—গঙ্গাসাগর



কপি-



ডায়মণ্ড হারবার জেটিঘাট



কাকদ্বীপ—সামনে পুল দেখা যাচ্ছে



মুড়িগঙ্গা, ওপারে কাকদ্বীপ

পনেরো টাকা



মকর সংক্রান্তিতে কপিল মুনির মন্দির। বাঁদিকে গঙ্গা ও ভগীরথ, মাঝে কপিল মুনি,



জনহীন গঙ্গাসাগর—দূরে
কপিলমুনির মন্দির



যাত্রীনিবাস—
সাগর মেলা



'সব তীর্থ বার বার গঙ্গাসাগর একবার'

'গঙ্গা মাঈকি…জয়।…মাঈকি…জয়। গঙ্গা…।'

সেই একই কথা, একই স্বর, একই আবেগ। তবু তার সঙ্গে এর কত তফাৎ। সে কোথায়, আর এ কোথায়! সেদিন আর এদিন?

সেদিন গুটিকয়েক দামাল মানুষের মাতৃবন্দনায় গিরিতীর্থ গোমুখী মুখরিত হয়েছিল। তারপরে আমরা তুষার-বিগলিত ধারায় ভাগীরথীর উৎসে অবগাহন করেছিলাম। মহালয়ার পুণ্যপ্রভাতে পুণ্যতীর্থে পুণ্যস্নান করে পুনরায় মাতৃবন্দনা করেছিলাম—'গঙ্গা মাঈকি…জয়।'

সেদিন জানতাম, গোমুখী দর্শনের ভাগ্য সবার হয় না। জানতাম, সারা জীবনে যেখানে কিছুক্ষণের জন্য পদার্পণ করা পরম সৌভাগ্য, সেখানে আমি চৌদ্দটি রাত কাটিয়েছি।

জানতাম যে শুধু সেখানে নয়, পতিতপাবনীর পবিত্র ধারায় বিধৌত বিভিন্ন পুণ্যতীর্থে পুণ্যস্নান করার সুদুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমি স্নান করেছি গঙ্গোত্রী ও উত্তর কাশীতে, স্নান করেছি হরিদ্বার, প্রয়াগ ও বারাণসীতে, রাজমহল, নবদ্বীপ ও কলকাতায়—আরও কত জায়গায়।

তাহলে সেদিন কেন মন ভরে নি আমার?

এখনও যে বাকি আছে। সব হয়েছে কিন্তু গঙ্গাসাগর তো হয় নি। 'সব তীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর একবার।'

তাই এ বছর মহালয়ার শুভ প্রভাতে তুষারতীর্থ গোমুখীতে দাঁড়িয়ে ত্রিভুবনতারিণীর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেছিলাম—মা, এবার মকরসংক্রান্তিতে আমি যেন সাগরসঙ্গমে স্নান করতে পারি। একই বছরে গোমুখী ও গঙ্গাসাগরে স্নান করতে পারা পরম সৌভাগ্যের।

সেই সৌভাগ্য অর্জনের জন্যই আজ শত শত কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছি আমি। সেই একই কথা একই আবেগের সঙ্গে একই স্বরে গেয়ে চলেছি—'গঙ্গা মাঈকি—জয়।' কিন্তু কোথায় গোমুখী আর কোথায় গঙ্গাসাগর!

দূরত্ব যাই হোক, উচ্চতার তারতম্য ও প্রাকৃতিক পার্থক্য যতই থাক, দুয়ের মাঝে যে বয়ে চলেছে গঙ্গা, একই গঙ্গা—দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গা।

বেলাভূমিতে পড়লে কাদা লাগছে, আর বাঁধানো তীরে পড়লে ছড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে কেউ বড় একটা মনে কিছু করছেন না। গঙ্গামাটিতে গড়াগড়ি খেলে অক্ষয় পুণ্যলাভ। আর এ ঘাটে রক্তপাত হলে তো অবশ্যই মোক্ষলাভ। রক্তপাত ছাড়া কবে কোথায় কোন্ ভাল কাজটি হয়েছে ?

তাই বোধ হয় যাত্রীদের কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু কর্তৃপক্ষকে এই উদাসীনতার জন্য ধন্যবাদ দেওয়া সম্ভব নয়। টিকা ও ইঞ্জেকশান দেবার ব্যবস্থা এবং কয়েকজন কনেস্টবল মোতায়েন করলেই যে সরকারী কর্তব্য ফুরিয়ে যায় না, এটি তাঁদের অনুধাবন করা প্রয়োজন। সব চেয়ে বিস্ময়কর এই ঘাটের ঠিক বিপরীত দিকে, পথের পাশেই স্থানীয় শাসকের কোয়ার্টার। সে বাড়ির ছাদে দাঁড়ালে যাত্রীদের দুর্গতি দর্শন করা কষ্ট নয়।

অবশ্য এ ঘাট যদি অস্থায়ী হত, অর্থাৎ কেবল মেলার জন্যই মানুষের প্রয়োজনে আসত, তাহলে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাকে হয়তো বরদাস্ত করা যেতে পারত। কিন্তু এটি বারো মাসের ঘাট। সারা বছর এখান থেকে লঞ্চ ও নৌকো যাতায়াত করে চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে। কাজেই এই জেটি-ঘাটের প্রতি এমন উদাসীন থাকার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

নৌকোর দোলায় আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে। কোথা থেকে হঠাৎ কতগুলি বড় বড় ঢেউ এসেছে ছুটে। আমার প্রশ্ন শুনে মাঝি হাসে। বলে, "না কর্তা, তুফান না। খানিক আগে যে বড় জাহাজটা চলে গেল, এ তারই ঢেউ।"

"কিন্তু জাহাজখানা তো অনেক দূরে চলে গেছে। এতক্ষণ পরে তার ঢেউ এল !" আমি কলকাতাগামী জাহাজখানির দিকে তাকাই।

মাঝি আবার হাসে। বলে, "তাই তো হবে বাবু। জাহাজটা যেতেছে কত দূর দিয়ে ! ঢেউগুলির এখানে আসতে সময় লাগবে না ?"

তাও তো বটে। জলের দেশের মানুষ হয়ে আমার তো এমন অজ্ঞ হওয়া উচিত নয়। তাই চুপ করে ঢেউ দেখতে থাকি। অনেকদিন এমন ঢেউয়ের বুকে বসে দোল খাই নি। ভাবতেও হাসি পাচ্ছে—কালীগঙ্গা, বলেশ্বর কীর্তনখোলা, কালাবদর, তেতুলিয়া, ইলশা ও মেঘনা-তটের মানুষ হয়ে আজ আমি এই ঢেউ দেখে মোহিত হচ্ছি ! কিন্তু কি করব, সে ঢেউয়ের সঙ্গে সব সম্পর্ক যে ঘুচে গেছে সারাজীবনের মত। তাই দুধের সাধ ঘোলে মেটাচ্ছি।

আচ্ছা ঐ ঢেউয়ের দোলায় প্রথম যখন নৌকোটা দুলে উঠেছিল, তখন কি আমি ভয় পেয়েছিলাম? অন্যান্য যাত্রীদের মত আমিও কি আঁতকে উঠেছিলাম? আমার কি একেবারেই খেয়াল ছিল না যে ঐ ঢেউয়ের সাধ্য নেই, এত বড় নৌকোটার কোন ক্ষতি করে?

আমাদের নৌকোখানি বিরাট। হাজার দুয়েক মণ মাল বইতে পারে। প্রায় ষাট ফুট লম্বা ও পনেরো ফুট চওড়া। শ'দুয়েক যাত্রী স্বচ্ছন্দে সওয়ার হতে পারে। ছখানি হাল ও দুখানি পাল। মাঝি ও মাল্লারা মিলে দশজন।

এমন নৌকোর কিন্তু আজ অভাব নেই এখানে। তবে সব নৌকোই যাত্রীতে বোঝাই হয়ে গেছে। যাঁরা আমার মত আজ সকালে কলকাতা থেকে এসেছেন, তাঁদের অনেকে এখনও জায়গা পান নি। পাবেন কেমন করে? পরশু বিকেল থেকেই যে জায়গা দখল শুরু হয়েছে। কাল সারারাত ধরে যাত্রী এসেছে। তবে আমার ভাগ্য ভাল। জায়গা পেয়েছি।

গলুইতে বসে আছি। বসে বসে চারিদিক দেখছি আর গঙ্গার জয়ধ্বনি শুনছি—'গঙ্গা মাঈকি···জয়।' যে জয়ধ্বনির সঙ্গে স্বর মেলাতে আজ সহস্র সহস্র যাত্রী এসে সমবেত হয়েছে এই অবহেলিত জেটি ঘাটে।

ঢেউ কমে যেতেই আবার একচোট যাওয়া-আসা আরম্ভ হল। এতক্ষণ পাড়ের যাত্রীরা তীরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলেন আর নৌকোর যাত্রীরা হাঁটু মুড়ে বসে মনে মনে মা-গঙ্গার করুণা ভিক্ষা করছিলেন। এবারে পাড়ের যাত্রীদের মজা দেখার পালা শেষ হল, তাঁরা উঠে এলেন নৌকোয়। আর নৌকোর যাত্রীদের ভয় গেল কেটে, তাঁরা নেমে গেলেন পাড়ে।

কিন্তু কেন? কেনা-কাটা কি এখনও শেষ হয় নি? এসে থেকেই তো দেখছি, সমানে কেনা-কাটা চলেছে। বড় রাস্তার ওপরেই বাজার বসেছে। তরি-তরকারি, ফল-মূল, বাসনপত্র, কম্বল-শতরঞ্জি, জুতো-লাঠি, মুনি-মনোহারি —সব রকমের জিনিস পাওয়া যাচ্ছে এই বাজারে।

প্রায় প্রত্যেকেই দেখছি একটা জিনিস কিনে আনছেন—মুড়ি। খই এবং চিড়াও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে অনেকেই নজর দিচ্ছেন না। চাল-ডাল তেল-নুনেরও তেমন সমাদর নেই। রান্নায় অনেক ঝমেলা, তার চেয়ে মুড়ি চিবিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকো।

মুড়ির পরেই পান-সুপারি, দোক্তা-জর্দা, বিড়ি-সিগারেট ও দেশলাইয়ের স্থান। হবেই তো, খিদের খাদ্যের চেয়ে নেশার খাদ্যের প্রয়োজন কিছু কম নয়!

বুড়ো মাঝি হাঁক দেয়, "বাবুমশায়রা আর নিচে নামাবেন না। ভাটা হয়ে গেছে, এবারে নৌকো ছাড়ব। আরে ও মনসা, একবার নিচে যা, বাবুদের আর মাঠানদের তাড়াতাড়ি আসতে বল্।" বুড়ো একবার থামে। তারপরে আবার ডাক দেয়, "আরে ও গণশা, এইবার আয়োজন করে ফেল্, নে হাত চালা।"

কিসের আয়োজন? এখুনি জানতে পারব। নীরবে ওদের দেখে যেতে থাকি।

এই বোধ হয় গণেশ। হ্যাঁ, সে-ই হবে। সে ভেতর থেকে একটি নারকেল ও একখানি কাঁসর নিয়ে আসে। বুড়ো মাঝির হাতে নারকেলটি দেয়। মাঝি-মাল্লারা সব এসে জড়ো হয়েছে এখানে—নৌকোর গলুইতে।

বুড়ো মাঝি বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। জোয়ান মাঝি ও মাল্লারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে—যেন সেই অব্যক্ত কথা শোনার চেষ্টা করছে। আমরাও নীরবে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু কেউই বুড়ো মাঝির কথা কিছু বুঝতে পারছি না। বোধ করি সেটা তার ইচ্ছাও নয়।

খুব বেশিক্ষণ অবশ্য আমাদের এ অবস্থার মধ্যে থাকতে হল না। বুড়ো মাঝি মুখ নাড়ানো বন্ধ করল। তবে তার কাজ শেষ হল না। বরং এতক্ষণে আসল কাজ আরম্ভ হল বলা যেতে পারে। সে নারকেল ভেঙে জলটুকু গলুইয়ের মাথায় ঢেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় কাঁসরধ্বনি। বেদম জোরে কাঁসি পেটাচ্ছে গণেশ। মহিলা যাত্রীরা উলুধ্বনি করে ওঠেন। মুহূর্তের মধ্যে একটা উৎসবের পরিবেশ সৃষ্ট হয় আমাদের নৌকোয়।

বুড়ো মাঝি ভাঙা নারকেলটা জলে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, "বদর বদর বদর…"

তার সহকারীরাও গলা মেলায়, "বদর বদর বদর…"

বুড়ো মাঝি চুপ করে। সঙ্গে সঙ্গে কাঁসর থামে। উলুধ্বনি থেমে যায়। আবার সবাই চুপচাপ। কিন্তু এ নীরবতা ক্ষণস্থায়ী। বুড়ো মাঝি প্রথমে জলধিপতি বরুণের করুণা ভিক্ষা করে। তারপরে উচ্চকণ্ঠে পীর গাজি মিঞা, পীর হাথিলী, পীর জহল, পীর মহম্মদ ও পীর বদরউদ্দীনের নাম করে তাঁদের কাছে বিঘ্নহীন যাত্রার জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। প্রার্থনা-শেষে আমরাও বুড়ো মাঝির সঙ্গে পাঁচপীরের উদ্দেশে আমাদের প্রণাম জানাই।

সবশেষে আবার সেই জয়ধ্বনি—গঙ্গা মাঈকি…জয়।…

একবার, দুবার, তিনবার—বারংবার। কেবল আমাদের নৌকোতে নয়, এই জেটি ঘাটে নয়, পথের ঐ গুটিকয়েক বাসে কিম্বা চলমান যাত্রীদের কণ্ঠে নয়, আসমুদ্র হিমাচল আজ এই জয়গানে ভরে উঠেছে, মাতৃবন্দনায় মুখরিত হচ্ছে আমাদের মাতৃভূমি—'গঙ্গা মাঈকি…জয়।'

কিন্তু এ তো কেবল গঙ্গারই জয়ধ্বনি নয়, এ যে আমাদেরও যশোগাথা। বিষ্ণুপদী সৃষ্ট গাঙ্গেয়-বদ্বীপের অধিবাসী আমরা—আমরা গঙ্গাদাস, গঙ্গাধর, গঙ্গাহৃদি। ধন্য আমাদের জীবন, আমরা গঙ্গাসাগরে চলেছি। এ তো সাধারণ যাত্রা নয়, এ যে জয়যাত্রা আর তাই তো ঐ জয়ধ্বনি—'গঙ্গা মাঈকি…জয়।'

॥ দুই ॥

নৌকো চলেছে এগিয়ে। কেবল আমাদের নৌকো নয়, অসংখ্য নৌকো। সারি বেঁধে চলেছে এগিয়ে। জেটি ঘাট পড়ে রইল পেছনে, আমরা এগিয়ে চললাম সামনে।

মাটির মায়া বড় কঠিন মায়া। আমি তাই তাকিয়ে আছি তীরে। তীর ঘেষেই নৌকো চলেছে। নদী এখন এ-পাড় ভাঙছে। কাজেই তীরের কাছে গভীর জল। মাটির মানুষ মাটির কাছে থাকতে পারলে দূরে যাবে কেন ?

জেটি ঘাটের পরে নদী একটু বাঁয়ে বেঁকেছে। নদীর ধার তেমনি ইট আর সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো। বেশ উঁচু পাড়—অনেকটা বাঁধের মত। জলের হাত থেকে জনপদকে রক্ষা করার জন্যই এই আয়োজন। সারা ডায়মণ্ড হারবারের তটরেখা জুড়েই দেওয়া হয়েছে বাঁধ। সেই বাঁধের ওপর দিয়ে পথ—পিচঢালা মসৃণ পথ। কাকদ্বীপ, নামখানা ও ফ্রেজারগঞ্জের পথ।

আমরা চলেছি দক্ষিণ-পূবে। জেটি ঘাট থেকে মাইল-আধেক এগিয়ে 'সাগরিকা'। সাগরহীন সাগরিকা—ট্যুরিস্ট সেণ্টার। গঙ্গার তীরে পথের পাশে রাজ্য সরকারের মনোরম পর্যটক-নিবাস। সুদৃশ্য সুবিশাল চারতলা অট্টালিকা। নিচের তলায় মোটর গ্যারেজ। দুতলা পথের সমান্তরাল। সবটা জুড়েই একখানি হলঘর—কাচের দেওয়াল। তিনতলা ও চারতলায়

যাত্রীনিবাস। দিনে সাগরিকায় দাঁড়ালে দেখা যায় দিগন্ত-জোড়া চোখ-জুড়ানো গঙ্গা। আর রাতে যখন সাগরিকায় আলো জ্বলে, তখন সে গঙ্গার মন হরণ করে।

কিন্তু সাগরিকার হলঘরে ঢুকতে কিম্বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে গঙ্গার দৃশ্য দেখতে দর্শনী দিতে হয়। আর বাস করতে হলে তো কথাই নেই। ফলে পর্যটকদের জন্য পর্যটন বিভাগ কর্তৃক নির্মিত হলেও প্রকৃত পর্যটকদের প্রয়োজনে আসে না এই পর্যটক-নিবাস। বিদেশী কিম্বা দূরাগত ধনী পর্যটকরা মাঝে-মধ্যে এসে দু-একটা দিন কাটিয়ে না যান, এমন নয়। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা খুবই কম। শীতকালে যাঁরা সপরিবারে বেড়াতে আসেন, তাঁরা কয়েক ঘণ্টার জন্য সাগরিকায় আশ্রয় নেন। সাগরিকা তখন 'পিক্‌নিক্‌-কটেজে' পরিণত হয়।

গ্রীষ্ম ও বর্ষার সময় সাগরিকা একেবারে জনশূন্য থাকে সে কথাটা অবশ্য সত্য নয়। তখন অবস্থাপন্ন অবিবাহিত তরুণরা তাদের ফিঁয়াসেদের নিয়ে সাগরিকায় এসে রাত কাটিয়ে যায়। এখানকার জনহীন পরিবেশ তাদের বেলেল্লাপনায় সাহায্য করে। অতএব এই 'Tourist Centre' তখন একটি 'Bawdy-house.'

এই অবস্থার একমাত্র কারণ অত্যধিক ঘরভাড়া। অত ভাড়া দিয়ে মানুষ ডায়মণ্ড হারবারে থাকবে কেন? যার আছে, সে পুরী যাবে। আর যার নেই, সে দৈনিক দু টাকা ভাড়ায় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ডাকবাংলোয় থাকবে।

জানি সাগরিকা নির্মাণ করতে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাসিক ব্যয় কয়েক হাজার টাকা। কিন্তু সাধারণ পর্যটকদের সাধ্যাতীত ভাড়ার হার করে কি লোকসানের হার কমছে? পঞ্চাশ টাকায় একখানি ঘর ভাড়া হবার চেয়ে, পনেরো টাকায় চারখানি ঘর ভাড়া হওয়া কি অধিক লাভজনক নয়? তাছাড়া জনসাধারণের অর্থে নির্মিত নিবাসে সাধারণজন বাস করতে পারবে না, এ কেমন কথা!

আর লোকসান হলেই বা ক্ষতি কি? জনসাধারণের অর্থ সাধারণজনের জন্য ব্যয় হলে কর্মকর্তাদের কি এসে যায়? তাঁরা তো আর সরকারী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের 'ডিবেঞ্চার হোল্ডার' নন?

যাক গে সাগরিকার কথা। তার চেয়ে ডায়মণ্ড হারবারকে দেখা যাক্‌। বাঁদিকে তেমনি বাঁধানো পাড়। তার ওপর দিয়ে পথ। তবে খুব বেশিদূর

বিস্তৃত নয়, বড় জোর সিকি মাইল। তার পরেই পথটি বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে। নদীতীর থেকে পালিয়ে গেছে পূবে—গাঁয়ের ভেতরে। এখানেই শহর শেষ হয়ে গেল আর সেই সঙ্গে ফুরিয়ে গেল বাঁধানো পাড়।

বাঁধানো পাড়ের পরে একফালি মাঠ—বালিময় বেলাভূমির পরে ঘন সবুজের প্রলেপ। অনেকখানি জায়গা জুড়ে তার বিস্তার। দূর গ্রামের বনানী পর্যন্ত সে বিস্তৃত। তাই শীতের ছুটিতে এখানে পর্যটকদের ভিড় জমে। তাঁরা এখানে বসে বসে সঙ্গে নিয়ে আসা খাবারের সদ্ব্যবহার করেন।

প্রতি পর্যটককেই আসতে হয় এখানে। কারণ এই সবুজ প্রান্তর ছাড়িয়েই সেই চিংড়িখালি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, যার সঙ্গে বাংলার ইতিহাস অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে। জলদস্যুদের হাত থেকে এই পোতাশ্রয় তথা গাঙ্গেয়-বাংলাকে রক্ষা করার জন্য এখানে ইট ও পাথর দিয়ে কয়েকটি বাঙ্কার (Bunker) নির্মাণ করে ওপরে কামান বসানো হয়েছিল। কিন্তু ওদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে বহুকাল। তাই আজ ওরা এমন অবহেলিত। নদীর ঢেউয়ে কয়েকটা একেবারেই ভেঙে গেছে। গুটিপাঁচেক কোনমতে টিঁকে আছে। তবে কোনটির ওপরেই আর কামান নেই। একটি কামান পড়ে রয়েছে জলে, আরেকটি তীরে। ইতিহাসের প্রতি আমাদের কি অপরিসীম শ্রদ্ধা! অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে আজ আমাদের এ দুর্দশাই বা হবে কেন?

সেদিন এই চিংড়িখালি দুর্গ গাঙ্গেয় বাংলাকে বহু দুর্দশার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত এ অঞ্চলে পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের অমানুষিক অত্যাচার ছিল। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ক্রনিক্‌ল' থেকে জানা যায়, ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে কেবল মগ জলদস্যুরাই এই অঞ্চল থেকে ১৮০০ জন নারী পুরুষ ও শিশুকে ধরে নিয়ে যায়। আরাকানের রাজা তাদের এক-চতুর্থাংশকে কারিগররূপে রেখে অবশিষ্টদের বাজারে পাঠিয়ে জনপ্রতি বিশ থেকে সত্তর টাকায় বিক্রি করে দেন।

প্রত্যেক মগ জলদস্যুই যে বন্দীদের আরাকানে নিয়ে যেত তা নয়। অনেকে এদেশে বসেই বিক্রির ব্যাপারটা সেরে ফেলত। শুনেছি চব্বিশ পরগণার মগরাহাটে এইরকম একটি বিক্রয়কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছিল। সেখানে সাধারণত মেয়েদের বিক্রি করা হত। আর মগ জলদস্যুদের সেই

মেয়ে-বিক্রির-হাট থেকেই জায়গাটির নাম হয়েছে মগরাহাট। জলদস্যুদের অত্যাচারে তখন এ অঞ্চল প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ছিল। আর তাই তৈরি হয়েছিল এই দুর্গ—চিংড়িখালি দুর্গ।

ইতিমধ্যে দুর্গের শেষ বাঙ্কারটি ছাড়িয়ে এসেছে আমাদের নৌকো। সামনেই ডায়মণ্ড হারবারের সেই বিখ্যাত আলোক-স্তম্ভ—'নেভিগেশান লাইট'। অনেকে অবশ্য ভুল করে বলেন 'লাইট-হাউস'। কিন্তু এটি বাতিঘর নয়। এটি কেবলই নিশানা, নির্দেশক নয়। বাতিঘর আছে সাগরদ্বীপে। আমি সেটি দেখে আসব। এখন এটি দেখে নিই।

প্রায় তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু একটি স্তম্ভ। গায়ে লোহার সিঁড়ি। স্তম্ভের ওপরে লাল রঙ দেওয়া গোল একটি বড় বাতি। রাতে এই আলো নৌকো ও জাহাজকে তটভূমি দেখিয়ে দেয়।

আমরা আলোক-স্তম্ভ ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি। নদীতে ঢেউ নেই—শান্ত স্রোতস্বিনী। সামান্য স্রোত কিন্তু বেশ বাতাস আছে। তাই নৌকো পাল তুলে চলেছে। দুখানি পালই তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে নৌকোটা একদিকে কাত হয়ে আছে। প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু তারপরেই মনে পড়েছে, এমনি হয়।

ছল্ ছল্ ছলাৎ—অবিশ্রান্ত জলের শব্দ হচ্ছে। একই সুরে গান গাইছে গঙ্গা।

গঙ্গার জল খুবই ঘোলা—প্রায় গৈরিক বর্ণ। তাই তো হবে, গঙ্গা যে বাউল-বাংলার উদাসী সুরের সুরধুনী।

কিন্তু গঙ্গার কথা এখন থাক্, এবারে নৌকোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। তাই তীর থেকে দৃষ্টি ফেরাই নৌকোর দিকে। যে নৌকোতে কাটবে কয়েকটা দিন, যে নৌকো আমাকে নিয়ে চলেছে সাগরসঙ্গমে—কপিল সদনে। আমি গঙ্গাসাগরে চলেছি। আমার অনেকদিনের আশা পূর্ণ হতে চলেছে। করুণাময়ী গঙ্গা, তিনি আমার গোমুখীর প্রার্থনা পূর্ণ করবেন। তাই হৈমবতীকে আর একবার প্রণাম করে নৌকোর ভেতর তাকাই।

শতাধিক মানুষ আমার সহযাত্রী। অধিকাংশই মহিলা। প্রায় সবই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। সমবয়সী পুরুষযাত্রী প্রায় দেখছি না। তবু ভাগ্য ভাল, একটি সুশ্রী যুবতী রয়েছে। আর প্রকৃতির নিয়মে তার দিকেই প্রথম নজরে পড়ে। তাহলেও চোখ ফিরিয়ে নিই। অন্য যাত্রীদের দিকে নজর দিই।

অনেকেরই উদ্দেশ্য দেখছি, 'রথ দেখা কলা বেচা'। কেউ তোরঙ্গ করে মনোহারি দোকান নিয়ে চলেছে, কেউ বা টিনবোঝাই খই আর বাতাসা। কারও সঙ্গে গঙ্গাসাগরের মাহাত্ম্যের বই আর ছবি, কারও বা ফুল বেলপাতা, আরও কত কি। এরা মালা বেচবে, মেলা দেখবে আবার স্নান-দর্শনও করবে। মাছের তেলে মাছ ভাজবে।

পুণ্যার্থীদের মধ্যে প্রথমেই যার দিকে নজর পড়ে, তার নাম ইন্দারজিৎ ভুজাওয়ালা। নিজেই নাম বলে। আমার পাশে বসে আছে সে। সহসা বলে ওঠে, "বাবুজী! হামি ইন্দারজিৎ ভুজাওয়ালা আছে।"

সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাই। স্বাস্থ্যবান প্রৌঢ়। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গায়ের রঙ ফর্সা। পরনে মোটা ধুতি আর টুইডের গলাবন্ধ কোট।

আমি কিছু বলতে পারার আগেই সে আবার বলে, "হামি বড়াবাজারে থাকে। গঙ্গাসাগর যাচ্ছে, আস্নান করতে।"

বলি, "আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় খুশি হলেম। তা আপনি কি মাল নিয়ে যাচ্ছেন?"

"কুছ নহী।". সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় ভুজাওয়ালা। বলে, "আরে রাম রাম! হামি চলেছি তীরথ করতে। সামান লিয়ে যাবে কেন? তীরথ আউর কারবার কি একসঙ্গে হোয়? হোয় না।"

"কিন্তু এই যে এরা সবাই চলেছেন? এদের কি তীর্থদর্শন হবে না।"

আমার কানের কাছে মুখ এনে ভুজাওয়ালা বলে, "না। হোবে না বাবুজি! কারবার হোবে না, তীরথভি হোবে না। হামার কারবার হোবে না, লেকিন তীরথ হোবে।"

বুঝতে পারছি, ইন্দারজিৎ জাতব্যবসায়ী। সে লাভ-লোকসান হিসেব করে পথে বেরিয়েছে। ছোট লাভের জন্য বড় লোকসান করতে রাজী নয় সে।

আমরা আস্তে আস্তে কথা বলছি বটে, কিন্তু জোরে বললেও ক্ষতি ছিল না। কারবারী পুণ্যার্থীদের কান নেই এদিকে। তারা নিজ নিজ কারবারের আলোচনায় ব্যস্ত। চলেছে তীর্থে কিন্তু করছে কেনা-বেচার হিসেব। হিসেবের চেয়ে কম বিক্রি হলে লোকসান আর বেশি হলে আশাতিরিক্ত লাভ। লোকসানের দুঃখ কিম্বা লাভের আনন্দ যে ওদের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাহলে ওরা তীর্থ করবে কেমন করে? ভুজাওয়ালার উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করি।

নৌকোর ভেতরে একটা গোলমাল—নারী ও পুরুষ কণ্ঠের কলহধ্বনি। একটু বাদে বুঝতে পারি, জায়গা নিয়ে ঝগড়া। বুড়ো মাঝি জোয়ান মাঝির হাতে হাল ছেড়ে দিয়ে ভেতরে যায়। আস্তে আস্তে গোলমালটা কমে আসে।

খানিকক্ষণ বাদে বুড়ো মাঝি বেরিয়ে আসে। তার মধ্যস্থতায় একটা সন্ধি হয়েছে। কিন্তু এ সন্ধি কতক্ষণ স্থায়ী হবে? পূর্ব-ভারতের পুণ্যতম তীর্থে পুণ্যস্নান করে পুণ্যসঞ্চয় করতে চলেছেন এঁরা—এঁরা পুণ্যার্থী কিন্তু মনটাকে তৈরি করে তুলতে পারেন নি। সাধারণ সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে না উঠতে পারলে যে তীর্থের ফললাভ করা যায় না, সে কথাটি বোধ করি ভুলে গেছেন।

ঝগড়া থেমে গেলেও গোলমাল কমে নি। কমবেই বা কেমন করে? একখানি নৌকোতে শতাধিক যাত্রী। তাঁরা ছেলে-মেয়ে ঘরসংসার ছেড়ে এসেছেন। সেই সব কথা কি মনে না পড়ে পারে! তাছাড়া অনেকের সঙ্গেই প্রচুর মালপত্র। কম তো নয়, পাঁচ-ছ' দিনের ব্যাপার। প্রয়োজনীয় বস্তুর পরিমাণ কম হবে কেমন করে? আর সেগুলিকে সব গুছিয়ে রাখতে হবে তো?

যাদের গোছগাছ হয়ে গেছে, তাঁরা নিজের জায়গায় গ্যাঁট হয়ে বসেছেন। নৌকোর দোলায় দুলতে দুলতে কেউ দোক্তা কিম্বা জর্দা সহযোগে পানচর্বণ করছেন, কেউ বা বিড়ি কিম্বা সিগারেটে টান দিয়ে স্বর্গসুখ উপভোগ করছেন। তাঁদের চোখে-মুখে আনন্দের অভিব্যক্তি। আনন্দের আতিশয্যে মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছেন—'গঙ্গা মাঈকি…জয়।'

ভেতরের যাত্রীরা সবাই সাড়া দিচ্ছেন এই জয়ধ্বনিতে। কেবল চুপ করে শুয়ে আছেন একজন বৃদ্ধ বৈরাগী। তাঁর যে সাড়া দেবার সাধ্য নেই। তিনি বোধ হয় হাঁপানী রোগী। আসার পর থেকেই দেখছি তিনি কাসছেন। সে কাসির শব্দ শুনলে ভয় হয়। মনে হয় যেন এখুনি তাঁর দম বন্ধ হয়ে যাবে। তবে কিছুক্ষণ থেকে বোধ হয় একটু ভাল আছেন। ভাল থাকলেই ভাল। ভালয় ভালয় তীর্থ করে ঘরে ফিরে যান। তাঁর দরকার নেই জয়ধ্বনি দেবার। মা-গঙ্গা এতে কোন অপরাধ নেবেন না। তিনি অক্ষমকে ক্ষমা করেন।

আর একজন কিন্তু গঙ্গার জয়ধ্বনিতে অংশ নিচ্ছে না—ইন্দারজিৎ ভুজাওয়ালা। তবে সে নীরব রইছে না। ওরা 'গঙ্গা মাঈকি…' বললেই সে বলছে—'হনুমানজীকি…জয়।'

ওর হনুমান-ভক্তির কারণ জানিনে। আর তা জানারই বা আমার দরকার কি? তীর্থের পথে পার্থিব কৌতূহল পাপ। তারপর বোঝা বাড়াতে তো সাগর-সঙ্গমে যাচ্ছি না। কাজেই চুপ করে থাকি। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হই—ভুজাওয়ালা দুর্বোধ্য।

আবার বৃদ্ধ বৈরাগীর দিকে তাকাই। না, ঠিক বাবাজীকে দেখার জন্য নয়। তাঁকে দেখার কি আছে? তিনি তো কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। দেখি তাঁর পাশে উপবিষ্টা মহিলাকে। বয়স কত বলতে পারব না। মেয়েদের বয়স বোঝা কঠিন। কিন্তু সে যুবতী। গায়ের রঙ খুব ফর্সা না হলেও কালো বলা চলে না। মুখখানি সুন্দর। স্বাস্থ্যটি ভাল। কাজেই তাকে নিঃসন্দেহে সুশ্রী বলা চলে। সে যে ঐ বৃদ্ধ বাবাজীর সঙ্গে সাগরে চলেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নৌকোয় ওঠার পর থেকেই দেখছি, সে তাঁর সেবা করছে। কিন্তু মেয়েটির চাল-চলন দেখে মনে হচ্ছে সে শিক্ষিতা ও আধুনিকা। তাঁর গায়ের জামা ও চুলের খোঁপা আমার এ মতকে সমর্থন করছে। কিন্তু ঐ বৃদ্ধ বৈরাগীর সঙ্গে তাকে কেমন যেন বেমানান ঠেকছে। তাঁর সঙ্গে ঐ মেয়েটির কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

ফর্সা ও ছোটখাটো একজন বৃদ্ধা বিধবা মেয়েটির পাশে বসেছিলেন। কিছুক্ষণ থেকেই তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে আমাকে দেখছিলেন। এবারে তিনি বেরিয়ে এলেন নৌকো থেকে। ভদ্রমহিলাকে দেখে শ্রদ্ধা হচ্ছে। একটা দুর্লভ মাতৃত্ব আছে তাঁর চেহারায়। যৌবনে তাঁকেও নিশ্চয়ই সুন্দরী বলা হত। এখনও তিনি সুন্দরী। তবে সে সৌন্দর্য জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সহিষ্ণুতার।

ভদ্রমহিলা এসে নৌকোর বাইরে বসেন। আমি জলের দিকে তাকিয়ে থাকি। কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ একসময় তাঁর চোখে চোখ পড়তেই তিনি ইশারায় আমাকে কাছে ডাকেন। আমি এগিয়ে বসি।

তিনি বলেন, "আরও কাছে আয়, অতদূরে যে পোড়া দিষ্টি যায় না।"

প্রথম সম্ভাষণেই তুই! কাছে যাওয়া নিরাপদ কিনা বুঝতে পারছি না।

তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন, "ও কি! বসে রইলি কেন? এগিয়ে আয় বলছি!"

এ আদেশ অমান্য করার সাধ্য নেই আমার। তাই নীরবে এগিয়ে আসি, প্রায় তাঁর কোলের কাছে এসে বসি।

দুর্বল ও শীর্ণ একখানি হাত বাড়িয়ে আমার চিবুক ছুঁয়ে হাতখানি নিজের ওষ্ঠে স্পর্শ করেন। যেন সহসা কোন পরম স্নেহাস্পদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে

গেল।

বৃদ্ধা বলেন, "আমি কালুর মা, বাগবাজার থেকে আসছি। তুই আমাকে দিদিমা বলে ডাকিস।"

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাই। বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করেন, "তা এই বয়সে তুই যে বড় পুণ্যি করতে চলেছিস?"

হেসে বলি, "পুণ্যার্জনের জন্য যাচ্ছি নে, আমি পুণ্যার্থীদের দেখতে চলেছি।"

"তার মানে মানুষ দেখতে?"

"তা বলতে পারেন।" হেসে উত্তর দিই।

"ও মা, সে কি কথা! কলকাতার ছেলে হয়ে তুই মানুষ দেখতে সাগর-মেলায় চলেছিস!"

"হ্যাঁ, দি'মা।"

আমার সম্বোধনে তিনি যেন খুশি হন। স্নেহসিক্ত স্বরে বলেন, "কিন্তু সে জন্য এত কষ্ট করছিস কেন?"

"তেমন মানুষ যে কলকাতায় দেখতে পাওয়া যায় না।" আমি উত্তর দিই।

কালুর মা হাসেন। ভারী মিষ্টি তাঁর হাসি। তিনি বলেন, "তোর ভুল হয়ে গেল রে! একই মানুষ, কেবল ভিন্ন পরিবেশের জন্য সে ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়।' একটু থামেন তিনি। তারপরে আবার বলেন, "যাক গে, বুঝতে পারছি না তুই কেন যাচ্ছিস সাগরে! কিন্তু একটা কথা সব সময় মনে রাখিস, দেখতে চাইলেও দেখতে পাওয়া যায় না, দেখার চোখ থাকা চাই।"

আমি ঘাড় নাড়ি। কালুর মা আর কিছু বলেন না। তিনি হাতের ছোট কাপড়ের থলি থেকে একটা রূপোর কৌটো বার করেন, গড়ন অবিকল ডাবের মতন। মুখ খুলে কি একটা গুঁড়ো হাতে ঢাললেন খানিকটা। তার অর্ধেকটা আমার হাতে দিয়ে বাকিটা নিজের মুখে চালান করে দিলেন।

অপরিচিত বস্তুটুকু হাতে নিয়ে বসে থাকি। কি করব বুঝতে পারছি না।

তাঁর নজর পড়ল আমার দিকে। বলে উঠলেন, "ও কি! অমন 'ধর লক্ষ্মণ' হয়ে বসে রইলি কেন? হাওয়ায় উড়ে যাবে যে। নে তাড়াতাড়ি মুখে ফেলে দিয়ে চিবো। ভাল লাগবে। এ হল গিয়ে খাঁটি তিরফলার গুঁড়ো।"

অতএব আর দ্বিধা না করে তাঁর আদেশ পালন করি। ভাবি আরেকজন

অনাত্মীয় বৃদ্ধ যাত্রী আর এক তীর্থের পথে আমাকে চূরণ খেতে দিয়েছিলেন। সে আজ এক যুগ আগের কথা। কিন্তু যমুনোত্রী-গোমুখী পথের সহযাত্রী সেই লালাজীর কথা তো আমি আজও ভুলি নি, কোনদিন ভুলতে পারব না।

তাহলে কি আজকের সঙ্গীদের কথাও আমার চিরকাল মনে থাকবে? এই দি'মা আর ভুজাওয়ালা? ঐ বৃদ্ধ বৈরাগী আর তাঁর যুবতী সেবিকা—এদের কথা কি চিরকাল মনে থাকবে আমার?

কেমন করে বলব? মনের কথা কি কেউ আগের থেকে বলতে পারে?

কিন্তু মনের তাগিদেই তো আজকের এই যাত্রা। প্রতি বছর জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতার পথে দেখেছি অসংখ্য নতুন মানুষের ভিড়। রেলস্টেশন ধর্মশালা হোটেল ফুটপাত গাছতলা ময়দান—সর্বত্র সেই আগন্তুকদের সমাবেশ—তাঁরা সাগরমেলায় যাবেন। তাঁদের অনেকেই পথের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানেন, তবু তাঁরা এসেছেন। তাঁরা দুঃসহ দুঃখ সইছেন, তবু তাঁরা যাবেন। কিন্তু কেন? এ কি কেবলই পুণ্যার্জনের জন্য? মনের মুক্তির জন্যই কি সাগরে চলেছেন এঁরা? নিজের মনের কাছে বার বার এই প্রশ্নের উত্তর চেয়েছি। পাই নি। মন পাল্‌টা প্রশ্ন করেছে, মন কি সত্যই মুক্ত হয়?

কেমন করে বলব? উৎস থেকে আরম্ভ করে গঙ্গার কত ঘাটে পুণ্যস্নান করেছি। কিন্তু কোথায়, আমি তো আজও বলতে পারছি না যে ভাগীরথীর পাদপদ্মে প্রাণ সঁপেছি। বলতে পারছি না, আপন চিত্তকে গঙ্গাসাগরের পুণ্যধারায় কলুষমুক্ত করবার জন্যই আমার এই তীর্থযাত্রা।

কাজেই মনের মুক্তির কথা থাক্। তার চেয়ে বরং বলা যাক লক্ষ লক্ষ মুক্তিকামী মানুষের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্যই আমার এই যাত্রা।

আমি আবার গঙ্গার দিকে তাকাই। গঙ্গা—পুণ্যসলিলা গঙ্গা। ভারতের পবিত্রতম প্রবাহ গঙ্গা। সে পতিতপাবনী তাই তার তীরে দেহত্যাগ করলে প্রাণীমাত্রই মুক্তিলাভ করে। জীবনে যে গঙ্গায় একটি মাত্র ডুব দিয়েছে, তাকে আর যমদূতেরা স্পর্শ করতে পারে না।

ঋগ্বেদে (১০।৭৫।৫) কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে, শতপথব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে গঙ্গার উল্লেখ আছে। প্রায় প্রত্যেকটি পুরাণ ও উপপুরাণে গঙ্গা সম্পর্কে কিছু না কিছু লেখা আছে।

বাল্মীকির রামায়ণে (আদিকাণ্ড) বলা হয়েছে, গঙ্গা হিমালয় ও মেনকার

মেয়ে। হিমালয় তাকে লালন-পালন করেন। শিবের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য দেবতারা তাকে হিমালয়ের কাছ থেকে নিয়ে আসেন। মেনকা তাকে না দেখতে পেয়ে শাপ দেন আর তারই ফলে গঙ্গা জলময়ী হয়ে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বাস করতে থাকে। কপিলমুনির শাপে ভস্মীভূত সগর-সন্তানদের উদ্ধারের প্রয়োজনে ভগীরথ রামায়ণের যুগে গঙ্গাকে মর্তে নিয়ে আসেন।

মহাভারতে বলা হয়েছে, গঙ্গা যে সব গ্রাম নগর ও পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, তারাও পবিত্র। গঙ্গাদর্শনে মানুষ মুক্তিলাভ করে। গঙ্গাবারি স্পর্শ করলে জীবনের সব পাপ ধুয়ে যায়। মৃত্যুর পরে গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন দিলে আত্মা অক্ষয় স্বর্গবাসী হয়। গঙ্গাতীরে দান-ধ্যান ও জপ-তপ করলে মানুষ পরম পুণ্যসঞ্চয় করে।

গঙ্গাকে স্মরণ করা, গঙ্গার নাম উচ্চারণ করা এবং গঙ্গাস্নান করার মত পুণ্যকর্ম খুব কমই আছে। গঙ্গাতীরে বাস স্বর্গবাসের সামিল। তিল ও তুলসীর মতই গঙ্গাজল চিরপবিত্র।

মহাভারতীয় দানধর্মের মতে গঙ্গাগর্ভ থেকে ২২৫ ফুট পর্যন্ত গঙ্গাতীর। তীর থেকে চার মাইল পর্যন্ত ক্ষেত্র। গঙ্গাক্ষেত্রে বসে দানধ্যান, জপ ও হোম করলে সীমাহীন ফল হয়।

ব্রহ্মপুরাণ অগ্নিপুরাণ ভবিষ্যপুরাণ মৎস্যপুরাণ স্কন্দপুরাণ ও কূর্মপুরাণ প্রভৃতিতে গঙ্গাস্নানের সময় ও নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। কোন পুরাণের মতে বৈশাখী শুক্লাতৃতীয়া (অক্ষয় তৃতীয়া) তিথিতে গঙ্গা ব্রহ্মলোক থেকে মর্তধামে অবতীর্ণ হয়েছে। ব্রহ্মপুরাণের মতে জ্যৈষ্ঠা শুক্লাদশমীতে (দশহরা) গঙ্গাবতরণ হয়েছে। এই দুই পুণ্যতিথিতেই লক্ষ লক্ষ যাত্রী গঙ্গাস্নান করে থাকেন। এ ছাড়া বৈশাখী, আষাঢ়ী, কার্তিকী ও মাঘী পূর্ণিমায়, যে কোন অমাবস্যায় এবং সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের দিনে গঙ্গাস্নানে পুণ্যার্থীর সহস্রগুণ ফললাভ হয়।

গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ কিংবা শিবপূজা করলে জীবন ধন্য হয়। গঙ্গাতীরে মৃত্যু হিন্দু মাত্রেরই বরণীয়। স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালের শ্রেষ্ঠতম তীর্থ গঙ্গাসাগর।

বিজ্ঞানীদের কাছে গঙ্গাজল আজও বিস্ময়কর বস্তু বলে বিবেচিত। কারণ তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, গঙ্গাজলে প্রচুর পরিমাণে রোগের জীবাণুনাশক খনিজ পদার্থ রয়েছে। ফলে কলেরার মতো শক্তিশালী রোগের জীবাণু পর্যন্ত গঙ্গাজলে বেশিক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে না। গঙ্গাজল চর্মরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। বৈজ্ঞানিকরা স্বীকার করেন যে পৃথিবীর

অন্য কোন নদীর জলে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না।

কানাডার Mc Gill বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Dr. F. C. Harrison লিখেছেন,···the belief of the Hindus, that the waters of this river is pure and cannot be defiled and that they can safely drink it and bathe in it, should be confirmed by means of modern bacteriological research.*

Dr. D. Herelle নামে জনৈক খ্যাতিমান ফরাসী চিকিৎসক গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন গঙ্গাজলে কলেরার জীবাণু মরে যায়।

Dr. C. E. Nelson নামে একজন বৃটিশ চিকিৎসক গঙ্গাজল সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য খবর দিয়েছেন—বিলেতগামী জাহাজগুলি গঙ্গা থেকে যে জল নিয়ে যায় তা লণ্ডনে পৌঁছেও নষ্ট হয়ে যায় না। অথচ কলকাতাগামী জাহাজগুলি লণ্ডন থেকে যে জল নিয়ে আসে তা সুয়েজ কিম্বা এডেন বন্দরে আসার মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সে জল ফেলে দিয়ে নতুন জল নিতে হয়।

"কিরে, কি ভাবছিস এত?" আমার অন্যমনস্কতা দি'মার দৃষ্টি এড়ায় না।

একটা ঢোক গিলে বলি, "না, কিছু নয়। গঙ্গাকে দেখছিলাম।"

তিনি একটু হাসেন, "আমাকে ফাঁকি দেওয়া ··আমি জানি তুই কি ভাবছিলি!"

"কি?"

"ভাবছিলি ঘরের কথা, আপনজনের কথা, মনের মানুষের কথা।"

এবারে আমার হাসার পালা। হেসে বলি, "সত্যি, আপনাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়।"

"বল্, ঠিক ধরেছি কিনা?" তিনি খুশিতে উপচে পড়েন।

"না।"

"তাহলে?" তিনি ক্ষিপ্তস্বরে জিজ্ঞেস করেন।

"আমি গঙ্গার কথাই ভাবছিলাম দি'মা। চলেছি গঙ্গাসাগরে, এখন অন্য কথা ভাবতে যাব কেন? আর আমার মনের মানুষ যে কাছেই আছে।"

"কে?" দি'মা চারিদিকে তাকান।

* 'Mother Ganges' by Swami Sivananda

"আপনারা সকলে।......আমার মনের মানুষ ভিড় করে আছে তীর্থপথের বাঁকে বাঁকে।"

"কি জানি বাপু, আমি মুখ্যু মানুষ, তোদের ও-সব বড় বড় কথা বুঝি নে।" একটু থামেন তিনি। তারপরে আবার বলেন, "তা এখানে বসে কথার খই ফোটালেই হবে, না ভেতরে যেতে হবে?"

"আবার ভেতরে কেন?"

"গঙ্গার হাওয়া খেলেই পেট ভরবে?"

"আমার তো খিদে পায় নি।"

"খুব পেয়েছে। আর তক্ক করতে হবে না। ভেতরে চল্।"

"কি খেতে হবে?"

"মুড়ি।"

"মুড়ি!"

"হ্যাঁ, মুড়ি নয় তো তোকে এই নৌকোতে মণ্ডা-মিঠাই খাওয়াব কোথা থেকে?"

"মেলায় গিয়ে খাওয়াবেন!"

"সে দেখা যাবে'খন। এখন ভেতরে চল্।"

"চলুন।" বলে আমি দি'মার সঙ্গে নৌকোর ভেতরে আসি।

তাঁর শতরঞ্চের পাশে খালি জায়গাটুকু দেখিয়ে দি'মা বলেন, "বোস্।"

আমি নিঃশব্দে তাঁর আদেশ পালন করি।

দি'মা ঝোলা থেকে একটি কাঁসার জামবাটি বের করে মাথার কাছে রাখা ছোট মুড়ির টিনটা খোলেন। একবাটি মুড়ি ও কয়েকটা নারকেলের নাড়ু সহ বাটিটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, "নে, খা।"

"এত!"

"হ্যাঁ, খুব পারবি। জোয়ান বয়স, এই চারটি মুড়ি খেতে পারবি না? ঐ দেখ্, ওরা কেমন খাচ্ছে!"

দিদিমার কথায় চোখ তুলে চারিদিকে তাকাই। তিনি ঠিক বলেছেন। অধিকাংশ যাত্রীর সামনেই এক থালা করে মুড়ি। এবারে বুঝতে পারছি, জেটি ঘাটে অমন বস্তাবোঝাই মুড়ি বিক্রি হচ্ছিল কেন? এর পরে আর আপত্তি করা যায় না। কাজেই মুড়ির বাটিটা কাছে টেনে নিই।

কে যেন ফিক্ করে হেসে উঠল। নারীকণ্ঠ। সে কি আমার দুরবস্থা

দেখে হাসছে? তাড়াতাড়ি তার দিকে তাকাই। সেই যুবতী বৈষ্ণবী—বৃদ্ধ বৈষ্ণবের সঙ্গিনী। কালুর মা-র ওপাশে বসে আছে।

হ্যাঁ, সে আমার দিকেই তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। তার দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হয়। সে চোখ নামিয়ে নেয়। কিন্তু হাসি থামায় না। আমি নিরুপায়। নীরবে মুড়ি চিবোতে শুরু করি।

কেটে যায় কিছুক্ষণ। প্রায় শব্দহীন পরিবেশ। কেবল দুটি মৃদুমন্দ শব্দ উত্থিত হচ্ছে। একটি গঙ্গার ধ্বনি, অবিরাম কুলকুল রবে আমাদের নৌকোকে অবিরত আঘাত করছে। আর একটি মুড়ি-চর্বণের শব্দ—মচ্ মচ্, মচর মচ্। মাঝে মাঝেই দ্বিতীয় শব্দের দাপটে প্রথম ধ্বনিটি হারিয়ে যাচ্ছে।

সহসা সেই মেয়েটির চাপা কণ্ঠস্বর কানে আসে। সে দি'মাকে জিজ্ঞেস করছে, "এটি কে গো দিদিমা?"

"আমার নাতি।" দি'মা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন। তবে তাঁর কণ্ঠস্বরে তিক্ততার পরশ।

"আগে তো দেখি নি?"

"দেখবে কেমন করে, ও বাইরে বসেছিল।" দি'মা রীতিমত বিরক্ত।

"না, এ তো আপনার অনেক পরে নৌকোয় উঠল কিনা।"

"তাতে কি হল?" দি'মা ক্রুদ্ধস্বরে বলে ওঠেন। "ওর যখন ইচ্ছে উঠেছে। তোমারই বা বাছা অত দেখার কি দরকার?"

"আহা দেখব না কেন, ভগবান যে দেখার জন্যই চোখ-দুটো দিয়েছেন।"

না, আর এখানে বসা গেল না দেখছি। আমি তাড়াতাড়ি বাটিটা হাতে নিয়ে দি'মাকে বলি, "আমি একটু বাইরে গিয়ে বসছি।"

"হ্যাঁ, তাই যা বাবা।" দি'মা বিরক্তির সঙ্গে আমাকে অনুমতি দেন। বেরিয়ে আসতে আসতে শুনি তিনি বৈষ্ণবীকে বলছেন, "তা তুমিই বা কেমন মেয়ে গা, দিলে তো ছেলেটাকে এই রোদে বাইরে পাঠিয়ে?"

"ওমা, আমি কোথায় পাঠালাম, ও তো নিজেই চলে গেল..."

বাইরে এসে আবার ভুজাওয়ালার পাশে বসি। সেও মুড়ি খাচ্ছে। সঙ্গী পেয়ে খুশি হয় সে। একটু মুচকি হাসে। তারপরে নীরবে মুড়ি চর্বণ করতে থাকে। এ সময় কথা বলা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

আলোকস্তম্ভের চুড়োটাও অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি। একেবারে কাকদ্বীপ গিয়ে নৌকো থামবে। ডায়মণ্ড হারবার থেকে

কাকদ্বীপ মোটরপথে ২৮ মাইল। জলপথে একটু বেশি হবে।

এই যে পথটুকু যেতে আমাদের ছ-সাত ঘণ্টা লাগছে, সেটুকু বাসে যেতে মাত্র দেড় ঘণ্টা লাগে। ভাড়া দেড় টাকা। তবু আমি চলেছি নৌকোয়। আমি যে সাগরমেলায় চলেছি। বাসে গেলে তো দি'মা কিম্বা মেয়েটির সঙ্গে দেখা হত না। আর মুড়ি চিবিয়ে চোয়াল ব্যথা করে ফেলতে পারতাম না। সুখের ব্যথার চেয়ে যে সুখকর কিছু নেই এ সংসারে।

নৌকোয় যেতে আমাদের পুরো এক ভাটা অর্থাৎ ঘণ্টা সাতেক সময় লাগবে। তার মানে কাকদ্বীপ পৌছতে আমাদের সাতটা বেজে যাবে। শীতকালের বেলা, অনেক রাত। একে তো রাত, তার ওপর তখন আবার জোয়ার হয়ে যাবে। জোয়ার ঠেলে, বিশেষ করে রাতে, সাগরের পথে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই আজকের রাতটা আমরা কাকদ্বীপেই কাটাবো। কাল খুব ভোরে শেষ ভাটায় নদী পার হব। ওপারে গিয়ে রান্না-খাওয়া হবে। তারপরে আবার ভাটা এলে নৌকো ছেড়ে সন্ধ্যের আগে গঙ্গাসাগর পৌছে যাবো।

ডায়মণ্ড হারবার থেকে নৌকোয় গঙ্গাসাগর যেতে হলে কিন্তু কাকদ্বীপ যাবার কোন দরকার হয় না। সাধারণতঃ কেউ যায়ও না। কাকদ্বীপকে বাঁ দিকে অর্থাৎ পুবে রেখে তারা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলে যায়। ঘোড়ামারা খাসিমারা ও লোহাচড়া দ্বীপের পাশ দিয়ে সাগরদ্বীপের উত্তর তীরে পৌছায়। তারপরে সাগরদ্বীপের পশ্চিম তীর ধরে হুগলি নদী অর্থাৎ গঙ্গা দিয়ে গঙ্গাসাগর যায়। আমরা গঙ্গাসাগর যাব উল্টোদিক মানে মুড়িগঙ্গা দিয়ে। যাব সাগরদ্বীপের পূর্বতট ধরে।

ঘোড়ামারা দ্বীপের কাছে গঙ্গা দুভাগে বিভক্ত হয়েছে—গঙ্গা ও মুড়িগঙ্গা। গঙ্গা পশ্চিমে, মুড়িগঙ্গা পূবে। গঙ্গা আট মাইল চওড়া আর মুড়িগঙ্গা মাত্র দু' মাইল। গঙ্গার ওপারে মেদিনীপুর আর মুড়িগঙ্গার এপারে চব্বিশ পরগণা। দুয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়ামারা খাসিমারা লোহাচড়া আর সাগরদ্বীপ। নতুন দ্বীপ জেগেছে সুপারিভাঙা ও আগুনমারি। এখনও বসবাস শুরু হয় নি। কেবল গরু চরাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এই সব দ্বীপ ভাল ভাবে দেখতে পাব না। আমরা যাবো বহু দূর দিয়ে। দেখতে পাব না ঘোড়ামারা ও খাসিমারা দ্বীপ দুটিকে। ঘোড়ামারা এক কালে বেশ জনবহুল দ্বীপ ছিল। বহু লোক বাস করতেন। আয়তন ছিল আড়াই বর্গমাইল। কলকাতার বন্দর কর্তৃপক্ষ সেখানে একটি



'হাই-ফিক্‌স' স্টেশন নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু কয়েক বছর থেকে ঘোড়ামারা ভেঙে যাচ্ছে। এখন তার আয়তন মাত্র দেড় বর্গমাইল। কর্তৃপক্ষ বাসিন্দাদের ঘোড়ামারা থেকে চলে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন। অনেকেই চলে গিয়েছেন, যাঁরা যান নি, তাঁরাও যাবার চেষ্টায় আছেন। অদূর ভবিষ্যতে হাই-ফিক্‌স স্টেশনকেও সরিয়ে নিতে হবে অন্যত্র। এতে কেউ একটা চিন্তিত হয় না। কারণ সাগরদ্বীপও তো একসময় তিরিশ মাইল দীর্ঘ ছিল, আর এখন সে মাত্র ১৯।২০ মাইল। এখনও সে ভেঙে যাচ্ছে। একদিন হয়তো ঘোড়ামারার মতো তারও জীবন যাবে ফুরিয়ে। তখন কি আর সাগরমেলা হবে না? কেন হবে না? তখন অন্য কোন নতুন দ্বীপের নাম হবে সাগরদ্বীপ। সেখানেই বসবে মেলা। আজকের মত লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী এমনি করেই সেদিন সেখানে যাবে ছুটে।

এমনটি তো হামেশাই হচ্ছে। নদী ভাঙছে, সাগর ভাঙছে। যাযাবর মানুষ নতুন মাটি খুঁজে বের করছে, নতুন ঘর বাঁধছে। নদী তো কেবল ভাঙে না, সেই সঙ্গে সে যে গড়েও। ভাঙার নেশার মত গড়ার খেলাও সে সমানে খেলে চলে। মানুষের মত তারও যে ভাঙা-গড়া নিয়েই জীবন।

বিলীয়মান জনপদ ঘোড়ামারা খাসিমারা ও লোহাচড়াকে কাছে গিয়ে দেখতে পাব না। কিন্তু কাকদ্বীপকে তো দেখতে পাব। তাই বা কম কিসের?

কাকদ্বীপ আবাদী সুন্দরবনের হৃৎপিণ্ড। এখন একটি জনবহুল ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত। সেখান থেকে বাস যায় ফ্রেজারগঞ্জ।

কাকদ্বীপের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় পনের হাজার। বহুদিন আগের থেকেই কাকদ্বীপে বসবাস শুরু হয়েছিল। সেখানকার বিশালাক্ষী মন্দিরটি তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। তবে যত্নের অভাবে মন্দিরটি আর কতদিন টিকে থাকতে পারবে তা বলা শক্ত।

ভূগোলবিদ্‌রা চব্বিশ পরগণার গাঙ্গেয় উপত্যকাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—হুগলিতট, দক্ষিণ সমভূমি ও সুন্দরবন। ইছাপুর থেকে বজবজ পর্যন্ত হুগলিতট। এই অঞ্চলের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫ মাইল। তার পর থেকে কুলপি পর্যন্ত দক্ষিণ সমভূমি। এই অঞ্চল চব্বিশ পরগণা জেলার সবচেয়ে উর্বর এবং ঘনবসতিসম্পন্ন অঞ্চল। এর আয়তন প্রায় ৬০০ বর্গমাইল। আটটি থানা নিয়ে গঠিত এই অঞ্চল—সোনারপুর প্রতাপনগর বিষ্ণুপুর বারুইপুর মগরাহাট ফলতা

ডায়মণ্ড হারবার ও কুলপি।

সুন্দরবন তিন ভাগে বিভক্ত। প্রাচীন সুন্দরবন, আবাদী সুন্দরবন ও সুন্দরবন।

প্রাচীন সুন্দরবনের আয়তন ৪০০ বর্গমাইল। হাসনাবাদ হারোয়া ভাঙর ও রাজারহাট নিয়ে এই অঞ্চল।

আমরা চলেছি আবাদী সুন্দরবনে। এই অঞ্চলের আয়তন ১৩৮৯ বর্গ-মাইল। ছয়টি থানা নিয়ে এই অঞ্চল—সন্দেশখালি ক্যানিং জয়নগর মথুরাপুর কাকদ্বীপ ও সাগর।

সুন্দরবনের অন্যান্য অঞ্চলের মত এ অঞ্চলটিও অবহেলিত। সুন্দরবনের অধিবাসীরা বহুদিন থেকেই কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের সমস্যাবলীর কথা বলে আসছেন। স্বর্গত দুই প্রধান মন্ত্রী সুন্দরবন সফরের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা তা পালন করতে পারেন নি। শ্রীমতী গান্ধীও কথা দিয়েছেন যে তিনি সুন্দরবনে আসবেন। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে সুন্দর-বনের হতভাগ্য অধিবাসীরা প্রধান মন্ত্রীর কাছে তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানাতে পারবেন। বিস্ময়ের কথা সুন্দরবনের দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সামান্যই দৃষ্টি দিয়ে থাকেন।

অথচ এমনটি হওয়া উচিত ছিল না। পশ্চিমবঙ্গকে তো বটেই, সারা ভারতকেই দেবার মত বহু জিনিস আছে সুন্দরবনের। মধু ও কাঠ সুন্দর-বনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। অথচ সে সম্পদ অবহেলিত।

সুন্দরবন পর্যটকদের কাছে ভূস্বর্গে পরিণত হতে পারে। ৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত জটার দেউল ভারতের প্রাচীন শিবমন্দিরগুলির অন্যতম, ফ্রেজার-গঞ্জের মত সমুদ্রসৈকত এদেশে খুব বেশি নেই, জম্বু ও কলস ও সাগরদ্বীপের মত অসংখ্য সুন্দর সুন্দর দ্বীপ আছে সুন্দরবনে আর আছে বিপদসঙ্কুল ও রহস্যময় অরণ্যালোক। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রচারের অভাবে সুন্দরবন আজও অজানা।

"সব ছোড় কর্, তুঁ কাঁহা যাইছ রে বাবু!"

সহসা ভুজাওয়ালা প্রশ্ন করে। সেই একই প্রশ্ন। আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে। হেসে উত্তর দিই, "আমি তো কিছু ছেড়ে আসি নি!"

"তব কাঁহে যাইছ?"

"মেলা দেখতে।"

ভুজাওয়ালা একটুকাল চুপ করে থাকে। সে আমার উত্তরে সন্তুষ্ট হয়েছে কিনা বুঝতে পারি না। একটু বাদে সে আবার প্রশ্ন করে, "মেলা কিসীকো বোলতী বাবুজি!" সে থামে কিন্তু আমার উত্তরের অপেক্ষা করে না। নিজেই উত্তর দেয়, "মিলনসেহি তো মেলা হোতী বাবুজি! ঠিক কিনা বোলেন?"

"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।"

ভুজাওয়ালা আর কোন কথা বলে না। হয়তো সেই কথাই ভাবছে আপন মনে।

আর আমি ভাবি তার কথা। ঠিকই বলেছে সে। মিলনের জন্যই তো মেলা। জাতি-ধর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, অবস্থা আর আভিজাত্য নির্বিশেষে যে মিলন, তাই তো মেলা। সেখানে শুধুই মেলা-মেশা। এই মহামিলনের জন্যই সেই সুদূর অতীতে শুরু হয়েছে সাগর মেলা। আজও চলছে। চলবে চিরকাল।

আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২৩০০ অব্দে ভগীরথ গঙ্গার ধারাকে রাজমহল থেকে সাগরে নিয়ে আসেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় জল না পাওয়ার পরে গোমুখী থেকে জলধারা এনে গঙ্গাকে সজীব করে তোলেন। গঙ্গার সঙ্গম সেই দিন থেকেই ভারতবাসীকে আকর্ষণ করেছে। তবে মনে হয় গুপ্তযুগের (চতুর্থ শতাব্দী) আগে, মহাভারতের বনপর্ব রচিত হবার পরেই গঙ্গাসাগর প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সেই হিসেবে দেড় হাজার বছরের বেশি হল গঙ্গাসাগর ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ।

পতিতপাবনী গঙ্গা ভারতের পুণ্যতম প্রবাহ। কিন্তু গঙ্গার সঙ্গম বলেই গঙ্গাসাগর পুণ্যতীর্থ নয়। গঙ্গার জন্মবৃত্তান্তের সঙ্গে গঙ্গাসাগর অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে বলেই তার প্রতি আমাদের তুর্নিবার আকর্ষণ।

স্বর্গভ্রষ্ট হবার ভয়ে ভীত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র সগররাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব এনে বেঁধে রেখেছিলেন সেই আশ্রমে। সগরের ষাট হাজার পুত্র যজ্ঞাশ্ব খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এসে হাজির হলেন। যজ্ঞাশ্ব দেখতে পেয়ে তাঁরা ভাবলেন, কপিলমুনি ঘোড়া চুরি করে এনেছেন। তাঁরা ধ্যানমগ্ন কপিলমুনিকে অপমান করলেন। তাঁর ধ্যানভঙ্গ হল। কুপিত মুনিবর ক্রুদ্ধনেত্রে সগরতনয়দের দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ভস্ম হয়ে গেলেন।

রাজা সগর দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে সব সংবাদ শুনলেন। শোকাকুল রাজা পৌত্র অংশুমানকে পাঠালেন কপিলমুনির কাছে।

অংশুমানের স্তবে তুষ্ট হয়ে মুনি তাঁকে তুটি বর দিতে চাইলেন। অংশুমান

প্রথম বরে যজ্ঞাশ্ব চাইলেন, দ্বিতীয় বরে সগরকুমারদের মুক্তি প্রার্থনা করলেন।

মুনি তাঁকে যজ্ঞাশ্ব ফিরিয়ে দিলেন। বললেন—যজ্ঞাশ্ব নিয়ে গিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ কর। কিন্তু তোমার পিতৃগণের পরিত্রাণের সময় এখনও হয় নি। তাদের উদ্ধার করবে তোমার পৌত্র। শিবকে সন্তুষ্ট করে সে স্বর্গ থেকে স্বরধুনী গঙ্গাকে এখানে নিয়ে আসবে। পতিতপাবনীর পুণ্যস্পর্শে তারা মুক্তি পাবে—বৈকুণ্ঠে গমন করবে।

যজ্ঞাশ্ব নিয়ে ফিরে গেলেন অংশুমান। সব শুনে সগর সুখী হলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ করে তিনি অংশুমানকে রাজত্ব দিয়ে বনবাসী হলেন।

অংশুমানের দেহরক্ষার পরে পুত্র দিলীপ রাজা হলেন। তিনি বহুকাল ধরে তপস্যা করেও গঙ্গাকে তুষ্ট করতে পারলেন না।

তাঁর পরে রাজা হলেন পুত্র ভগীরথ। কিন্তু রাজত্ব করলেন না তিনি। মন্ত্রীর হাতে রাজ্যভার দিয়ে তিনি চলে গেলেন হিমালয়ে। সেখানে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হলেন ভগীরথ। প্রথমে ফল খেয়ে, তারপরে পাতা খেয়ে ও অবশেষে অনাহারে তপস্যা করতে থাকলেন। হাজার বছর কেটে গেল।

শেষ পর্যন্ত প্রীত হলেন গঙ্গাদেবী। তপস্যার কারণ শুনে তিনি ভগীরথকে বললেন—আমি তোমার সঙ্গে মর্ত্যে ও পাতালে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু স্বর্গ থেকে আমি যখন মর্ত্যে অবতরণ করব তখন আমাকে ধারণ করবে কে?

ভগীরথ সে প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারলেন না।

তাঁকে নীরব দেখে গঙ্গাদেবী আবার বললেন—আমি যখন অবতরণ করব, তখন মহাদেব কেবল আমাকে ধারণ করতে পারেন। কাজেই কৈলাসে গিয়ে তুমি শিবকে সন্তুষ্ট করো।

ভগীরথ কৈলাসে গেলেন। তপস্যায় তুষ্ট করলেন মহাদেবকে। তাঁর প্রার্থনা শুনে শিব বললেন—বেশ তো, তুমি নিয়ে এসো হৈমবতীকে, আমি তাকে আমার জটাময় মস্তকে ধারণ করব।

'ভব বাক্যে ভগীরথ গঙ্গা চিন্তা করে।
জানিলেন ব্রহ্মলোকে গঙ্গা তা অন্তরে॥
আকাশ হইতে গঙ্গা দেখি শূলপাণি।
পড়িলেন হরশিরে করি ঘোরধ্বনি॥'

ভাগীরথী তখন ভগীরথকে বললেন—তোমার জন্যই মর্ত্যে এসেছি আমি। তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে নিয়ে চলো।

পথের সকল বাধাকে অতিক্রম করে ভগীরথ পতিতপাবনী গঙ্গাকে নিয়ে এলেন কপিলসদনে—

'যথায় আছিল ভস্ম সগরসন্তান।
পরশে পরম জল বৈকুণ্ঠে প্রস্থান॥'

সেই মুক্তিতীর্থে চলেছি আমি—ধন্য আমি। ধন্য এই সংখ্যাতীত পুণ্যার্থী। তাঁরাও আমারই মত মকরসংক্রান্তির শুভ প্রভাতে সাগরসঙ্গমে পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধ করবেন, পুণ্যস্নান করবেন। এই পুণ্যতিথিতেই যে পতিতপাবনী সগরসন্তানদের উদ্ধার করেছিলেন।

॥ তিন ॥

ইতিমধ্যে আমরা মাইল দেড়েক পথ পেরিয়ে এসেছি। তটভূমির চেহারা মোটামুটি একই রকম। গঙ্গার তীরে বানগাছের (mangrove) ঝোপ। সেই সঙ্গে গরাণ হেতাল ও কেওড়া গাছের বন। তারপরে ক্ষেত—দিগন্ত-বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। এখন অবশ্য অধিকাংশই শস্যহীন। ফসল কাটা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ক্ষেতের শেষে গ্রাম।

ডায়মণ্ড হারবার হারিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। তবু কেন যেন তার কথাই মনে পড়ছে আমার। সেই কথাই ভেবে চলি—

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এ জেলার শাসনকার্য শুরু করেন, তখন ডায়মণ্ড হারবার বনময়। চাষের জমি প্রায় ছিল না বললেই চলে—বিশেষ করে পূর্বদিকে। গ্রামের সাত মাইলের মধ্যেই ছিল সুন্দর-বনের সীমা।*

শাসনকার্য শুরু করার আগের থেকেই ইংরেজরা এই অঞ্চলের জরিপকার্য আরম্ভ করেন। এই কষ্টকর অথচ অপরিহার্য কার্যের সূচনা করেন উইলিয়াম ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড (১৭৫৮ খ্রীঃ)। তারপর রবার্ট বারকার (১৭৫৯ খ্রীঃ)। তিনি লবণ হ্রদ থেকে মাতলা নদীর মোহনা হয়ে কুলপি পর্যন্ত পর্যটন করেন।

বারকারের পরে ১৭৬১ সালে হিউ ক্যামেরন এই অঞ্চলের সার্ভেয়ার নিযুক্ত হন। তিনি তাঁর মৃত্যুকাল (১৭৬৪ খ্রীঃ) পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

---

* Calcutta Review, July 1889 by F. E. Parigiter.

১৭৬১-৬২ সালে অঙ্কিত তাঁর মানচিত্র পরবর্তীকালে বিশেষ মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়েছে। এমন কি ১৭৬৭ সালে জরিপের সময় রেনেল এই মানচিত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন। ক্যামেরন তাঁর মানচিত্রে তৎকালীন যমুনা নদীর ডান তীরবর্তী ভূখণ্ডকে বলেছেন, 'A fine country belonging to the Company.' আর তাঁর ভাষায় ঐ নদীর বাম তীরবর্তী ভূখণ্ড হল 'The Nawab's country.' লবণ হ্রদের একটি খালের গায়ে তিনি লিখে রেখেছেন, 'This way Honey and wax are brought to Calcutta.'

আর সুন্দরবনের ওপরে লেখা আছে, 'Here those who come to gather wax and Honey in their season, sacrifice to Juggernauth.'

ক্যামেরন তাঁর রিপোর্টে বলেছেন যে গঙ্গার পূর্বতীর অর্থাৎ এই তীর দিয়ে ভ্রমণ করার সময় তিনি কুলপি ও সাগরদ্বীপের মাঝে কোথাও কোথাও পাকা ধানের বড় বড় ক্ষেত দেখেছেন। দেখেছেন অসংখ্য গরু আর দুর্ভেদ্য জঙ্গল। তিনি কখনও দেশের অভ্যন্তর ভাগ দর্শন করেন নি।*

কিন্তু চব্বিশ পরগণা জরিপের কথা এখন থাক, আমি ভাবছি ডায়মণ্ড হারবারের কথা। ডায়মণ্ড হারবার চব্বিশ পরগণা জেলার একটি মহকুমা সদর। গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত এই শহরের প্রাচীন নাম হাজীপুর। নদীপথে কলকাতার দূরত্ব ৪৯ মাইল আর মোটর ও রেলপথে যথাক্রমে ৩২ ও ৩৮ মাইল।

সেকালের ইউরোপীয় বণিকেরা এখানে জাহাজ নোঙ্গর করতে ভালোবাসতেন। হ্যামিল্টন সাহেবের 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান গেজেটিয়ার' (১৮১৫ খ্রীঃ) থেকে জানা যায় যে সে আমলে এখানেই কোম্পানীর জাহাজ থেকে মালপত্র খালাস করা হত। জাহাজে অধিকাংশ মালও বোঝাই করা হত এখানে। জাহাজগুলি বাকি মাল সাগর রোড (Saugor Roads) থেকে নিত। তখন এখানে জাহাজ নোঙ্গর করার জন্য শেকল ছিল। আর ছিল মালগুদাম। চারিপাশের গ্রাম থেকে নাবিকরা খাবার যোগাড় করতেন।**

*Historical Records of the Survey of India. Vol. I, 18th Century, edited by Col. Pr. R. Philimore.

** Bengal Past and Present—Vol. III, No I. 1909

হিউ ক্যামেরন-এর পরে রেনেল—জেম্‌স রেনেল। তিনি ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে আসেন। রাজ্যপাল ভ্যানসিটার্ট ঐ বছর ১৬ই মার্চ তারিখে তাঁকে ক্যামেরন-এর পদাভিষিক্ত করেন। অর্থাৎ তিনি নতুন ভূখণ্ডের সার্ভেয়ার (**Surveyor of the East India Company's dominion in Bengal i. e. the New Lands**) নিযুক্ত হলেন।

৬ই মে (১৭৬০ খ্রীঃ) তিনি জরিপ শুরু করার আদেশ পেলেন। তাঁকে কলকাতার সঙ্গে যুক্ত একটি নাব্য নদী খুঁজতে বলা হয়েছিল। তিনি গঙ্গা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথ ধরে পূর্ণিয়া থেকে শ্রীহট্ট পর্যন্ত সমীক্ষা করেন। রেনেল ভূটান থেকে রাজসাহী ও ঢাকা হয়ে দিনাজপুর পর্যন্ত সমীক্ষা করেন। তিনি বঙ্গদেশের এবং সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকার মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই সে মানচিত্র একটি অমূল্য সম্পদ।

১৭৭৫ সালে রেনেল অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অক্লান্ত সেবার পুরস্কার স্বরূপ কর্তৃপক্ষ তাঁকে বাৎসরিক চারশ' পাউণ্ড বৃত্তি মঞ্জুর করে বিলেতে পাঠিয়ে দেন। রেনেল কিন্তু তার পরেও বহুকাল বেঁচে ছিলেন। তিনি ১৮৩০ সালে সাতাশি বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

১৭৭০ সালে এই অঞ্চলকে বনমুক্ত করার প্রথম চেষ্টা করেন তৎকালীন চব্বিশ পরগণার কালেক্টর জেনারেল ক্লড রাসেল। তাঁর পরে টিল্‌ম্যান হেঙ্কেল। তিনি ১৭৮৩ সালে যশোহরের জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

১৮১০ সালের কাছাকাছি এই অঞ্চলের উন্নতি বিধানের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তার মধ্যে ডায়মণ্ড হায়বারে ডক নির্মাণ ও সাগরদ্বীপে জমি উদ্ধারের পরিকল্পনা অন্যতম। শেষ পর্যন্ত ডারমণ্ড হারবারে ডক নির্মিত হয় নি কিন্তু সাগরদ্বীপের জমি উদ্ধার করা হয়েছে। তবে সে কথা এখন থাক্।

কয়েকখানি জেলে নৌকো যাওয়া-আসা করছে। আমাদের আগে আগে একখানি লঞ্চ চলেছে। হয়তো সাগরদ্বীপেই যাচ্ছে। আর চলেছে নৌকো। একটি নয়, দুটি নয়—অসংখ্য নৌকো। সামনে ও পেছনে কেবল নৌকো আর নৌকো। সবই সাগরে চলেছে। দূরের পালতোলা নৌকোগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন কয়েকটি সাদা হাঁস জলে ভাসছে।

গৈরিক গঙ্গার বুকে চলমান সাদা পাল-তোলা নৌকোর সারি, নীল আকাশের বুকে চলমান সাদা মেঘের সারি, আর ওপারে যেখানে গঙ্গা গিয়ে

দিগন্তে মিশেছে, সেখানে সবুজ গাছের সারি—এমন দৃশ্য বহুদিন দেখি নি।

দেখছি আর ভাবছি—পূর্ব ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি ও ইতিহাস গড়ে উঠেছে এই গঙ্গাকে কেন্দ্র করে। গঙ্গার প্রবাহকে অবলম্বন করে উত্তর ভারতের আর্য সভ্যতা পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে এসেছে। খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকে এই অঞ্চল নাকি গঙ্গাহৃদি তথা সুহমা ও বঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজাদের বাহুবলের ওপরে সুহমা ও বঙ্গরাজ্যের সীমারেখা নির্ভর করত।

সুহমাদের রাজ্য ছিল বড় একটি নদীর সাগরসঙ্গমে। রাজ্যের বহু স্থান ছিল জলমগ্ন ও বেতবনে বোঝাই। ঐতিহাসিকদের ধারণা সেই নদীই এই গঙ্গা আর সেই সঙ্গমই গঙ্গাসাগর।

বঙ্গদের রাজ্যও সাগরতীরে অবস্থিত ছিল। তাঁরাও নৌবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তবে তাঁদের হস্তীবাহী সৈন্য ছিল। মহাকবি কালিদাসের সময় সম্ভবত এই অঞ্চল বঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'রঘুবংশম'-এর রঘু বঙ্গদের পরাজিত করে কোন দ্বীপের মধ্যাঞ্চলে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। কালিদাস বোধ হয় সাগরদ্বীপের কথাই বলতে চেয়েছেন। বলা বাহুল্য এ কাহিনী কাল্পনিক।

আমরা এ অঞ্চলের ইতিহাস পাই মেগাস্থিনিস ও টলেমীর বর্ণনা থেকে। টলেমীর মানচিত্র দেখে মনে হয় যে সে আমলে সমস্ত গাঙ্গেয় বাংলাই ছিল কতগুলি ছোট-বড় দ্বীপের সমষ্টি।

চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াঙের বর্ণনা পড়ে জানা যায় যে এ অঞ্চল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে 'সমতট' রাজ্যের অংশ ছিল। তখন সমুদ্রতীরবর্তী এই নিম্নভূভাগ ফুলে ও ফলে পরিপূর্ণ ছিল। আবহাওয়া ছিল মনোরম আর অধিবাসীরা কৃষ্ণকায়, নাতিদীর্ঘ কিন্তু পরিশ্রমী। তিরিশটি বৌদ্ধমঠ ছিল এই অঞ্চলে। দু হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এই সব মঠে থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতেন। তবে হিন্দু মন্দির ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের সংখ্যা ছিল তাঁদের কয়েক গুণ।

তাঁর বিবরণ থেকেই প্রথম সমতট নামটি পাওয়া যায়। তখন বঙ্গদেশ তাম্রলিপ্ত, কর্ণসুবর্ণ, পুণ্ড্রবর্ধন ও সমতট প্রভৃতি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ব্রাহ্মণ-হত্যা, মদ্যপান, চুরি, পাশবিক অত্যাচার ছিল জঘন্য পাপ। সততা, ন্যায়নীতি, পবিত্রতা, দানশীলতা এবং দয়াই ছিল মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

তারপরে আমরা এ অঞ্চল, বিশেষ করে গঙ্গাসাগরের কথা পাই আল্ বিরুনি (১০৩০ খ্রীঃ) বিরচিত 'কিতাব-উল-হিন্দ্' গ্রন্থে। বিদ্যাপতি, বড়ু, চণ্ডীদাস, বাচস্পতি মিশ্র, জয়ানন্দ ও মুকুন্দরাম প্রভৃতি মধ্যযুগের কবিরা প্রত্যেকেই তাঁদের কাব্যে গঙ্গাসাগর সম্পর্কে কিছু-না-কিছু লিখে গেছেন।

জেনারেল ক্যানিংহাম ভারতের প্রাচীন ভূগোলে (Ancient Geography of India—1811 A. D.) বলেছেন, সমগ্র গাঙ্গেয় বদ্বীপ নিয়ে ছিল সমতট রাজ্য আর যশোহর ছিল সেই রাজ্যের রাজধানী। কিন্তু য়ুয়ান চোয়াঙ তাঁর বিবরণে যে দূরত্বের কথা বলেছেন, তাতে মনে হয় ঢাকা সদর কিম্বা বিক্রমপুর মহকুমার কোথাও এই রাজধানী অবস্থিত ছিল।

তবে 'সমতট' 'বঙ্গ'-রাজ্যের আর একটি নামও হতে পারে। সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপি (৩৬০ খ্রীঃ) থেকে জানা যায় যে সমতট গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমান্তে একটি সামন্তরাজ্য ছিল। 'গন্ধ বহ' কাব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, কনৌজরাজ যশোবর্মা বঙ্গদের পরাজিত করেছিলেন। অনেকের মতে কুমিল্লা শহরের ১২ মাইল পশ্চিমে কারমান্তা বা বাদকামটা ছিল সমতট রাজ্যের রাজধানী।*

তারপর থেকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত চব্বিশ পরগণার ইতিহাস নীরব। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কবি বিপ্রদাস বিরচিত কাব্য 'মনসা বিজয়' এই নীরবতার অবসান করে। কাব্যের নায়ক চাঁদসদাগর চম্পাইনগর (মানকরের কাছে কস্‌বা গ্রাম) থেকে সাগরে গিয়েছিলেন। এই কাব্যে আমরা তৎকালীন গঙ্গাতীরবর্তী কয়েকটি গ্রামের নাম জানতে পারি। এদের মধ্যে ভাটপাড়া আড়িয়াদহ ঘুসুরি ও বারুইপুর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তখন বারুইপুরের পাশ দিয়ে আদিগঙ্গা প্রবাহিত হত। আর আদিগঙ্গাই ছিল গঙ্গার প্রধান ধারা।

মঙ্গলকাব্যের পরে আমরা এ অঞ্চলের বিবরণ পাই টোডরমল্লের 'আইন-ই-আকবরী' থেকে। তখন এ অঞ্চল সাতগাঁও সরকারের (বিভাগের) অন্তর্ভুক্ত ছিল। দক্ষিণে সাগরদ্বীপ থেকে উত্তরে পলাশী এবং পূর্বে কপোতাক্ষ থেকে পশ্চিমে গঙ্গা পর্যন্ত এই বিভাগ বিস্তীর্ণ ছিল।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই অঞ্চলের প্রকৃত শাসক ছিলেন যশোহর-

---

* সুন্দরবনের ইতিহাস—এ. এফ্. এম. আবদুল জলীল।

রাজ মহারাজ প্রতাপাদিত্য। নিজেকে স্বাধীন নরপতিরূপে ঘোষণা করার পরে তিনি দিল্লীশ্বর আকবরের কয়েকজন সেনাপতিকে পরাজিত করেন। তাঁর পর্তুগীজ নৌসেনাপতি রঢা বিদ্যাধরী নদীর* উৎসে (আদিগঙ্গা থেকে সৃষ্ট) মুঘল নৌবহরকে পরাজিত করেছিলেন। এই বিজয়ের স্মারক স্বরূপ প্রতাপাদিত্যের কাকা রাজা বসন্ত রায় সেখানে একটি কালীমন্দির ও কয়েকটি অন্যান্য মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

যশোহরের গৌরবসূর্য বহুকাল অস্তমিত। আজ আদিগঙ্গাও আর নেই। কিন্তু বসন্ত রায় নির্মিত সেই মন্দির কয়টি আছে দাঁড়িয়ে। আজও তারা সগৌরবে সেকালের বাংলার নৌশক্তির বিজয় ঘোষণা করছে।**

প্রতাপাদিত্যের সেই জয় সাময়িক। শেষ পর্যন্ত মানসিংহের হাতে তিনি পরাজিত ও বন্দী হলেন। কিন্তু মানসিংহ তাঁকে দিল্লী পাঠাতে পারলেন না। বীর বাঙালী তাঁর আংটির ভেতর লুকিয়ে রাখা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

অনেকের মতে প্রতাপাদিত্য অতিশয় নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর ছিলেন। কিন্তু তাঁরাও একবাক্যে স্বীকার করেন যে, তিনি একজন বীর ও সুশাসক ছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকালে এ অঞ্চলের অনেক উন্নতি হয়েছিল।

প্রতাপাদিত্যের বাবা বিক্রমাদিত্য বাংলার শেষ পাঠান নবাব দাউদের কাছ থেকে একটি জায়গীর লাভ করেছিলেন। এই জায়গীরটির নাম ছিল 'চাঁদ খাঁ'। চাঁদ খাঁ নামে একজন নিঃসন্তান মুসলমান ঐ জায়গীরের পূর্বাধিকারী ছিলেন। তিনি মারা যাবার পর নবাব তাঁর প্রিয় সচিব বিক্রমাদিত্যকে ঐ জায়গীরটি দান করেন। তখন ঐ ভূভাগ ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। গ্রাম ও জনপদ প্রায় ছিল না বললেই চলে।

দাউদের সঙ্গে মুঘলের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী দেখে বিক্রমাদিত্য চাঁদ খাঁ-তে বসতি স্থাপন ও গড় নির্মাণ করলেন। গৌড় থেকে বহু লোক সেই নগরে চলে এলেন। দাউদ নিরাপত্তার জন্য বহু ধনরত্ন সেখানে পাঠিয়ে দিলেন।

যুদ্ধে দাউদ পরাজিত হলেন। বাংলা ও বিহার দিল্লীর সম্রাটকে ছেড়ে

---

* মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভক্ত শ্রীবাসুদেব সার্বভৌমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবিদ্যাধর বাচম্পতির নামানুসারে এই নদীর নাম হয়েছে। তিনি ক্যানিং থানার অন্তর্গত হোমড়া গ্রামে এসে কিছুকাল বিদ্যাধরীর তীরে বাস করেছিলেন।

** Bengal Past and Present—April, 1908

দিয়ে তিনি মুঘল সেনাপতি মুনাইম খাঁর সঙ্গে সন্ধি করলেন। মুনাইম গৌড়ে ফিরলেন। কিন্তু মহামারীতে মারা গেলেন। মহামারীর ভয়ে গৌড়ের অধিকাংশ বাসিন্দা চাঁদ খাঁয় পালিয়ে এলেন। গৌড় জনহীন হয়ে পড়ল আর চাঁদ খাঁ পরিণত হল সমৃদ্ধ মহানগরীতে।

মুনাইম মারা যাবার পরে দাউদ আবার মুঘলবাহিনীকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে টোডরমল্ল তাঁকে পরাজিত করেন। যুদ্ধজয়ের পুরস্কার স্বরূপ সম্রাট আকবর (১৫৮০ খ্রীঃ) টোডরমল্লকে বাংলা ও বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন।

টোডরমল্ল ঘোষণা করলেন, যিনি তাঁকে বাংলার রাজস্ববিষয়ক কাগজপত্র বুঝিয়ে দিতে পারবেন, তাঁকে তিনি পুরস্কৃত করবেন।

বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় যে দাউদের প্রিয়পাত্র ছিলেন, একথা টোডরমল্লের অজানা ছিল না। টোডরমল্ল তাঁদের সহায়তায় বাংলার রাজস্ববিষয়ক কাগজপত্র বুঝতে পারলেন। সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাঁদের জায়গীর বহাল রাখলেন এবং সম্রাটের অনুমতি নিয়ে তাঁদের দুজনকে যথাক্রমে 'মহারাজা' ও 'রাজা' উপাধি দান করলেন। ঐতিহাসিকদের ধারণা বিক্রমাদাদিত্য ও বসন্ত রায়ের সাহায্যেই তিনি 'আইন-ই-আকবরী' সংকলিত করতে সক্ষম হন।

যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা ও সম্রাটের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে বিক্রমাদিত্য পুত্র প্রতাপকে দিল্লী পাঠিয়ে দিলেন। আপন প্রতিভাবলে অল্পদিনের মধ্যেই প্রতাপ সম্রাটের প্রিয়পাত্রে পরিণত হলেন। কিন্তু তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে পিতার জায়গীর বাজেয়াপ্ত করালেন। তারপর সম্রাটের কাছ থেকে নিজের নামে চাঁদ খাঁ জায়গীরের সনদ লিখিয়ে এবং 'রাজা' উপাধি নিয়ে চাঁদ খাঁয় ফিরে এলেন। পুত্রের এই আচরণে মর্মাহত হয়ে অসুস্থ পিতা প্রাণত্যাগ করলেন। প্রতাপাদিত্য চাঁদ খাঁর জাগীরদার হলেন।

প্রতাপাদিত্য দিল্লী থেকে কমলখোজা নামে একজন হাবসী অশ্বসেনা-নায়ককে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সাহায্যে তিনি দশ হাজার অশ্বসেনা সুশিক্ষিত করলেন। পর্তুগীজ সেনাপতি রডা তাঁর গোলন্দাজ সৈন্যদের সুনিপুণ করে তুললেন। প্রতাপ ইয়োরোপীয় প্রথায় রণতরী নির্মাণ করেছিলেন।

অল্পদিনের মধ্যে চাঁদ খাঁ নৌশক্তির একটি বড় ঘাঁটিতে পরিণত হল।

প্রতাপাদিত্যের জায়গীরে জাহাজ নির্মাণ ও নোঙ্গর করার জন্য আরও তিনটি কেন্দ্র ছিল—ভুধলি, জাহাজঘাটা ও চাকরাসি। বহু নৌসেনা এই সব কেন্দ্রে সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকত।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর আগন্তুক জেসুইট মিশনারীরা বিভিন্ন রচনায় চাঁদ খাঁর উল্লেখ করেছেন। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফার্ণাণ্ডেজ ও সোসা নামে দুজন জেসুইট প্রথম এদেশে আসেন।* রাজার আমন্ত্রণে তাঁরা চাঁদ খাঁতে গিয়েছিলেন। সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে তাঁদের যেতে হয়েছিল। পনেরো-বিশ দিন সময় লেগেছিল। পথে তাঁরা বহুবার ডাকাত ও বাঘের সামনে পড়েছিলেন। বনে তখন প্রচুর মধু ও মোম উৎপন্ন হত এবং সারাদেশে তার ফলাও কারবার ছিল।

রাজা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁদের গ্রহণ করেছিলেন। এমন আন্তরিকতা নাকি কোন খৃষ্টান রাজার কাছ থেকেও তাঁরা আশা করতে পারতেন না। সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ছিল বলেই প্রতাপ অত আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁদের গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর তিনি নিজে শাক্ত হয়েও বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসকে খুব ভালোবাসতেন।

কিন্তু এখন প্রতাপাদিত্যের কথা থাক, চাঁদ খাঁর কথা হোক্। জেসুইট মিশনারীদের মতে হুগলি ও চট্টগ্রামের মাঝামাঝি কোথাও ছিল এই নগরী।

এইচ. বেভারিজ চাঁদ খাঁকে ধূমঘাট বলে সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর মতে খুলনা জেলার কালীগঞ্জের কাছে এই নগরী ছিল।**

আর একটি মত হচ্ছে, চাঁদ খাঁ ছিল সাগরদ্বীপে। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'History of Indian Shipping' বইতে এই মত সমর্থন করেছেন।

ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন যে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত সমুদ্র-উপকূলবর্তী গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে বেশ ঘন জনবসতি ছিল। কিন্তু বৃটিশ-শাসনের প্রথম দিকে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন এ অঞ্চলকে বনমুক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়, তখন এখানে মানুষ ছিল না বললেই চলে। এর প্রধান কারণ পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের

---

* Francisco Fernandez এবং Domingo de Souza.

** Were the Sundarbans inhabited in ancient times ?
J. A. S. B. Vol. X L V—1876

অত্যাচার এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তৎকালীন বাংলাদেশের সার্ভেয়ার জেনারেল মেজর জেমস রেনেল তাঁর মানচিত্রে (Sheet No. XX, 1761) উল্লেখ করেছেন যে, মগ জলদস্যুদের অত্যাচারে বাখরগঞ্জ জেলার সমস্ত দক্ষিণাঞ্চল জনহীন হয়ে পড়েছিল। ভূগোলবিদ নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেছেন যে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে সমগ্র সুন্দরবন জনহীন হয়ে পড়ে।*

আরও কয়েকটি কারণে এই সব অঞ্চলের বাসিন্দারা বাড়িঘর ছেড়ে দেশের অভ্যন্তরে চলে যায়—ধস জলোচ্ছ্বাস ঘূর্ণিঝড়। বেশি দিনের কথা নয়। ১৯৪৭ সালের ১৩ই জুলাই পর্যন্ত অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয়েছে, 'Cyclone disturbances are familiar phenomena at the head of Bay of Bengal.' এই প্রসঙ্গে ঐ পত্রিকাতে বলা হয়েছে যে, ১৮৭৬ সালের ঝড়ে এই অঞ্চলে চার লক্ষ লোক মারা গিয়েছে এবং ১৫৮৪, ১৬৮৮ ও ১৮২২ সালেও ঐ ধরনের ঘূর্ণিঝড় হয়ে গেছে।

১৮৬৪ সালের ঝড়ও ডায়মণ্ড হারবারের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল। সেই ঝড়ে এখানকার অধিকাংশ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হন। নদীতীরের এক মাইলের মধ্যে প্রতি পাঁচজন বাসিন্দার চারজন মারা গিয়েছিলেন।

এই অঞ্চল জনহীন হয়ে পড়ার আর একটি কারণ জলাভাব। আর দুঃখের কথা সে অভাব এখনও রয়ে গেছে।

॥ চার ॥

ফুলওয়ালার ধাক্কায় বাস্তবে ফিরে আসি। সে দি'মাকে দেখিয়ে দেয়। দি'মা ইশারা করে ডাকছেন আমাকে। বৈষ্ণবী অবশ্য এখন ব্যস্ত। সে বৃদ্ধ বৈষ্ণবকে কি যেন খাওয়াচ্ছে। তাহলেও সে রয়েছে। যাবো ভেতরে?

"বলি, ও আবাগীর বেটা, কানে কথা যাচ্ছে? একবার দয়া করে এদিকে এসো না, আমি ধন্য হই।" দি'মা গলা ছেড়েছেন এবারে।

না, আর দেরি করা উচিত হবে না। তাছাড়া না গিয়েই বা উপায় কি? রাতে তো নৌকোর ভেতরে ঢুকতেই হবে।

* Antiquity of the Lower Ganges and its Courses.

কাছে আসতেই দি'মা বলেন, "তা মালপত্তরটুকু কোথায় রাখা হয়েছে?"

"কার?" ঠিক বুঝতে পারি না।

"শোন, তোমরা আমার নাতির কথা শোন।" দি'মা সহযাত্রীদের দিকে তাকান।

বৈষ্ণবী এ সুযোগ ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়। সে সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন কাটে, "নাতি-দি'মার কথায় আমরা থাকতে চাইনে।" সে নিজের কাজ করে চলে।

দি'মা মনে মনে তার কথায় যত অসন্তুষ্টই হোন, মুখে কিছু বলেন না। তিনি আমাকে বলেন, "কার আবার, তোর?"

"ঐ যে, বাইরে রেখেছি।" আমি হাত দিয়ে রুক্স্যাকটা দেখিয়ে দিই।

"ওখানে পড়ে থাকলেই চলবে, না ওটাকে নিয়ে আসতে হবে?"

"কিন্তু জায়গা নেই যে, রাখব কোথায়?"

"আমার মাথায়। বলি চোখের মাথা কি একেবারে খেয়েছিস? এখানে কতখানি জায়গা পড়ে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছিস না?"

"আমি আপনার কাছে বিছানা পাতব?"

"শোন কথা, আমার কাছে পাতবি না তো কোন্ সোমত্ত মেয়ের পাশে শুবি?"

বৈষ্ণবী খিলখিল করে হেসে ওঠে।

লজ্জায় কান দুটো গরম হয়ে যায়। আমি কোন কথা বলতে পারি না।

দি'মা বোধ করি বুঝতে পারেন বৈষ্ণবীর সামনে কথাটা বলা ঠিক হয় নি তাঁর। তিনি তাই গম্ভীর হয়ে যান। একবার বৈষ্ণবীর দিকে তাকিয়ে আমাকে বলেন, "আমার পাশের এই খালি জায়গাটুকু দখল করে নে।"

আমি তাঁর আদেশ পালন করি। রুক্স্যাকটা ভেতরে নিয়ে আসি। আর সেটা দেখেই দি'মা চেঁচিয়ে ওঠেন, "এটা আবার কিসের থলি রে?"

কেবল দি'মা কেন, আশেপাশের প্রায় প্রত্যেকেই বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে আছে। বাধ্য হয়ে বলতে হয় আমাকে, "পাহাড়ে মাল বইবার জন্য বিশেষ ধরনের থলি এটা, একে বলে রুক্স্যাক্।"

"কি বলে?" দি'মা জিজ্ঞেস করেন।

"রুক্স্যাক্।" আমি কিছু বলতে পারার আগেই বৈষ্ণবী উত্তর দেয়।

দি'মা তার দিকে তাকান। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, তার এই অযাচিত

উত্তরে তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। পাছে তিনি আবার তাকে কিছু বলে ফেলেন, তাই বলতে থাকি, "এই থলির বৈশিষ্ট্য, আকারের তুলনায় হাল্কা, এর ভেতরে অনেক জিনিস ধরে, আর বোঝাই থলি পিঠে নিয়ে অনায়াসে দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়া যায়।"

"কারণ ?" বৈষ্ণবী জিজ্ঞেস করে।

দি'মা কট্‌মট করে তার দিকে তাকান। তবু উত্তর দিই আমি। বলি, "এমন ভাবে তৈরি যে সর্বদা পিঠের সঙ্গে লেগে থাকে এবং বইতে কোন অসুবিধা বোধ হয় না।"

"তা তোর বিছানা কোথায় ?" পাছে বৈষ্ণবী আবার কিছু জিজ্ঞেস করে ফেলে, তাই তাড়াতাড়ি দি'মা আমাকে বলেন।

হেসে বলি, "এর মধ্যে আছে।"

"এর মধ্যে ? বিছানা ! তুই কি জাদু জানিস নাকি রে ?"

"না, দি'মা। আমার বিছানাটা একটু অন্যরকম।" বলতে বলতে রুক্‌স্যাক খুলে এয়ার-ম্যাট্রেস নামাই।

দি'মা কাছে নিয়ে পরীক্ষা করেন। তারপরে বলেন, "রবাটের বিছানা ! এর মধ্যে তোষক বালিশ সব আছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ফুঁ দিয়ে হাওয়া ভরলেই চমৎকার বিছানা হয়ে যাবে।"

"তা এটাও কি পাহাড়ে যাবার জিনিস নাকি রে ?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু শুনেছি গঙ্গাসাগরে খুব শীত। আর নৌকোতেও রাতে বেশ শীত লাগবে। তুই লেপ আনিস নি ?"

"এনেছি।"

"কোথায় ?"

"এই যে থলির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে।"

"এ আবার কেমন লেপ ?"

আমি স্লীপিং-ব্যাগটা খুলে দি'মার হাতে দিই।

"এইটে লেপ ! এত হাল্কা ?"

"হ্যাঁ, মেলে দেখুন না।"

তিনি বলে ওঠেন, "এ তো দেখছি একটা পাশবালিশের খোল !"

"না, এটা স্লীপিং-ব্যাগ বা ঘুমোবার থলি। এর ভেতরে ঢুকে ঐ চেনটা

টেনে দিলে আপনার গঙ্গাসাগরের শীতের সাধ্য নেই যে ভেতরে ঢোকে।"

"দমবন্ধ হয়ে মারা যাবি যে !"

"না, নাকটা বাইরে থাকবে।"

"তাই বল্ ! কিন্তু এটা এত গরম কেন ? কি দিয়ে তৈরি ?"

"নাইলন আর পাখির পালক।"

"তাহলে তো গরম হবেই।" মাঝখান থেকে বৈষ্ণবী বলে ওঠে, "দেখি, দেখি জিনিসটা কেমন ?" সে দি'মার হাত থেকে স্লীপিং-ব্যাগটা টেনে নেয়। কয়েক মিনিট ধরে পরীক্ষা করে। তারপরে সোজাসুজি আমাকে প্রশ্ন করে, "এটাও কি তোমার হিমালয়ে যাবার জিনিস ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি হিমালয়ে গিয়েছ ?"

আমি ঘাড় নাড়ি। কিন্তু সে কিছু বলতে পারার আগেই দি'মা জিজ্ঞেস করেন, "কোথায় কোথায় গিয়েছিস বাবা ? গঙ্গোত্তরী ?"

"হ্যাঁ।"

"যমুনোত্রী ?" এবারে প্রশ্ন করে বৈষ্ণবী।

বলি, "হ্যাঁ।"

"ধন্যি তোর জীবন বাবা ! কত পুণ্যি করেছিস ! মা-গঙ্গা মঙ্গল করুন। ঠাকুর তোর ভাল করুন।" দি'মা তাঁর ঠাকুরকে প্রণাম করেন।

বৈষ্ণবী হেসে বলে, "যত ইচ্ছে নাতির জন্য ভগবানকে ডাকুন। তবে তার কোন দরকার আছে বলে মনে হচ্ছে না। কারণ আপনার নাতিটিকে যত ভাল ভেবেছিলাম তত ভাল নয় দিদিমা, তা আগেই বলে রাখছি।"

"আ মর !" দি'মা আবার ক্ষেপে ওঠেন, "খারাপ হতে যাবে কোন্ দুঃখে ? খারাপ হলে কি এত মানুষ থাকতে ওর দিকে আমার দিষ্টি পড়ত ? কিন্তু তোমাকে বলে রাখছি বাছা, তুমি তোমার বৈষ্ণবকে নিয়ে থাকো, ওর দিকে নজর দিও না।"

ছি ছি ! দি'মা এ-সব কি বলছেন ? সবাই শুনছে। বৈষ্ণবও পাশেই রয়েছেন, কিন্তু আমার পক্ষে এ প্রসঙ্গে অংশ নেওয়া সম্ভব নয়। আমি তাই মুখ ঘুরিয়ে এয়ার-ম্যাট্রেসে হাওয়া ভরতে থাকি।

তবে আমার শঙ্কা অমূলক। বৈষ্ণবী দি'মার কথায় বিন্দুমাত্র অপমানিত হয় নি। নইলে সে হাসতে হাসতে কেমন করে বলছে, "আপনি ওকে যে

রকম আগলে রেখেছেন, আমার সাধ্য কি ওর দিকে নজর দিই?”

এই বেহায়া মেয়েকে কি আর বলবেন দি'মা! তাই তিনি বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে আমার এয়ার-ম্যাট্রেস ফুলানো দেখতে থাকেন। আর আমি নীরবে আমার কাজ করে যেতে থাকি।

এত মানুষ থাকতে দি'মা কেন আমাকে এত খাতির করছেন জানি না। জানি না তিনি আমার মধ্যে কি অসাধারণত্ব খুঁজে পেয়েছেন। তবে অন্যান্য যাত্রীদের কাছে আমি এখন রীতিমত অসাধারণ হয়ে উঠেছি। তাঁরা যেন হঠাৎ আমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলেন। নানা প্রশ্ন করছেন আমাকে। ভাগ্যিস পর্বতারোহণের এই উপকরণ কটি সঙ্গে এনেছিলাম!

অতর্কিতে নৌকোটা প্রচণ্ডভাবে দুলে ওঠে। অপ্রস্তুত যাত্রীরা অনেকেই এ ওর ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে নৌকোয় একটা আতঙ্ক দেখা দেয়। প্রায় একই সঙ্গে সকলে কেঁদে ওঠে, 'গেলাম।' 'মরলাম।' 'ঠাকুর রক্ষা করো।' 'মা-গঙ্গা বাঁচাও।'

সকাতর প্রার্থনায় নৌকো ভরে উঠেছে। নৌকোটাও কিন্তু দুলেই চলেছে। কি ব্যাপার? বান এল নাকি?

যে মাল্লাটি নৌকার ভেতরে বসে জল ছেঁচছিল, সে কি যেন বলছে।

লোকটি জল ছেঁচা বন্ধ করে অনেক কষ্টে যাত্রীদের খানিকটা শান্ত করতে সমর্থ হয়। এবারে তার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। সে বলছে, “আপনারা ভয় পাবেন না। মা-গঙ্গায় মাঝে মাঝে এমন ঢেউ হয়। এখুনি মা আবার শান্ত হবেন। আপনারা চুপ করে বসে থাকুন।”

মাল্লার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নদী শান্ত হয়। নৌকোর দোলা কমে যায়। আতঙ্কিত যাত্রীরা আশ্বস্ত হন।

আস্তে আস্তে সবাই পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছেন। মাল্লা আবার জল ছেঁচতে শুরু করেছে। নৌকোর মাঝখানে ছইয়ের মধ্যে দুদিকে খানিকটা অংশ ফাঁকা। তারই সোজাসুজি পাটাতন তুলে নিয়ে সেই ফাঁকা জায়গা দিয়ে মাল্লা জল ছেঁচে নদীতে ফেলে দিচ্ছে। আমাদের পাটাতনের নিচে আর একটি পাটাতন আছে। সেখানে মাঝিরা থাকে। ওরা পালা করে বিশ্রাম নেয়। ব্যবস্থাটা মন্দ নয়।

যাত্রীরা পূর্বাবস্থায় ফিরে এলেও আগের গালগল্প ও তাস-দাবা আর তেমন জমছে না। তার বদলে শুরু হয়েছে নৌকোযাত্রার গল্প। কবে

কোথায় কিভাবে কার নৌকো ডুবে গিয়েছিল কিম্বা ডুবতে ডুবতে রক্ষা পেয়েছিল, তারই অভিজ্ঞতার কথা ও কাহিনী সহযাত্রীর কাছে সগৌরবে বর্ণনা করছেন। ওঁদের গল্পের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করা উচিত হবে না। নইলে সামান্য একটু ঢেউয়ের দোলায় ওঁরা অমন কান্নাকাটি জুড়ে দেবেন কেন?

দি'মা পানের বটুয়া বার করছেন। জিজ্ঞাসা করি, "ওটা খুলছেন যে?"

"পান খাব।"

"খাবার খাবেন না?"

"না, খিদে নেই।"

আমাকে দেখি খিদে না থাকা সত্ত্বেও অতগুলি মুড়ি খাওয়ালেন! দিন তো মুড়ির টিনটা…"

হো হো করে হেসে ওঠেন দি'মা। হাসি থামলে বলেন, "শোন, পাগল ছেলের কথা শোন। আমি বামুনের বিধবা, আমি মুড়ি খাবো?"

"তাহলে ওগুলো এনেছেন কেন?"

"তোর জন্য।"

"কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হবার আগেই তো মুড়ির টিন নিয়ে নৌকোয় উঠেছেন!"

একটু হেসে দি'মা বলেন, "আমি যে জানতাম, তোর সঙ্গে দেখা হবে।"

বিস্মিত হই। কিন্তু বাস্তবের প্রয়োজনে সংসারের বহু বিস্ময়কে মেনে নিতে হয়। আমার কিম্বা আমার মত কারও সঙ্গে দেখা হবে বলে ছোট এক টিন মুড়ি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন দি'মা। হেসে বলি, "আমার সঙ্গে দেখা হবে বলে আমার জন্য মুড়ি নিয়ে এসেছেন, আর নিজের জন্য খাবার আনেন নি?"

"এনেছি বৈ কি, তা রাতে খাব।"

"সারাদিন না খেয়ে থাকবেন? আমার সঙ্গে পাঁউরুটি ও জেলী রয়েছে, দুখানি দিই।"

আবার উচ্চস্বরে হেসে ওঠেন দি'মা। তারপরে বলেন, "শোনো, আমার নাতির কথা শোন তোমরা—আমি পাঁউরুটি খাব!"

আর কিছু বলতে পারার আগেই বৈষ্ণবী একটি আপেল ও কমলালেবু দি'মার হাতে দিয়ে বলে, "এই দুটো খেয়ে নিন দিদিমা, নইলে পিত্ত পড়ে যাবে। দেখছেন না ওরা কেমন বমি করছে?"

"কিন্তু তাই বলে তুই ঐ অসুস্থ মানুষটার জন্য আনা ফল আমাকে খেতে দিচ্ছিস ?"

"অনেক আছে। আপনি এ দুটো খেয়ে নিন।" একটু থেমে সে বৃদ্ধ বৈষ্ণবের শিয়র থেকে ছোট ছুরিখানা এনে আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, "ওগো গোসাঁই, দিদিমাকে আপেলটা কেটে দাও দেখি।"

আমি নীরবে তার নির্দেশ পালন করি। গোসাঁই শব্দটা কেন যেন বার বার মনের ভেতরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।"

আপেলটা কেটে দি'মার দিকে বাড়িয়ে দিই। দি'মা বলেন, "তুই একটা টুকরো নে।"

"কেন ?"

"কেন আবার, খাবি।"

"না। আমি এই একবাটি মুড়ি গিলেছি, আপেলটা আপনি খেয়ে নিন। আমি ছোট ছোট টুকরো করে দিয়েছি, খেতে অসুবিধে হবে না।''

অগত্যা দি'মাকে ভালমানুষের মত খেতে শুরু করতে হয়। আমি নীরবে বসে থাকি। গলুইতে একটা কয়লার উনুন ধরিয়ে একজন মাল্লা ওদের রাতের রান্না চড়িয়েছিল। এতক্ষণ সেদিকে কারও খেয়াল হয় নি। এবারে সবার নজর পড়ে। না পড়ে উপায় নেই। কারণ সে শুঁটকি মাছ রান্না করছে। শুনেছি এই বস্তুটি খেতে উপাদেয় কিন্তু রান্নার সময়ে সাতবাড়ির মানুষকে অস্থির করে তোলে। এখানে বাড়ি নেই, আছি আমরা। শুঁটকির সুবাসে আমাদের পেটের মুড়ি উঠে আসতে চাইছে। নাকে রুমাল চেপে অনেক কষ্টে তাকে আটকে রাখতে হচ্ছে। তবু আমরা নীরবে এই শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছি—'আপ রুচি খানা'! মাঝিদের শুঁটকি সাবাড় করার অধিকার শাশ্বত। স্বাধীন দেশ, কাজেই সেই অধিকারে বাধা দিয়ে আমরা ওদের ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারি না।

কিন্তু দি'মাকে নিয়ে হয়েছে বিপদ। তিনি এসব গণতান্ত্রিক নিয়মের ধার ধারেন না। তাই তিনি সেই মাল্লার উদ্দেশে চিৎকার করে উঠলেন, "এই পচাখেগোর ব্যাটা, কি রান্না করছিস র‍্যা ?''

''আইজ্ঞে মাঠাইন মাছ।''

"মাছ ! মাছ যেন আমার বাপের জম্মে আর কেউ কখনও রান্না করে নি ! বলি গঙ্গাসাগরের পথে ঐ পচা মাছগুলি কি না খেলেই নয় ?''

"কাইল থেইকে আর রাঁধব নি মাঠাইন।"

মাল্লা সন্ধি করে। কিন্তু দি'মা বোধ করি এ শর্তে সন্তুষ্ট নন। তাই তিনি কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন আবার। কিন্তু আমি তাঁকে বাধা দিই, "আহা ছেড়ে দিন না আজকের দিনটা। বলছে তো কাল থেকে আর এ মাছ রান্না করবে না।"

"আজ বাঁচলে তো কালকের কথা ভাবব। প্রাণ যে বেরিয়ে যেতে চাইছে বাবা।"

"যাবে না।" আমি আশ্বাস দিই দি'মাকে। এখন কেবল একটু কষ্ট করে বসে থাকুন। গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান করবার আগে আপনার কিস্‌সু হবে না।"

"ঠিক বলছিস তো বাবা? আমি কি পারব?"

"নিশ্চয়ই পারবেন। আমি সাগরসঙ্গমে আপনাকে স্নান করাবই করাবো।"

"তাই করাস বাবা, মা-গঙ্গা তোর মঙ্গল করবেন।"

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি, দি'মার মনটা শুঁটকি মাছ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

চড়া রোদ উঠেছিল সকাল থেকেই। সে রোদ এখনও রয়েছে, থাকবে সারাদিন। থাকাই ভাল। মেঘ দেখলেই মেতে ওঠে গঙ্গা। সে মাতনে মুশকিল হয় মানুষের। তাই রোদের ওপর রাগ করে নি কেউ। তবু সবাইকে ভেতরে চলে আসতে হল, কারণ বাতাসটা হঠাৎ পড়ে গেল। পাল নামিয়ে বৈঠা হাতে নিতে হল মাল্লাদের। ওরা দাঁড় বাইতে শুরু করল। গলুই ছেড়ে যাত্রীদের চলে আসতে হল ভেতরে। এসে আবার অনেকে একটু কাত হবার চেষ্টা করছেন। ফলে ঠাসাঠাসি অবস্থা।

ফুলওয়ালা কখন যে আমার পেছনে এসে বসেছে টের পাই নি। পিঠে একটা চাপ পেয়ে পেছন ফিরে তাকে দেখতে পাই। সে বলে, "ঠাকুরবাবার খাবার জন্যি কিছু নেছেন?"

বুঝলাম ঠাকুরবাবা বলতে সে কপিলমুনিকে বোঝাতে চাইছে। বলি, "না।"

ফুলওয়ালা বোধ হয় আরও কিছু বলত। কিন্তু সে আর সুযোগ পায় না। হঠাৎ দি'মার ধাক্কা খেয়ে তাঁর দিকে ফিরতে হয় আমাকে। দি'মা বলে ওঠেন, "আমি জানতাম, বঝলি রে, আমি জানতাম যে গেরো একটা জুটে যাবেই।"

"মানে?"

"মানে তুই।"

"বুঝতে পারছি না।"

"আমি জানতাম আমার ওপরে খবরদারী করার লোক একটা না একটা জুটে যাবেই।"

এইবারে বুঝতে পারছি ব্যাপারটা। আপেল খাওয়ার কথা তিনি এখনও ভুলতে পারেন নি। কিন্তু সে প্রসঙ্গ না তুলে হেসে বলি, "সব জায়গাতেই এ রকম বুঝি জুটে যায় আপনার?"

"না হলে আর বলছি কেন! তবে কি জানিস, সেবার দ্বারকায় গিয়ে যেমন গেরোর পাল্লায় পড়েছিলাম, তেমনটি আর কোনদিন পড়ি নি।"

"কি রকম?"

"সেদিন সকালে গোমতীতে স্নান করে দ্বারকানাথ মন্দিরে চলেছি রণছোড়জীকে দর্শন করতে। হঠাৎ একজন সুশ্রী যুবা-সন্ন্যেসী আমার পথ আগলে দাঁড়ায়, বলে—'ভবতী ভিক্ষাং দেহি'।

"চোখাচোখি হতে দুজনেই চমকে উঠি। সন্ন্যেসী তাড়াতাড়ি হাত গুটিয়ে নিয়ে পাশ কাটিয়ে চলতে থাকে। আমি পেছন থেকে বলে উঠি—কে রে, শিবে না?

"কিন্তু কাকে বলা! সন্ন্যেসী তখন হনহন করে হাঁটছে। আমিও বাব্বা ছেড়ে দেবার পাত্রী নই। ধাওয়া করলুম তার পেছনে। সঙ্গীরা বলল—কোথায় যাচ্ছিস? আমি ইশারায় তাদের সেখানে দেরি করতে বলে ছুটলুম সেই সন্ন্যেসীর পেছনে।

"যাবে কোথায়? পেছন থেকে ধরে ফেললুম একখানা হাত। সে বিরক্ত স্বরে বলে ওঠে—আঃ ঠাকুমা! কেন আবার এখেনে এসে জ্বালাতন করছ?

"বললাম—বোল-চাল তো খুব শিখেছিস, গেরুয়া পরে সন্ন্যেসী সেজেছিস, ঘটা করে আবার সমস্কৃত বলা হচ্ছে!

"সে বলে—সাজব কেন? আমি যে সন্ন্যাসী—স্বামী শিবানন্দ।

"ঝাঁটা মারি তোর সন্ন্যাসের মুখে। তা কমলাকে কোথায় রেখেছিস? মেয়েটা বেঁচে আছে তো?

"কে জানে? তোমার কমলিকে আমি লক্ষ্ণৌতে ছেড়ে এসেছি। ও-সব মায়ার বাঁধনে আমি আর বাঁধা পড়ছি নে। আমি আজ মোহমুক্ত মায়ামুক্ত

স্বামী শিবানন্দ।

"তা যাই হোস বাবা, একবার যখন তোকে পেয়েছি, আর ছাড়ছি নে। ভাস্থর-পো আজও তোর জন্য কেঁদে কেঁদে হয়রান হচ্ছে। তুই আমার সঙ্গে ফিরে চল। চল্‌, লক্ষ্ণৌ থেকে কমলাকে নিয়ে আমরা কলকাতায় যাই।"

একবার থামেন দি'মা। কি যেন ভাবেন একটু। তারপরে আমাকে বলেন, "এ গেরো নয় তো কি? কোথায় কলকাতা আর কোথায় দ্বারকা! সেখেনে গিয়ে শিবের সঙ্গে দেখা। তেমনি কোথায় ছিলাম আমি, আর কোথায় ছিলি তুই! চলেছি সাগরে, দেখা হল তোর সঙ্গে।"

আবার থামেন দি'মা। তারপর কণ্ঠস্বরকে আরও খাদে নামিয়ে করুণ স্বরে বলেন, "তা বাবা তুই যেন আবার শিবের মতন আমাকে ফেলে চলে যাস নে।"

দি'মা আমার একখানি হাত ধরেন, ঠিক এমনি হাত ধরেই হয়তো সেদিন স্বামী শিবানন্দকে তিনি এই একই অনুরোধ করেছিলেন।

আমি আশ্বাসভরা স্বরে বলি, "না না, আমি কেন তোমাকে ফেলে চলে যাব? আমি তো আর সন্ন্যাসী নই। তাছাড়া আমার যে কোনকালে কম্‌লি বলেও কেউ ছিল না!"

যেন আর্তনাদ করে ওঠেন দি'মা, "বলিস নে বাবা, বলিস নে সেই হত-ভাগিনীর কথা। অমন দুর্ভাগ্য নিয়ে যেন কেউ জন্মায় না এ সংসারে। ভালোবাসার খেসারৎ সে যে ভাবে দিয়েছে, পরম শত্‌তুরকেও যেন সে ভাবে না দিতে হয়।"

"কি হয়েছিল তার?"

"এখন থাক্‌ সে কথা, আর এক সময় বলব।" দি'মা বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন।

আমিও আর তাঁকে বিরক্ত না করে বাইরে বেরিয়ে আসি। আমাদের বাঁদিকে ছোট একটি খাল—জল নেই বললেই চলে। এদিককার অধিকাংশ খাল বা খাঁড়ির এই একই অবস্থা। ভাঁটার সময় এমনি শুকিয়ে যায়।

খালের মুখে কাদায় দাঁড়িয়ে আছে কয়েকখানা নৌকো। খানিকটা দূরে খালের ওপর একটি বাঁধ। বাঁধের ওপারে জল আছে। স্লুইস গেট বন্ধ করে দিয়ে জল বেঁধে রাখা হয়েছে।

এই খাল চলে গেছে কুলপি। নদী থেকে মাইলখানেক দূরে একটি সমৃদ্ধ

জনপদ। ডায়মণ্ড হারবার কাকদ্বীপ বাসপথের ওপরে অবস্থিত। প্রাচীন গ্রাম। পরিত্যক্ত একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও কোনমতে টিঁকে আছে। সবাই বলে, কুলপির প্যাগোডা বা মনিবিবির কবর।

কুলপির এই সমৃদ্ধির প্রধান কারণ এখানে নদীগর্ভ বেশ গভীর—জাহাজ নোঙ্গর করার আদর্শ স্থান। তাই সেকালে কলকাতাগামী ও সমুদ্রগামী জাহাজগুলি বিশ্রামের জন্য নোঙ্গর করত এখানে। সারেঙ্গ ও খালাসীরা নেমে আসত তীরে। ফুর্তি ও কেনা-কাটা করত। তবে তীরভূমি ছিল বনময় ও কর্দমাক্ত। কুলপি ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। এই সম্পর্কে ১৮১৫ সালে রচিত হ্যামিল্টন-এর 'ইস্ট ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ারে' বলা হয়েছে—

'The crews of the ship stationed here suffer dreadfully from its extreme unhealthiness, numbers daily falling sacrifices to the pestilential exhalations from the rotten jungle and mud.'

কুলপি খালের মুখ ছাড়িয়ে এগিয়ে এসেছি আমরা। গঙ্গা একই রকম। তেমনি দিগন্তপ্রসারী গৈরিক ধারা। আমি অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি তার দিকে। মনে পড়ছে বদ্রীনাথের অলকানন্দা, কেদারনাথের মন্দাকিনী ও গোমুখীর ভাগীরথীর কথা। অসংখ্য উপনদীর প্রবাহে পরিপুষ্ট হয়ে দেবপ্রয়াগে এক ধারায় পরিণত হয়েছে। সেই মিলিত ধারাই গঙ্গা।

শিবালিক পর্বতমালা অতিক্রম করে গঙ্গা এসেছে ঋষিকেশে। সেখান থেকে হরিদ্বারে—হিমালয়দুহিতা এসেছে সমতল ভারতে।

বহুবার ভেবেছি হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত একটি নৌকাভিযানের আয়োজন করব। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে পারলাম না। জানি না আমার এ আশা শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হবে কিনা।

আমি সে নৌকাভিযানের আয়োজন করতে পারি নি কিন্তু ইতিপূর্বে তা আয়োজিত হয়েছে। করেছেন দুজন য়ুরোপীয়ান। তাঁরা ১৯৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে নৌকো করে হরিদ্বার থেকে কলকাতায় আসেন। তারপরে 'জলবিজয়' জাহাজে করে 'স্যাণ্ড-হেড্' পর্যন্ত যান। **Eric Newby** তাঁর **'Slowly down the Ganges'** বইতে তাঁর সেই বিচিত্র অভিযানের কথা লিখেছেন।

ভরসা করি অদূর ভবিষ্যতে বাঙালী তরুণরা আমার ভাবনাকে বাস্তব

রূপ দেবে। কারণ ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মকে জানার এর থেকে সহজতর উপায় আর কিছু হতে পারে না।*

কিন্তু গাঙ্গেয় সভ্যতার কথা থাক্, গঙ্গার প্রবাহপথের কথা ভাবা যাক্। হরিদ্বারের গঙ্গা দক্ষিণবাহী। তারপরে সে দক্ষিণ-পূর্ব বাহিনী হয়ে প্রবাহিত হয়েছে মোরাদাবাদ, সাহারানপুর, মুজফফ্‌রনগর, বুলন্দশহর ও ফররুখাবাদ প্রভৃতি জেলার ভেতর দিয়ে। এসেছে পূর্ণকুম্ভের পুণ্যতীর্থ প্রয়াগে—মিলিত হয়েছে যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গে। উৎস থেকে ৬৬৮ মাইল পরিক্রমা পূর্ণ করেছে। দুর্বার গতিতে গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছে। বাঁদিক থেকে গোমতী ও ঘর্ঘরা এসে মিলেছে তার সঙ্গে। সে উত্তরবাহিনী হয়ে রামনগর থেকে এসেছে বরুণা ও অসি-বিধৌত মোক্ষক্ষেত্র বারাণসীধামে—বিশ্বের প্রাচীনতম মহানগরী কাশীতে।

তারপরে গঙ্গা পূর্ববাহিনী হয়ে প্রবেশ করেছে বিহারে। বাঁদিক থেকে কর্ণালী রাপ্তী গণ্ডক বাগমতী ও কোশী এসে মিলিত হয়েছে তার সঙ্গে। আর ডান দিক থেকে মিলেছে শোন।

রাজমহল পর্বতকে অতিক্রম করে গঙ্গা বাংলার সমতলভূমিতে অবতরণ করেছে। ভৌগোলিকদের মতে এককালে সমুদ্র রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ফলে সেইখানেই ছিল সাগরসঙ্গম।

কিন্তু সে-কথা এখন থাক্। সে-সব কথা আর একদিন ভাবা যাবে। আজ আমি ভাবছি গঙ্গার কথা। আমাদের কথা।

রাজমহল থেকে মাইল বিশেক পূবে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা এসেছে গিরিয়ায়, তারপরে হয়েছে দ্বিধাবিভক্ত। একটি ধারা চলে গিয়েছে দক্ষিণ-পূবে আর একটি এসেছে দক্ষিণে।

* গৌরবের কথা রাকেশ তেওয়ারী এবং অভয় আগরওয়াল নামে দুটি ভারতীয় তরুণ আমার ভাবনাকে আংশিক বাস্তব রূপ দিয়েছে। ১৫ ফুট লম্বা ও ৬ ফুট চওড়া একখানি ছইহীন টিনের নৌকোয় দাঁড় বেয়ে তারা গত ২২শে মে (১৯২৬) দিল্লী থেকে কলকাতায় পৌঁচেছে। দেড় হাজার মাইল এই জলপথ পাড়ি দিতে তাদের ঠিক দু-মাস সময় লেগেছে। ভারতের জাগ্রত-যৌবনের প্রতীক এই দুই দুঃসাহসী অভিযাত্রীকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই—লেখক।

এই দক্ষিণবাহিনী ধারাই গঙ্গা—আমাদের গঙ্গা। য়ুরোপীয়রা নাম দিয়েছিলেন হুগলী নদী। অনেকে বলে ভাগীরথী, কিন্তু আমরা সে-সব নাম মানি না। আমাদের কাছে সে গঙ্গা, শুধুই গঙ্গা। মুর্শিদাবাদ গৌড় নদীয়া শান্তিপুর সপ্তগ্রাম মাহেশ কলকাতা ডায়মণ্ড-হারবার ও গঙ্গাসাগরের গঙ্গা।

গিরিয়া থেকে যে ধারাটি দক্ষিণ-পূবে চলে গিয়েছে, সে ধারার নাম পদ্মা। সে গোয়ালন্দের কাছে ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তারপরে চাঁদপুরের কাছে মিলিত হয়েছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে—নাম হয়েছে মেঘনা। বরিশাল ও নোয়াখালি জেলার মধ্য দিয়ে মেঘনা মিলিত হয়েছে সাগরে। গোমুখী থেকে মেঘনা-সঙ্গম ১৬৮০ মাইল।

যেখান থেকে মূল নদী দ্বিধাবিভক্ত, সেখান থেকেই গঙ্গার বদ্বীপ আরম্ভ হয়েছে। মূল দুটি ধারা ও তাদের সাতটি প্রধান শাখানদী বদ্বীপের বিভিন্ন স্থান দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মুখে সাগরে পড়েছে। গঙ্গাসাগর এই বদ্বীপের পশ্চিম-প্রান্তে ও মেঘনামুখ পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। দুই সঙ্গমের দূরত্ব প্রায় ২৭০ মাইল। গোমুখী থেকে গঙ্গাসাগর ১৫৪০ মাইল। আর এই বদ্বীপের ক্ষেত্রফল ২৮,০৮০ বর্গমাইল।

গঙ্গা যে স্থান অধিকার করে আছে, তার ক্ষেত্রফল ৩,৯১,১০০ বর্গমাইল। এককালে পার্বত্য অংশ ছাড়া গঙ্গা সর্বত্র নাব্য ছিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দেও এলাহাবাদ অবধি স্টীমার যাতায়াত করত। কিন্তু এখন বর্ষাকালেও ব্যাণ্ডেলের ওপর স্টীমার যেতে পারে না। এর কারণ পলি জমে নদীগর্ভ অগভীর হয়ে গিয়েছে এবং মূল-নদীর অধিকাংশ জল পদ্মা দিয়ে চলে যায়। ফলে কিছুকালের মধ্যেই কলকাতা বন্দরের মৃত্যু হত। তাই পশ্চিম বাংলাকে বাঁচাবার জন্য সরকার ফারাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। কিন্তু কেবল ফারাক্কা বাঁধ ও তার ফীডার ক্যানালের জল দিয়েই ভাগীরথীর জলাভাব মিটবে না। অজয় নদে বাঁধ দিয়ে এবং দ্বারকেশ্বর-শিলাই-রূপনারায়ণ, কাঁসাই-হল্‌দি ও সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদীর সংস্কারসাধন করে আরও পরিষ্কার জল ভাগীরথীতে এনে ফেলতে হবে। তাছাড়া কৃত্রিম উপায়ে হিমালয়ের বরফ গলিয়ে শীতকালে গঙ্গার জলাভাব দূর করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা নদীগর্ভকে সংকীর্ণ এবং গভীর করে তুলতে হবে। শুধু গঙ্গা নয়, এ ব্যবস্থা ভারতের সমস্ত প্রধান নদীর ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা—দামোদর পরিকল্পনার ফলে কলকাতা বন্দরে যে

অতিরিক্ত পলি পড়ছে, ফারাক্কা বাঁধের জল তা সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। তাই ফারাক্কা বাঁধ কলকাতা বন্দরের সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। ছোটনাগপুর জলবিভাজিকার জল দিয়ে ভাগীরথীর জলাভাব পূরণ করতে হবে। আর তা করতে পারলেই ভাগীরথী পুনর্জীবন লাভ করবে। সেই শুভদিনকে স্বাগত জানাই।

মুর্শিদাবাদ (কেবল গঙ্গার পূর্ব দিক) নদীয়া যশোহর ফরিদপুর চব্বিশ পরগণা ও বাখরগঞ্জ জেলা এবং নোয়াখালি জেলার কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে এই বদ্বীপ। ৮৮° ডিগ্রী থেকে ৯১°৫০′ মিঃ পূর্ব-দ্রাঘিমা এবং ২১°৩০′ মিঃ থেকে ২৪°৪০′ মিঃ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে এই বদ্বীপের অবস্থিতি। এটি একটি যথাযথ বদ্বীপ। আর বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপ। একে নিঃসন্দেহে গাঙ্গেয়-বদ্বীপ বলা যেতে পারে।

একদিন এই বদ্বীপ সমুদ্রের নিচে ছিল। এবং গঙ্গা রাজমহলের কাছে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হত। ফলে গঙ্গাবাহিত ভগ্নশেষ (Debris) সঙ্গমে জমা হতে থাকল। এক সময় তাতে নদীর গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। যেন জোয়ার-ভাঁটা বন্ধ হয়ে গেল, তেমনি দেখা দিল প্লাবন। তাছাড়া জলাভাবে নবগঠিত ভূভাগ মরুভূমির মত হয়ে রইল। গাঙ্গেয়-বদ্বীপ বিশারদ স্যার উইলিয়াম উইলকক্স তাঁর **Ancient System of Irrigation in Bengal** বইতে বলেছেন যে পূর্তবিশারদ ভগীরথ তখন সেই বদ্বীপের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে একটি খাল কেটে গঙ্গার ধারাকে সাগর পর্যন্ত নিয়ে যান। সে সময় সাগর ঠিক কোন্ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল জানা যায় না, তবে সে সঙ্গম যে সাগরদ্বীপের অনেক ওপরে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

উইলকক্স বলেছেন যে বর্তমান পদ্মা ও মেঘনাই ভগীরথের সেই খাল। কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। খরস্রোতা গঙ্গাকে বাংলার কোমল মৃত্তিকার ভেতর দিয়ে অতখানি বাঁকা পথে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর এবং যুক্তিহীন। কাজেই পদ্মা নয়, হুগলী নদীই ভগীরথের সেই খাল। আর তাই বোধ করি হুগলী নদীর আর এক নাম ভাগীরথী। উৎসের ভাগীরথী আবার সঙ্গমে এসে ভাগীরথী হয়েছে।

রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। মৎস্য-পুরাণে বলা হয়েছে যে গঙ্গা কুরু ভরত পাঞ্চাল কৌশিক মগধ ব্রহ্মোত্তর এবং তাম্রলিপ্ত রাজ্য অতিক্রম করে সাগরে পতিত হয়েছে। কাজেই তাম্রলিপ্ত

বা তমলুকের গঙ্গাই ভগীরথের গঙ্গা।

রামায়ণে বলা হয়েছে গঙ্গা সোজাপথে সাগরে গিয়েছে। আর মহাভারতের বনপর্বে যুধিষ্ঠির তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে গঙ্গার সঙ্গমে স্নান সেরে সমুদ্রতীর দিয়ে কলিঙ্গ দেশে গমন করেছিলেন। মেঘনার মুখ থেকে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে পায়ে হেঁটে পুরী যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তমলুক থেকে সমুদ্রতীর দিয়ে হেঁটে পুরী যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

দুর্ভাগ্যের কথা আমাদের দেশের পণ্ডিতসমাজ সেকালে ইতিহাসে উৎসাহী ছিলেন না। কাজেই সেকালের ইতিহাসের জন্য আমাদের বিদেশী পণ্ডিতদের শরণ নিতে হয়। সেকালের গ্রীক এবং মিশরীয় লেখকরা তাঁদের বহু রচনায় গঙ্গার উল্লেখ করে গেছেন। সেই সব লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য টলেমি (Ptolemy; গ্রীক ভাষায় Claudius Ptolemaeus)। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে গ্রীস দেশের Ptolemais Hermii শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই বিশ্ববিখ্যাত গণিতজ্ঞ জ্যোতির্বিদ এবং ভূগোলবিদ ৭৮ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থের রচনাকাল ১২৭ থেকে ১৪৫ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর রচিত 'Guide to Geography (Geographika Huphegesis) পরবর্তী দু'শ' বছর ধরে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ বিবেচিত হয়েছে। আট খণ্ডে বিভক্ত সেই গ্রন্থখানি নয় বছর পরে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। ব্যাসেল (Basel) শহরে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মূল গ্রীক পাণ্ডুলিপিখানি পাওয়া গেছে।

টলেমি তাঁর বিখ্যাত ভূগোলে তৎকালীন নিম্ন-গঙ্গার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। গঙ্গার মোহনা এবং প্রবাহের কথা তিনি বিশদভাবে বলেছেন। তিনি গঙ্গার পাঁচটি মোহনার কথা বলেছেন—ক্যাম্‌বিসন্ মুখ (Kambyson mouth), মেগা (Mega or Great mouth), কেম্‌বেরিখাঁ (Kemberikhon), সিউডস্টোমন (Pseudostomon) এবং অ্যান্টিবেল (Antibale)।

পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে যে টলেমি সাগরসঙ্গমকে 'ক্যাম্‌বিসন' আর রায়মঙ্গল এবং হাড়িয়াভাঙ্গা তথা প্রাচীন আদিগঙ্গা সঙ্গমকে 'মেগা' বা বিশাল মুখ বলেছেন। বিশাল বা 'গ্রেট' শব্দটি থেকে মনে হয় সেকালে এই মুখটি সবচেয়ে বড় ছিল। স্বভাবতই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে টলেমির সময়ে আদিগঙ্গা ছিল গঙ্গার প্রধান প্রবাহ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে রাখা উচিত যে ইছামতী রায়মঙ্গল এবং কালিন্দি

একই নদী। আর এই নদী ধরেই র‍্যাডক্লিপ বঙ্গদেশ ভাগ করেছিলেন। ইছামতী মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গীর কাছে পদ্মা থেকে বেরিয়ে সোজা দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। এই নদীর তীরেই দর্শনা ও বেনাপোল অবস্থিত।

গঙ্গার তৃতীয় মুখ 'কেম্‌বেরিখাঁ' বলতে টলেমি সম্ভবত বুঝিয়েছেন খুলনা জেলার বাগেরহাট ও বাখরগঞ্জ জেলার পিরোজপুর মহকুমার মধ্যে প্রবাহিত হরিণঘাটা অথবা বলেশ্বর নদীর মোহনা।

চতুর্থ মুখ 'সিউডস্টোমন' হল নোয়াখালি জেলার দক্ষিণ-শাহবাজপুর ও হাতিয়া দ্বীপদ্বয়ের মধ্যে প্রবাহিত শাহবাজপুর নদীর সঙ্গম।

টলেমি বর্ণিত পঞ্চম মুখ তথা 'অ্যান্টিবেল' হচ্ছে সন্দীপ ও চট্টগ্রামের মধ্যে প্রবাহিত সন্দীপ নদীর মোহনা। এই নদীর উত্তরাংশ বামনী নদী নামে পরিচিত।

টলেমির বর্ণনা থেকে একথা নিসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে যদিও গাঙ্গেয় বদ্বীপের পূর্বপ্রান্তে মেঘনা মোহনা তথা 'সিউডস্টোমন' এবং 'অ্যান্টিবেল' সৃষ্ট হয়েছিল, তাহলেও মেগা নদীই ছিল গঙ্গার প্রধান প্রবাহ।

কিন্তু তার আগে অন্ততঃ কিছুকাল পদ্মার প্রবাহই গঙ্গার প্রধান প্রবাহ ছিল। কারণ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মেগাস্থিনিস তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, গঙ্গাহৃদি রাজ্যের সীমারেখা দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত। তার মানে টলেমির সাড়ে চারশ' বছর আগে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে পদ্মার জন্ম হয়েছিল এবং সে তখন খুবই খরস্রোতা নদী। এ থেকে মনে হয় পদ্মা তখন কেবল কাটা হয়েছে, আর তারই ফলে ভাগীরথী বা গঙ্গা শুকিয়ে যাচ্ছিল। টলেমির সময়ে আবার গঙ্গাগর্ভ খননের ফলে 'কেম্‌বিসন' মুখ প্রধান সঙ্গমে পরিণত হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় ভূগোলবিদ ডঃ কাননগোপাল বাগচীর* মতে ভগীরথ খ্রীষ্টজন্মের তেইশশ' বছর আগে খাল কেটে গঙ্গাকে যে পথে নিয়ে এসেছিলেন, সেই নদীপথই গঙ্গার মূল পথ ও প্রাচীনতম ধারা। পদ্মা অবশ্যই গঙ্গার পরে সৃষ্ট এবং তার সৃষ্টি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে।

টলেমির বিবরণ থেকে আর একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়—তখন

---

* 'The Ganges—Delta'—1944

গাঙ্গেয় বদ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। টলেমির মানচিত্র থেকে আমরা সেকালের গাঙ্গেয় বদ্বীপে চারটি নগরের নাম পাই—ট্যাম্‌বিসন (Tambyson), পলউরা (Polura), গঙ্গাহৃদি (Gangaridae) এবং টিলাগ্রামোঁ (Tilagrammon)। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন এই চারটি নগর যথাক্রমে তমলুক, বর্তমান মগরাহাটের নিকটে সাগরদ্বীপ এবং দক্ষিণ-শাহবাজপুর অঞ্চলে সমুদ্রের কাছে অবস্থিত ছিল।

গঙ্গা কেবল উত্তর-ভারতের প্রধান নদী নয়, সে গাড়োয়াল ও কুমায়ুন সহ প্রায় সমগ্র উত্তরপ্রদেশ বিহার উড়িষ্যা ও বাংলার ধাত্রী—সে বদ্বীপ বাংলার জন্মদাত্রী। আগে ধারণা ছিল গঙ্গা কাশ্মীর লাদাক এবং নেপালকেও বিধৌত করেছে এবং হরিদ্বারের ওপরে গঙ্গার দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০০ মাইল। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই রেনেল ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে একটি মানচিত্র অঙ্কন করেন।

পরবর্তীকালের পণ্ডিতগণ কিন্তু এই ধারণায় সন্দেহ পোষণ করতে থাকেন। ফলে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার তৎকালীন সার্ভেয়ার জেনারেল গঙ্গার উৎস আবিষ্কারের জন্য ক্যাপ্টেন রেপার এবং ওয়েব-এর নেতৃত্বে এক সমীক্ষক দলকে হরিদ্বার থেকে গোমুখী পর্যন্ত জরিপ করার নির্দেশ দেন। এর আগে কেবলমাত্র ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার জন্য হিমালয়ে কোন অভিযান পরিচালিত হয় নি।*

তাঁদের সে সমীক্ষাও কিন্তু ত্রুটিহীন নয়। নির্ভুল নয় ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের মুরক্রফ্‌ট্‌-য়ের সমীক্ষা। যদিও তিনি একজন খুবই ভাল সমীক্ষক ছিলেন।

এযুগে ভাগীরথীর উৎস গোমুখীর প্রকৃত আবিষ্কারক লেঃ হারবার্ট এবং ক্যাপ্টেন হজ্‌সন। তাঁরা ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে গোমুখী গিয়েছিলেন।

তার পর থেকে বিগত দেড়শ' বছরে বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক ও পর্বতারোহীদের প্রচেষ্টায় গোমুখী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহুবার বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা করা হয়েছে। এদের মধ্যে মেজর গর্ডন অসমাস্টোন (১৯৩৫-৩৬ খ্রীঃ), জে. বি. অডেন (১৯৩৭, খ্রীঃ) এবং কলকাতার গঙ্গোত্রী গ্লেশিয়ার এক্সপ্লোরেশান কমিটির সমীক্ষা (১৯৫৭-৫৮ খ্রীঃ) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।†

* 'A Sketch of the Geography and Geology of Himalaya Mountain and Tibet, by Col. S. G. Burrard & H. H. Hayden' —1907.

† লেখকের 'চতুরঙ্গীর অঙ্গনে' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কিন্তু আমি তো আজ পর্বতাভিযাত্রী নই। আমি সাগরযাত্রী। সাগরের পথে পা বাড়িয়ে বার বার এমন করে হিমালয়ের কথা ভাবছি কেন? তার চেয়ে কেবল গঙ্গার কথাই ভাবা যাক—বাংলার গঙ্গা, আমাদের গঙ্গা।

গিরিয়া থেকে মুর্শিদাবাদ হয়ে গঙ্গা চলে এসেছে প্রায় সোজা দক্ষিণে। এই ধারায় প্রথম দিকের নাম ভাগীরথী, তার পরে হুগলী নদী। মুর্শিদাবাদ থেকে বহরমপুরে। তারপরে গঙ্গা আরও বেশি ডাইনে বেঁকে পূর্ববাহিনী হয়ে পৌচেছে কাটোয়া। কাটোয়ার পরে গঙ্গা আবার পশ্চিমবাহিনী। এসেছে কালনা। তার পরে ব্যাণ্ডেল চন্দননগর হয়ে কলকাতা। বজবজ হয়ে ফলতা। উল্টোদিকে দামোদর এসে মিলেছে গঙ্গায়। গেঁওখালিতে উল্টোদিকে রূপনারায়ণ এসে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তার পরে ডায়মণ্ড হারবার। যেখান থেকে আমাদের নৌকাবিলাস শুরু হল।

ইংরেজ কবি 'বার্নস্' টেম্‌স নদীকে বলেছেন 'লিকুইড্ হিস্ট্রি'। গঙ্গা সম্পর্কে এই বিশেষণ আরও বেশি প্রযোজ্য। গঙ্গার প্রবাহ-কলরোল ভারত ইতিহাসের ধারাকে চিরকাল কল্লোলিত করে চলেছে।

মিশরের নাইল, চীনের হোয়াং হো, রাশিয়ার ভল্‌গা আর জার্মেনীর রাইন-এর মত ভারতের সিন্ধু ও গঙ্গা। কিন্তু সিন্ধুর কথা থাক্, গঙ্গার কথাই ভাবা যাক্। মিশর যেমন নীলনদের অবদান, বদ্বীপ-বাংলাও তেমনি গঙ্গার আশীর্বাদ। তাই তার আর এক নাম গাঙ্গেয়-বাংলা।

গঙ্গা স্বর্গের স্বরধুনী, সে অমৃতময়ী অন্তর্যামী। সে জানত, তার আশীর্বাদ-ধন্য সবুজ-বাংলার অবুঝ মানুষগুলি একদিন বিভেদকামী স্বার্থপরদের প্ররোচনায় পড়ে তাদের সোনার দেশকে দ্বিখণ্ডিত করবে। তাই সে আগের থেকেই নিজেকে দ্বিখণ্ডিতা করেছিল। তার কাছে যে হিন্দু ও মুসলমানের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই, পূর্ব ও পশ্চিমের পার্থক্য নেই—সবাই বাঙালী, উভয়েই বাংলা, গাঙ্গেয়-বাংলা। আজও সে স্বর্গধারা সিঞ্চন করে দুই বাংলার প্রাণশক্তিকেই সজীব করে রেখেছে। অতএব পদ্মা বা হুগলী নদী নয়, গঙ্গা—অমৃতময়ী গঙ্গা। তাকে প্রণাম করি।

॥ পাঁচ ॥

সূর্য ডুবছে। গৈরিক গঙ্গার বুকে মুখ লুকোচ্ছে দিবাকর। হারিয়ে যাবার লজ্জায় সে লাল হয়ে উঠেছে। তার লজ্জা-রাঙা রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে গঙ্গার অস্থির জলধারা, আকাশের অস্থির মেঘদল আর দিগন্তছোঁয়া ওপারের স্থিরবনানী। সূর্যের সোনা-ঝরা আলোয় স্থির ও অস্থির এক হয়ে গেছে।

আমরা অপলক নয়নে এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখছি। যাঁরা কথা বলছিলেন, তাঁদের কথা গেছে থেমে। যাঁরা তাস খেলছিলেন, তাঁদের খেলা হয়েছে বন্ধ। যাঁরা শুয়েছিলেন তাঁরা উঠে বসেছেন। যাঁরা বসেছিলেন, তাঁরা বেরিয়ে এসেছেন বাইরে। আপনা থেকেই সব কিছু থেমে গেছে।

কিন্তু কেন? আমরা তো প্রায় প্রতিদিন অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় ট্রামে কিম্বা বাসে বসে ময়দানের পরপারে অস্তাচলগামী অংশুমানকে দেখি। কিন্তু কোথায়, তখন তো এমন মনে হয় না। চোখ থাকলেই দেখা যায় না, দেখার মন থাকা চাই। আর সেই মন সৃষ্টি করে পরিবেশ। পরিবেশই আজ আমাদের চোখ দিয়েছে খুলে।

অবশেষে অগ্নিময় থালাখানি গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গেল। আমরা তবু বিহ্বল আবেশে তাকিয়ে রয়েছি গঙ্গার দিকে। তার বুকে যে এখনও সূর্যের স্মৃতিটুকু সোনালী রঙে রয়েছে আঁকা। শুধু তো সেখানে নয়। সেই ছবি যে আঁকা হয়ে গেছে আমার অন্তরে।

এমনিই হয়। দেখার চোখ থাকলে চির-পুরাতন দৃশ্যও নবরূপে দৃশ্যমান হয়। নবসুরে সে মানুষের মনোবীণায় ঝঙ্কৃত হয়। নবভাবে সে মানুষের স্মৃতিতে চিরউজ্জ্বল হয়ে থাকে।

একসময় দিগন্তের বনানী গেল হারিয়ে। আকাশ আর গঙ্গার বুক থেকে রাঙা-সূর্যের শেষ রেশটুকু মুছে গেল। নেমে এলো আঁধার—সন্ধ্যার আঁধার। একজন মাল্লা দুটি লণ্ঠন জ্বালিয়ে দুদিকের ছইয়ের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিল। জীবনের মালা থেকে আর একটি দিন পড়ল খসে।

ধ্যানমগ্ন সমাহিত সন্ধ্যা। কৃষ্ণকালো অনন্ত জলধির বুকে বেয়ে ভেসে চলেছি আমরা। কেবল আমরা নই, আমাদের মত আরও অসংখ্য যাত্রী। সারি বেঁধে শত শত তরণী চলেছে সাগরে। সবাই আলো জ্বালিয়েছে।

আলোগুলি বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। আলোর মালা গলায় দিয়ে গঙ্গা অভিনন্দিত করছে আমাদের।

সপ্ সপ্ সপাং···সপ্ সপ্ সপাং—মাল্লারা দাঁড় বাইছে। আঁধারের কালো যবনিকা ভেদ করে আলোর তরণী কাঁপতে কাঁপতে চলেছে এগিয়ে। আমরা চলেছি সাগরে—গঙ্গাসাগরে।

মুছে গেছে ওপারের তটরেখা। এপারের তটভূমিও মোটেই স্পষ্ট নয়। তাহলেও তাকে যাচ্ছে চেনা। বোঝা যাচ্ছে বালুকাবেলা, বাড়ি-ঘর আর বনভূমিকে।

দাঁড়ের ঘায়ে গঙ্গার বুকে মাঝে মাঝে আলো জ্বলে উঠছে। কালো জলে আলোর রেখা ফুটছে। বুড়ো মাঝি বলছে, "মা-গঙ্গার গা থেকে জ্যোতি বেরুচ্ছে।"

আমার মনে হচ্ছে আলোর চুমকি লাগানো শাড়ী পরে প্রিয়কে পাবার প্রত্যাশায় উচ্ছল গঙ্গা নাচতে নাচতে চলেছে অভিসারে। চলেছে সাগরের সঙ্গে মিলিত হতে—সাগরসঙ্গমে।

সে চলেছে বলে আমিও চলেছি। আমার মত শত-সহস্র মানুষ আজ চলেছে সাগরে। কত নগর আর জনপদ থেকে এসেছেন তাঁরা। তাঁদের ভাষা ভিন্ন, শিক্ষা ভিন্ন, দীক্ষা ভিন্ন। ভিন্ন তাঁদের পেশা, তাঁদের সমাজ, তাঁদের সংস্কৃতি। ভিন্ন ভিন্ন পথে চলেছেন তাঁরা। তবু আজ তাঁরা অভিন্ন। তাঁদের লক্ষ্য এক। তাঁরা সবাই চলেছেন সাগরে—গঙ্গাসাগরে।

ভাবতে ভাল লাগছে। আমিও এঁদেরই একজন। দি'মা ভুজাওয়ালা আর বৈষ্ণবীর মতো ভক্তি বা বিশ্বাস আমার নেই। কিন্তু আমিও যে আজ চলেছি সাগরে।

যাত্রীরা আবার কথাবার্তা বলছেন। পান-দোক্তা বিড়ি-সিগারেটের সদ্ব্যবহার করছেন। তাহলে অন্যান্য অনেক নৌকোর তুলনায় আমাদের নৌকো শব্দহীন। কোন নৌকো থেকে ভেসে আসছে কীর্তনের সুর। কোন নৌকো থেকে রেডিও কিম্বা গ্রামোফোনের গান, আবার কোন নৌকো থেকে কেবলই কলহাস্য।

এই উচ্ছ্বাস, এই হাসি আর এই গান—এ কি শুধুই সময় কাটাবার প্রয়াস? উৎকণ্ঠা অনিশ্চয়তা ও ভয়কে ভুলে থাকবার প্রচেষ্টা? না ঐকান্তিককে পাওয়া ও মনোবাসনাকে পূর্ণ করার জন্য আনন্দময় প্রস্তুতি?

ভাল লাগছে। আমার ভাল লাগছে এই উচ্ছ্বাস হাসি আর ঐ গান। আমিও যে আজ উচ্ছ্বসিত। আমার মনে হাসির আমেজ, প্রাণে সুরের পরশ। আমার ভাল লাগছে এই সন্ধ্যা, এই নৌকো আর যাত্রীদল। ভাল লাগছে এই মধুময়ী পৃথিবী। পৃথিবী কি সুন্দর! আর সুন্দরের অন্বেষণেই তো আমার এই যাত্রা—সাগরযাত্রা।

আজ কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় হল। আরও কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় হবে। তাদের প্রাণভরে দেখব। তাদের সঙ্গে প্রাণের কথা বলব আর তাদের সবাইকে ভালোবাসব। তারা চিরসুন্দর হয়ে রইবে আমার মানসপটে। সুন্দর মানুষকে কাছে পাবার জন্যই তো সুন্দর পৃথিবীর পথে পথে মানুষের তীর্থযাত্রা।

"ওরে ও ছেলে! আর বাইরে থাকিস নে, হিম লাগছে যে।"

দি'মা আমাকে ডাকছেন। এখুনি ভেতরে না গেলে তিনি আবার চীৎকার শুরু করে দেবেন। তাড়াতাড়ি ভেতরে আসি। কাছে আসতেই দি'মা তাঁর পাশের ভদ্রলোককে বলেন, "তুমি বাছা সরে বসো, খোকা একটু শোবে।"

ভদ্রলোক নীরবে তাঁর আদেশ পালন করেন। কিন্তু নীরব থাকে না বৈষ্ণবী। সে ফিক করে হেসে ওঠে।

দি'মা কটমট করে তার দিকে তাকান। আশ্চর্য। বৈষ্ণবী ভয় পায় না। সে গম্ভীর স্বরে বলে, "আপনার খোকার বুঝি ঘুম পেয়েছে দি'মা?"

পাছে দি'মা রেগে গিয়ে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি উদ্ভব করেন, তাই একটু হেসে আমি বলি, "না, ঘুম পাবে কেন? দি'মা চাইছেন আমি একটু বিশ্রাম করি। তাই তিনি আমাকে শুতে বলছেন।"

"তা তো বটেই।" বৈষ্ণবী বলে, "নৌকোয় ওঠার পর থেকে অনেক শ্রম হয়েছে, এবার একটু বিশ্রাম করাই উচিত।"

ওর কথা ও ভঙ্গিতে হাসি পায় আমার। কিন্তু হাসতে পারি না। দি'মা রেগে যাবেন। তাই গম্ভীর হয়ে বলি, "বিশ্রাম বলতে আপনি কি বোঝেন জানি না, তবে রেলে স্টীমারে ও নৌকোয় শুয়ে থাকতে ভাল লাগে বৈকি।"

"তাই তো দি'মা শুতে বলছেন।" বৈষ্ণবী সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে।

"কিন্তু আমার এখন একদম শুতে ইচ্ছে করছে না।" আমি পরোক্ষে দি'মার কাছে অনুরোধ করি।

দি'মা খুবই বিরক্ত। তিনি কোন কথা বলেন না।

বৈষ্ণবী বলে, "আহাঃ, কি কষ্ট!"

এবারে দি'মা আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টেপেন। নির্দেশটা বুঝতে পারি। তিনি বলছেন—ঐ বেহায়া বোষ্টমীর সঙ্গে আর বাক্য-বিনিময় না করে, এবারে চুপচাপ আমার পাশটিতে শুয়ে পড়। আমি নীরবে সে নির্দেশ পালন করি।

আর আমাকে শুয়ে পড়তে দেখে বৈষ্ণবী আবার ফিক করে হেসে ওঠে।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকি নানা কথা—তীর্থের কথা, যাত্রার কথা, যাত্রীর কথা। কত তীর্থ তো দর্শন করলাম—সুগম-তীর্থ, দুর্গম-তীর্থ, জনবহুল-তীর্থ, নির্জন-তীর্থ, গিরিতীর্থ আর সমুদ্রতীর্থ। পৃথক তাদের পরিবেশ, পৃথক তাদের অবস্থান, পৃথক তাদের পথ। কিন্তু সর্বত্র দেখেছি এই একই যাত্রীদল। তাঁরা ভিন্ন মানুষ হলেও অভিন্ন তাঁদের মন, তাঁদের প্রকৃতি, তাঁদের ভক্তি। এঁদের কোন জাতি নেই, দেশ নেই, ধর্ম নেই। এঁরা যুগ যুগ ধরে একই রয়ে গেছেন। এঁরা কালজয়ী যাত্রীদল।

একটা নিবিড় নীরবতা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে আমার চারিদিকে। যাঁরা বসে ছিলেন, তাঁরাও একে একে নৌকোর পাটাতনে গা এলিয়ে দিয়েছেন। সবাই যেন কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন। ওঁদের কথা আর গল্প কি ফুরিয়ে গেছে? না ওঁরা আবার কথার মালা গাঁথার জন্য দেহ ও মনকে তৈরি করে নিচ্ছেন? ওঁরা কি শক্তি সঞ্চয় করছেন?

এই আশ্চর্য নীরবতার মাঝে ঐ ক্লান্তিহীন শব্দটা কিন্তু সমানে জেগে রয়েছে—ছল ছল ছল···সপ্ সপ্ সপাৎ। জলের শব্দ আর দাঁড়ের শব্দ। গঙ্গা আর নৌকোর ঐকতান। কখনও বা সেই সঙ্গে কানে আসছে বাতাসের শন শন আর ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা গান।

এই সব শব্দ কিন্তু নৌকোর নীরবতাকে নিবিড়তর করে তুলছে। পরিবেশটাও আরো রোমাঞ্চকর হয়ে উঠছে। শব্দহীন নীরবতা কখনই রোমাঞ্চকর নয়, যেমন আলোহীন অন্ধকার নয় ভয়াবহ। ছোট শব্দ বড় নীরবতাকে বাড়িয়ে তোলে, যেমন এই দোদুল্যমান লণ্ঠনটা নৌকোর আঁধারকে আরও গভীর করে তুলেছে।

আমরা দু'সারিতে শুয়েছি। নৌকোর মাঝখানে মাথা, দুদিকে পা। সহসা কাতর একটা কণ্ঠস্বর নৌকোর নীরবতা ভঙ্গ করে, "ঠাকুর! তুমি

আমাকে নাও। আমি যে এ কষ্ট আর সইতে পারছি না।”

তাড়াতাড়ি পাশ ফিরি। বৃদ্ধ বৈষ্ণব কাঁদছেন। এই প্রথম আমি তাঁর কথা শুনলাম। বৈষ্ণবী তাঁর মাথার কাছে বসেছিল। সে আর একটু এগিয়ে যায়। তাঁর চুলের ভেতর আঙুল চালাতে চালাতে স্নিগ্ধস্বরে সান্ত্বনা দেয়, “আপনি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।”

“ঘুম যে আসছে না, শ্যামা। বড় আশা ছিল মকরসংক্রান্তিতে সাগরে স্নান করব। যদি সে আশা পূর্ণ নাও হয়, দুঃখ করব না। গঙ্গাসাগরের পথে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে কাম্য আর কি থাকতে পারে! কিন্তু…” একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি, “আমি চলে গেলে তোর কি উপায় হবে শ্যামা? তোর চিন্তায় যে আমি স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাব না।”

“আপনি চোখ বুজুন তো, ঘুমোবার চেষ্টা করুন। ঘুম আসবে। নিশ্চয়ই আসবে।” শ্যামা তাঁকে শাসন করে। কিন্তু কোন্ অধিকারে? শ্যামা তাঁর কে? কন্যা কি শিষ্যা?

বৈষ্ণব একটু হাসেন। শব্দহীন দুঃখের হাসি। বলেন, “না রে, আসবে না। আমার মত দেহ আর মন নিয়ে কেউ যে ঘুমোতে পারে না।”

“আজেবাজে চিন্তাগুলো ছাড়বেন, না আমি বাইরে চলে যাব?”

“না না, শ্যামা তুই যাস্‌নে।” বৃদ্ধ তাঁর শিথিল হাতখানি দিয়ে শ্যামার একখানি হাত আঁকড়ে ধরেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে কাতর অনুনয়।

শ্যামা তার হাতখানি ছাড়িয়ে নেয় না। সে চুপ করে কি যেন ভাবছে। কার কথা ভাবছে? শ্যামা কাঁদছে কি? নইলে সে অমন আঁচল দিয়ে বার বার চোখ মুছছে কেন?

ওদের কথোপকথন নৌকোর ভেতর কেমন একটা অস্বস্তির প্রলেপ দিয়েছে বুলিয়ে। যাঁরা ওদের কথা শুনছেন, তাঁরা সবাই সহানুভূতিশীল বলতে পারি না। অনেকেই নীরবে হাসছে, চোখ ও গা টেপাটেপি করছে। শ্যামা সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী যুবতী। পিতৃসম মুমূর্ষু বৈষ্ণবকে সঙ্গে নিয়ে সাগরে চলেছে। তার সম্পর্কে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। সেই কৌতূহল কিছুটা মিটেছে এই কথোপকথনে। তাই ওরা এমন শব্দহীন ও সমাসক্ত।

কেবল গঙ্গা ও নৌকোর খেয়াল নেই ওদের দিকে। তারা সমানে ছল ছল ছল…সপ্‌, সপ্ সপাৎ করে চলেছে। কিন্তু যাত্রীদের তাতে কোন শিক্ষা হচ্ছে না।

শ্যামার চোখের জল বোধ করি বাবাজীকে ব্যাকুল করে তোলে। তিনিও কান্নার কবলে পড়ে যান। কান্নামেশানো স্বরে শ্যামাকে বলেন, "আমি চলে যাবার পরে তোর কি উপায় হবে? কেমন করে আশ্রমকে রক্ষা করবি আর কেমন করেই বা নিজেকে রক্ষা করবি?"

"আপনি এসব ভাবছেন কেন? আমি আপনাকে ভাল করে তুলব। গঙ্গাসাগরে স্নান করিয়ে আপনাকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাব।" শ্যামার স্বরে আত্মপ্রত্যয়।

বৈষ্ণব একটু হাসেন। অসহায় শব্দহীন হাসি। বলেন, "পারবি নে, শ্যামা পারবি নে। তাই বলছি তুই শক্ত হ। মনে জোর আন্। তাহলে আর বিপদে অধীর হয়ে পড়বি না। অন্ধকারে পথ চলতে কষ্ট হবে না।"

"আপনি চুপ করুন।" শ্যামা এবারে সশব্দে কেঁদে ওঠে, "আমি যে ওকথা আর সইতে পারছি না।" শ্যামা আর কিছু বলতে পারে না। সে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে।

বৈষ্ণবও বোধ করি বলার মতো কোন কথা খুঁজে পাচ্ছেন না। কেবল তাঁর শীর্ণ একখানি হাত শ্যামার আনত মাথায় রাখেন।

ব্যাপারটা ওদের ব্যক্তিগত হলেও বড়ই বিব্রত বোধ করছি। তাই উঠে বসি। ব্যাগ থেকে একটা বড়ি বের করে শ্যামার সামনে এগিয়ে আসি। শ্যামা তাড়াতাড়ি চোখ মুছে মাথা তোলে। মুহূর্তে সামলে নেয় নিজেকে। স্বাভাবিক স্বরে বলে, "কিগো, কি মনে করে একেবারে পাশে এসে বসেছ?"

বিস্মিত হই। এই কি একটু আগের সেই শ্যামা! হেসে বলি, "মনে একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে, নইলে আসব কেন?"

"মনের কথাটাই তো জানতে চাইছি।" সে হাসে। কার সাধ্যি এখন তাকে দেখে বলে, সে একটু আগেও কাঁদছিল!

ওষুধটা তার হাতে দিয়ে বৈষ্ণবকে দেখিয়ে বলি, "রাতের খাওয়ার পরে এটা ওনাকে খাইয়ে দেবেন।"

"কিসের ওষুধ?" শ্যামা বড়িটা হাতে নিয়ে বলে।

"ঘুমের।"

শ্যামা কিছু বলবার আগেই ক্ষীণ অথচ উল্লসিত স্বরে বৃদ্ধ বলে ওঠেন, "তোমার কাছে ঘুমের ওষুধ আছে?" তাঁর কণ্ঠস্বরে আনন্দ ঝরে পড়ছে। "বেচে থাকো ভাই। কৃষ্ণভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।" তারপর শ্যামাকে

বলেন, "ওষুধটা রেখে দে। রাতে খাব। একবার ঘুমিয়ে পড়তে পারলে আর ও-সব বলতে পারব না। তোকেও কাঁদাবো না।"

তাই করে শ্যামা। ওষুধটা রেখে দেয়।

যাত্রীদের গুঞ্জন জাগে। একে একে উঠে বসেন তাঁরা। দূরে আলো দেখা যাচ্ছে। অনেক আলো। জনপদের আলো। কাকদ্বীপ এসে গেছে।

ঘাট অবশ্য এখনও দূরে। বাঁদিকে বড় খালটি দিয়ে খানিকটা যেতে হবে। এটা ঠিক খাল নয়, মুড়িগঙ্গারই একটি অংশ। কাকদ্বীপের উপকণ্ঠে একটি নতুন দ্বীপ বা চর জেগে উঠেছে। সঙ্কীর্ণ কিন্তু সুদীর্ঘ এই দ্বীপে এখনও বসবাস শুরু হয় নি। দ্বীপ আর কাকদ্বীপের মাঝে এই খাল।

প্রকৃতপক্ষে এই দ্বীপটি প্রকৃতির সৃষ্ট নয়। আট-দশ বছর আগে নোনা জলের হাত থেকে কাকদ্বীপকে বাঁচাবার জন্য মুড়িগঙ্গায় একটা মাটির বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। সেই বাঁধই এই দ্বীপ বা চর সৃষ্টি করেছে। সুন্দরবন এলাকায় এমনটি মাঝে মাঝেই হচ্ছে।

এই খাল দিয়ে খানিকটা এগিয়েই বাঁদিকে আর একটি খাল পাব। সে খালটি চলে গেছে কাকদ্বীপের ভেতরে। দুটি পুল রয়েছে সেই খালের ওপরে। দুই পুলের মাঝেই কাকদ্বীপ বাজার তথা জনপদের সব চেয়ে জনবহুল অংশ। খালে জল থাকলে আমরা একেবারে বাজারের ঘাটে গিয়ে নোঙ্গর করতে পারতাম। কিন্তু এখন শেষ ভাটা। খালের জল শুকিয়ে গেছে। তাই খালের মুখেই নামতে হবে। কাদা পেরিয়ে উঠতে হবে রাস্তায়।

তা হক্ গে, কাদাও তো মাটি। পা দুখানি যে মাটির পরশ পাবে। মাটির মানুষ আমরা। মাটির জন্য মনটা বড়ই উতলা হয়েছে। তাই আসন্ন মিলনের আনন্দে ম্রিয়মাণ মন আবার সজীব হয়ে উঠেছে।

নৌকো থেকে নামলেন সকলেই। কেউ বেড়াতে কিম্বা বাজারে যাবার জন্য, আর কেউ বা কেবলই প্রকৃতির আহ্বানে। তাঁরা কাজ সেরে নিয়ে আবার গিয়ে নৌকোয় উঠলেন। ভ্রমণরসিকরা প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে কুয়াশা-ছাওয়া শিশির-ভেজা মাঠে পায়চারি করতে শুরু করলেন।

একদল মাঠ পেরিয়ে রাস্তার দিকে চলেছেন। চলেছেন বাজারে,—গরম চা, গরম জিলিপি অথবা গরম ভাতের লোভে।

মাঝি-মাল্লারাও নেমেছে মাটিতে। ওরাও চলেছে বাজারে। ওরা আমাদের মত মাটির মানুষ নয়, জলের মানুষ। ওরা জলে জাগে, জলে কাজ করে, জলে ঘুমোয়। জল ওদের খাবার যোগায়, জলই ওদের জীবন। তবু ডাঙার প্রতি ওদের কি অসীম মমতা! ডাঙা পেয়েই বৈঠা ফেলে নেমে এসেছে নৌকো থেকে। বিস্মিত বোধ করছি না। ডাঙার প্রয়োজনেই তো ওরা জলে থাকে। ডাঙার জন্যই যে জল।

টর্চের আলোয় পথ দেখে ওদের পেছনে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ নারী-কণ্ঠ কানে আসে, "অত জোরে হাঁটছ কেন? আমি কি অমন জোরে ছুটতে পারি?"

থমকে দাঁড়াই। পেছন ফিরি। আপাদমস্তক ঢাকা একটা ছায়ামূর্তি এদিকে আসছে। টর্চের আলো ফেলি। না, ছায়া নয় কায়া।

অপেক্ষা করি। সে কাছে আসে। চিনতে পারি···শ্যামা, বৈষ্ণবী শ্যামা। সে রীতিমত হাঁপাচ্ছে। দম নিয়ে বলে, "আমাকে কি তোমার পাহাড়ী মেয়েমানুষ পেয়েছ যে তোমার পাহাড়ী-হাঁটার সঙ্গে তাল রাখতে পারব।"

ভিত্তিহীন অভিযোগ, সে যে আমার পেছনে ছুটছে, এ তথ্য আমার অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু সে কথা বললে না-জানি কি-কথা শুনতে হবে! তাই জিজ্ঞেস করি, "কিঁ আনতে বাজারে যাচ্ছেন?"

"দেখি যদি একটু গরম দুধ পাওয়া যায়। রাতে ওনার আবার একটু দুধ খাওয়ার অভ্যেস।"

"সে কথা তো আমাকে বললেই পারতেন, আমি বাবাজীর জন্য দুধ নিয়ে আসতাম।" আমরা পথ-চলা শুরু করি।

শ্যামা আমার আরও কাছে এগিয়ে আসে। বলে, "তাহলে যে এই নির্জন পথে তোমার পাশে পাশে পথ চলার সুযোগ পেতাম না গোসাঁই!"

চমকে উঠি। প্রথম থেকেই দেখছি ওর কথাবার্তা যেন একটু কেমন রনের। তবু এই পরিবেশে এমন কথা একেবারেই আশা করি নি। এর পরে যদি সে আমার পাণিপীড়ন করে, তাহলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। আমি চুপ করে থাকি। নীরবে পথ চলি।

কিন্তু শ্যামা তাই করে। সহসা আমার একখানি হাত ধরে ফেলে সে। আমার সারা গায়ে বিদ্যুতের শিহরণ শুরু হয়েছে। কি বলব, বুঝতে পারছি না। তাছাড়া এখন এ অবস্থায় কথা বললে কণ্ঠস্বর কেঁপে যাবে। তাই

নীরবে পথ চলি আর স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করতে থাকি।

শ্যামা হাসে। অনুকম্পার হাসি। সে আমার হাত ছেড়ে দেয়। আমি তার দিকে ফিরি। মুখখানি পরিষ্কার দেখতে পাই না। তবু মনে হচ্ছে এখনও হাসির পরশ লেগে আছে ওর মুখে।

শ্যামাও আমার দিকে তাকায়। তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞেস করে, "ভয় পেলে?"

ঢোক্ গিলে কোনমতে উত্তর দিই, "না।"

"তাহলে অমন কাঁপছিলে কেন?"

"কই না তো!"

"হ্যাঁগো হ্যাঁ, তুমি কাঁপছিলে।" একটু থামে শ্যামা। তারপরে সহসা কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য ঢেলে বলে, "আমার কথাবার্তা ও আচার-আচরণ যদি অস্বাভাবিক মনে হয়, ভয় পেয়ো না যেন। নিজের জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে খেলতে ও আমার একটা স্বভাব হয়ে গেছে। কিন্তু জীবনটাকে নিয়ে জুয়া খেলতে গিয়ে লোকসান যা হয়েছে, তার সবটাই নিজে কুড়িয়েছি। আমার জন্য কারও কোন লোকসান হয় নি। তাই তুমিও নিশ্চিন্ত থাকতে পারো গোসাঁই, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।"

পথের মত মনটাও কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। অথচ এমনটি হওয়া উচিত নয়। পথ কুয়াশায় ছেয়ে গেলেও মনের আলোয় দেখে দেখে পথ চলা যায়। কিন্তু মন কুয়াশায় ঢেকে গেলে পথিক অচল হয়ে পড়ে। আমি পথিক। আমাকে যে পথ চলতেই হবে।

তাই শ্যামার দিকে তাকিয়ে অকম্পিত স্বরে বলি, "সংসারে সবাই লাভ-ক্ষতির হিসেব করে পথ চলে, এমন ধারণা আপনার হল কেমন করে?"

শ্যামা আমার দিকে তাকায়, কিন্তু বলে না কিছু।

আমি আবার বলি, "তাছাড়া কোন্‌টা লাভ আর কোন্‌টা লোকসান, তার হিসেব মেলাবার সময় তো এখনও হয় নি। সময় যেদিন হবে, সেদিন যে সবটাই লাভের ঘরে জমা পড়বে না, তাই বা কে বলতে পারে!"

তেমনি ফিক করে হেসে ওঠে শ্যামা।

আমি আহত স্বরে বলি, "হাসছেন যে?"

"হাসি পাচ্ছে বলে।" শ্যামা উত্তর দেয়।

"কেন?"

"আনন্দে।"

"কিসের আনন্দ ?"

"তোমাকে পাবার।"

আমি নির্বাক। আমি স্থবির।

শ্যামা আবার বলে, "তোমাকে পেয়ে ভালই হল।"

"কারণ ?" কোনমতে সামলে নিয়ে জবাব দিই।

"কারণ তোমার সঙ্গে বাজারে যেতে পারছি।"

"বেশ তো, চলুন পা চালিয়ে চলা যাক্।"

"না বাপু, এর চেয়ে জোরে পথ-চলা পোষাবে না আমার। আর তা চলার সাধ্যিও নেই। থাকলে কি আর আজ এখানে দেখা হত তোমার সঙ্গে!"

শ্যামা যেন সহসা গম্ভীর হয়ে উঠল। এ অবস্থায় কি বলা উচিত হবে বুঝে উঠতে পারছি না। তাই চুপ করে থাকি। নীরবে পথ চলতে থাকি।

পথ মানে মেঠো পথ। মাঝে মাঝে বানগাছের ঝোপ। আবাদী সুন্দরবনে এই গাছ প্রচুর জন্মায়। এই গাছের বৈশিষ্ট্য, এদের শেকড় মাটির উপরে থাকে। কেবল জোয়ারের জলে ডুবে যায়।

মেঠো পথ থেকে উঠে আসি বাঁধানো পথে। পথের একদিকে সারি সারি আড়ত। আর একদিকে বাড়ি-ঘর।

খানিকটা এগিয়ে খেয়াঘাট। এখান থেকে বারো মাস নৌকো যায় সাগরদ্বীপ ঘোড়ামারা হলদিয়া গেঁওখালি ও মেদিনীপুর জেলার আরও অনেক জায়গায়। খালে জল না থাকায় আমরা ঘাটে না এসে একটু আগেই নৌকো থেকে নেমেছি। তাই বলে ঘাটের ভাড়া না দিয়ে রেহাই নেই। কাকদ্বীপের মাটিতে নৌকো ভেড়ালেই ঘাটের ভাড়া গুনে দিতে হবে। আদায়কারী এতক্ষণে বোধ হয় হাজির হয়েছে আমাদের নৌকোয়।

ঘাট ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি আমরা। এখন পথের দুপাশেই ঘন বসতি। কাঁচা ও পাকা বাড়ি। মাঝে মাছে দু'তিনতলা বাড়িও আছে। আর আছে দোকান। মুদি ও মনোহারী দোকান।

টিউবওয়েল পেয়ে পা ধুয়ে নেবার কথা মনে পড়ল। জুতো হাতে নিয়ে চলছি। আমি সেদিকে এগিয়ে যেতে, শ্যামাও আমার সঙ্গে আসে।

শ্যামা বলে, "আমি পাম্প করছি, তুমি ভাল করে পা ধুয়ে নাও।"

"না, না। আমি একাই পারব।"

"পারলেও তোমাকে আমি পারতে দেব না।" শ্যামা আমাকে ধাক্কা দিয়ে হাতলের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সে পাম্প করে জল তুলতে শুরু করে।

আমি সেই জলে পা ধুয়ে নিই।

শ্যামা বলে, "মুখ ধুয়ে একটু জল খেয়ে নাও। তারপরে একটু পাম্প করো—আমি জল খাব।"

অনেকটা এগিয়ে এস পুল। পুল পেরিয়ে বাজার। বেশ বড় বাজার। কাকদ্বীপ এখন এ অঞ্চলের সব চেয়ে বড় ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত। আবাদী সুন্দরবনের অন্যতম তোরণ কাকদ্বীপ।

বহুকাল থেকেই কাকদ্বীপ এ অঞ্চলের একটি সমৃদ্ধ জনপদ। কাকদ্বীপের বিশালাক্ষীর মন্দিরটি দেখলে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়। যদিও যত্নের অভাবে মন্দিরটি দিন দিন ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে।

একটা চায়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াই। শ্যামা জিজ্ঞেস করে, "চা খাবে নাকি?"

"হ্যাঁ, আপনি?"

"খাওয়াবে?"

"নিশ্চয়ই।"

"তাহলে খাওয়াও। তুমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে গল্প করবে, একটি অপরিচিত যুবতী বৈষ্ণবীকে সাগরের পথে চা খাইয়েছ—সে সুযোগটুকু তোমাকে না দিলে যে আমার পাপ হবে গো!"

"আপনি বুঝি সহজ ভাবে কথা বলতে পারেন না?"

"না।"

"কেন?"

"জীবনটা যে বড় জটিল গোসাঁই।" একটু থামে শ্যামা। সে যেন অন্যমনস্ক। কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে সে আবার বলে, "চল, ভেতরে গিয়ে বসা যাক, বাইরে বড় ঠাণ্ডা।"

আমরা ভেতরে আসি। ভেতরে বহু লোক। গিস্‌গিস্ করছে। প্রায় সকলেই যাত্রী। বাসে কিংবা নৌকোয় এখানে এসেছে। প্রত্যেকেরই হাতে অঢেল সময়। কাল সকাল পর্যন্ত যাত্রা স্থগিত।

চায়ের দোকান সময় কাটাবার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। কাজেই এরা বেশ গ্যাঁট

হয়ে বসেছে। কিন্তু মহিলা, বিশেষ করে যুবতী মেয়ে সঙ্গে থাকার সুবিধে আছে। শ্যামাকে দেখে দোকানদার থেকে খদ্দের পর্যন্ত প্রত্যেকেই চঞ্চল হয়ে উঠল। আর তাদের বদান্যতায় আমরা বসার জায়গা পেয়ে গেলাম।

চা খেয়ে বাইরে এসে কথাটা মনে পড়ে। শ্যামাকে বলি, "আপনার তো দুধ নেওয়া হল না!"

"হয় নি, হবে।" শ্যামা শান্তস্বরে উত্তর দেয়, "আগে তুমি দি'মার জন্য যা নেবার নিয়ে নাও। ফেরার পথে এই দোকান থেকেই দুধ নিয়ে যাব।"

"কিন্তু আমি দি'মার জন্য কিছু নেব, তা আপনি জানলেন কেমন করে?"

"আহা, এ জানার জন্য যেন ভাগবৎ পাঠ করতে হয়! অত বলে-কয়ে মুড়ি খাওয়ালেন, আর তুমি তাঁর জন্য চারটে টাটকা রসগোল্লা নিয়ে যাবে না!"

হাঁটতে হাঁটতে একটা মিষ্টির দোকানে এসে দাঁড়াই। জিজ্ঞেস করি, "তাহলে চারটে রসগোল্লাই নেওয়া যাক, কি বলেন?"

"কি আর বলব!" শ্যামা একটা কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে। বলে, "সংসারে যে দি'মা ছাড়াও মিষ্টি খাওয়াবার মত মিষ্টি মানুষ আছে, তা তো তোমার জানা নেই!"

"ভুল। খুব ভাল করে জানা আছে। আর সেই সঙ্গে এও জানা আছে যে তারা মিষ্টি মানুষ হলেও তেতো কথা বলে।"

"ও, তাই এত রাগ! কিন্তু রাগের মাঝেই যে লুকিয়ে থাকে অনুরাগের রাগিনী! ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিনীকে নিয়েই তো জগতের যত গান— ভক্তি আর ভালবাসার গান, বিরহ আর মিলনের গান!"

আবার বিস্মিত হই। কিন্তু আগের বিস্ময়ের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। আগে বিস্মিত হয়েছি তার আচরণে, কিন্তু এবারে বিস্মিত হচ্ছি তার জ্ঞানে। কে এই বৈষ্ণবী?

সে প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই। উত্তর পাব না। তাই তাকে আর কিছু না বলে, দোকানদারকে এক টাকার জিলিপি ও দু টাকার রসগোল্লা দিতে বলি।

শ্যামা যেন আঁতকে ওঠে। বলে, "একা দিদিমার জন্য দু টাকার রসগোল্লা আর এক টাকার জিলিপি!"

"না।" আমি উত্তর দিই।

"তাহলে ?"

"যারা তেতো কথা বলে, তারাও ভাগ পাবে।"

"তাই তো পাওয়া উচিত।"

"কেন ?"

"তিক্তরসযুক্ত না হলে যে মধুবন-বনবিহারী হওয়া যায় না !"

আবার কোন্ কথায় কোন্ কথা আসবে। তাই আর কথা না বাড়িয়ে টাকা দিয়ে দোকানীর হাত থেকে ভাঁড় ও ঠোঙাটা হাতে নিই।

বাইরে এসে ঠোঙাটা শ্যামার হাতে দিয়ে বলি, "এটা আপনার।"

"থ্যাঙ্ক ইউ।" সে সানন্দে হাতে নেয়। বলে, "একেবারে গরম রয়েছে !"

আমি মাথা নাড়ি। শ্যামার হাত থেকে এলুমিনিয়ামের ক্যারিয়ারটা নিয়ে সেই চায়ের দোকানে আসি। এবারে শ্যামা দাঁড়িয়ে থাকে বাইরে।

দুধ নিয়ে ফিরে আসতেই শ্যামা ঠোঙা থেকে দুখানি জিলিপি বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে বলে, "নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

"এমন তো কথা ছিল না।" আমি কৃত্রিম গম্ভীর স্বরে বলি।

"সব কথা বলা থাকে না। বুঝে নিতে হয়।"

"কিন্তু আমার যে দু'হাত জোড়া, আমি নেব কেমন করে ?"

"বেশ, হাঁ কর, আমি খাইয়ে দিচ্ছি।" শ্যামা জিলিপি সহ তার হাতখানি আমার মুখের সামনে নিয়ে আসে।

"তার চাইতে নৌকোয় গিয়ে খেলে ভাল হত না ?" আমি মৃদু প্রতিবাদ করি।

"না।"

"কেন ?"

"সবাই দেখে ফেলবে।"

"তাতে ক্ষতি কি ?" জিজ্ঞেস করি।

"আছে। আমাদের নয়, যারা দেখবে তাদের। আমাদের জিলিপি জন্য ওদের রাতে ঘুম হবে না। ওরা রাতভর মনে মনে জিলিপির প্যাঁচ কষবে।"

কথাটা মিথ্যে নয়। তাই আমি মুখ খুলি। শ্যামা আমার মুখে একখানি জিলিপি দিয়ে বলে, "এই তো গুড্ বয়, বাংলায় যাকে বলে সুবোধ বালক !"

জিলিপি নিয়ে আমরা ব্যস্ত থাকি কিছুক্ষণ। এক সময় খাওয়া শেষ হয়। তবু শ্যামা টর্চ জ্বেলে ধীরে ধীরে হাঁটছে। বলার কিছু নেই। সে পাহাড়ী মেয়ে নয়, বাংলার বৈষ্ণবী। তাই আমি নীরবে তার পেছনে পথ চলি।

কিন্তু বেশিক্ষণ নীরব থাকতে পারি না আমি। বিশেষ করে সেই কথাটা না জানতে পারলে কিছুতেই মনে শান্তি পাচ্ছি না। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেই ফেলি, "আচ্ছা, বাবাজী আপনার কে?"

শ্যামা চলা বন্ধ করে আমার দিকে তাকায়। অন্ধকারে ওর মুখখানি অস্পষ্ট।

একটু বাদে সে আবার চলতে শুরু করে। চলতে চলতে পাল্টা প্রশ্ন করে, "তোমার কি মনে হয়?"

"গুরুদেব।"

"আগে ছিলেন।"

"এখন?"

"স্বামী।"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। ঐ বুড়ো বাবাজী শ্যামার স্বামী! এ কেমন করে সম্ভব!

"অবাক হচ্ছ, না?" শ্যামা জিজ্ঞেস করে।

আমি তবু নির্বাক।

শ্যামা আবার বলে, "আমার জীবনেও এমন একদিন ছিল, যখন কেউ এ কথা বললে, আমিও এমনি অবাক হতাম। কিন্তু সেদিন মিথ্যে হয়ে গেছে। আজ আমার জীবনে ওনার চেয়ে বড় সত্য আর কিছুই নেই।"

শ্যামা থামে। কিন্তু আমি এখনও বলার মতো কথা পাচ্ছি নে খুঁজে।

আমায় বলতেও হয় না কিছু। শ্যামাই আবার বলে, "গোসাঁই, জীবন সম্পর্কে তোমার কতটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে, জানা নেই আমার। তবু মনে হয় তোমার থেকে আমার সে অভিজ্ঞতা কিছু বেশি। সেই দাবিতেই বলছি, কোন্‌টি ভাল আর কোন্‌টি মন্দ, তা কখনও চট্ করে সাব্যস্ত করে নিও না। ঐ বৃদ্ধ বৈষ্ণব আমার স্বামী। এ কথা শুনে হয়তো আমার জন্য মমতায় তোমার মনটা পূর্ণ হয়ে উঠেছে, আর ঐ বৃদ্ধের প্রতি তোমার মন উঠেছে বিষিয়ে। কিন্তু আমার সব কথা শুনলে দেখবে, ওনার চেয়ে বড় বান্ধব আমার জীবনে আসে নি আর অমন মহানুভব মানুষও সংসারে দুর্লভ।

যাক্ গে, আমরা এসে গেছি। ঐ যে নৌকো দেখা যাচ্ছে। আমি এগিয়ে যাই। তুমি একটু আস্তে আস্তে এসো। নইলে আবার নানা কথা উঠবে।"

আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে, টর্চটা আমার পকেটে রেখে ছোঁ মেরে দুধের পাত্রটা নিয়ে এগিয়ে যায় শ্যামা। ওর কুয়াশা-ছাওয়া শরীরটা অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে অবশেষে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সারি সারি নৌকোর মৃদু আলোয় পথ দেখে আমি গঙ্গার তীরে এসে পৌছই। একবার গঙ্গার দিকে তাকাই। অনন্তকালের প্রবহমানা গঙ্গা।

কিন্তু কেবল তো গঙ্গা নয়। জীবনও যে তাই—মানুষের জীবন। সে-ও যে অনন্তকাল ধরে এমনি করেই বয়ে চলেছে। সুখ-দুঃখ, দারিদ্র্য-প্রাচুর্য, শান্তি-অশান্তি—সব কিছু উপেক্ষা করে মানুষের জীবন চলেছে বয়ে।

এই যে শ্যামা হাসল, কাঁদল—তার হাসি-কান্নায়-ভরা জীবনের কিছু কথা আমাকে বলল। যা বলল, তার চাইতে অনেক বেশী না-বলা রয়ে গেল। কিন্তু তার চোখের জলে আমার জীবন-নদীর জোয়ার-ভাঁটায় তো কোন পরিবর্তন আসবে না। আমার মন বেদনাহত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ বেদনা নেহাতই সাময়িক। এই সীতা-সাবিত্রীর দেশে প্রতিদিন এমন কত শত-সহস্র শ্যামার চোখের জল পড়ছে, কিন্তু তাতে আমাদের কি এসে যাচ্ছে? আমরা ভাবছি, এই তো নিয়ম—জীবনের নিয়ম। যে জীবন প্রতিকূলতার সকল উপলখণ্ডকে উপেক্ষা করে অনন্তকাল ধরে চলেছে বয়ে —জন্মের গোমুখী থেকে মৃত্যুর মহাসাগরে।

॥ ছয় ॥

মনে মনে খুশি হলেও রসগোল্লার ভাঁড়টা হাতে নিয়ে দি'মা বলে ওঠেন, "তোর আর কোনকালে বুদ্ধি-সুদ্ধি হবে না।"

"কেমন করে বুঝলে বল তো?" আমি সহাস্যে প্রশ্ন করি।

দি'মা বলেন, "তাহলে কি তুই আমার একার জন্য এতগুলি রসগোল্লা নিয়ে আসতিস?"

"তোমার একার জন্য এনেছি, কে বলল?"

"তুই-ও খাবি বুঝি? তা বেশ করেছিস। নে, দুটো এখুনি খেয়ে নে।"

দি'মা ভাঁড়টা খুলতে শুরু করেন।

বলি, "আমি খাব না।"

"কে খাবে তাহলে?"

ইশারায় বাবাজীকে দেখিয়ে বলি, "ওনাকে দিন, আপনি খান, তারপর যা থাকে, কাল সকালে খাবেন।"

ভেবেছিলাম বাবাজীর কথা শুনে দি'মা অসন্তুষ্ট হবেন, কারণ তিনি শ্যামার ওপরে খুশি নন। কিন্তু সে ভাবনা মিথ্যে হয়। দি'মা শ্যামাকে বলেন, "ওনাকে খালি দুধ খাওয়াস নে, সেই সঙ্গে দুটো রসগোল্লা দে।"

"পারবেন কি খেতে?" শ্যামা দুধের গ্লাসটা পাশে রেখে রসগোল্লার বাটিটা হাতে নেয়।

"খুব পারবে। ভেঙে ভেঙে দে। টাটকা রসগোল্লা। নাতি নিজে নিয়ে এসেছে।"

শ্যামা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেই।

শ্যামা জিজ্ঞেস করে, "কিন্তু চারটে দিলেন কেন?"

"দুটো তোর। আমরা খাব আর তুই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবি!"

শ্যামা আর আপত্তি করে না। কারণ আমার মতো সে-ও জেনেছে, আপত্তি করে লাভ নেই কিছু।

শেষ পর্যন্ত শ্যামার আশঙ্কাই সত্য হয়। রসগোল্লার টুকরোটা কিছুতেই গিলতে পারলেন না বাবাজী। তার আগে তবু কয়েক ফোঁটা দুধ পেটে গিয়েছিল। কিন্তু রসগোল্লার দাপটে তাও উঠে এল। বাবাজীর বমিতে শ্যামার জামাকাপড় ভরে গেল। কেবল তাই নয়, বাবাজী আবার তেমনি অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর বুকফাটা কাশির শব্দে চিন্তিত হয়ে পড়ি।

ঘুমের ওষুধটা খাওয়ায় শ্যামা। অনেকক্ষণ বাদে বাদে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন, বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে। শ্যামা তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তাতে তাঁর যন্ত্রণার উপশম হচ্ছে না।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে বাবাজীর বুকের দোলা খানিকটা কমে আসে। আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়েন তিনি। তাঁর চোখ বুজে আসে। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়লেন। ভালই হল। শ্যামা বেচারী বিশ্রাম নিতে পারবে একটু।

কিন্তু বিশ্রামের যে অনেক দেরি তার। থলি থেকে পুরনো কাপড় বের

করে নৌকো থেকে নেমে যায় শ্যামা। সব ধুয়ে পোশাক পাল্টে কাঁপতে কাঁপতে সে যখন নৌকায় ফিরে আসে, তখন বাবাজী সম্পূর্ণ শব্দহীন। কিন্তু নৌকো রীতিমত শব্দময়। অনেকেই রাতের খাবার নিয়ে বসেছেন।

দি'মা মুড়ির টিন খুলছেন। ব্যাপার কি, তিনি কি মুড়ি খাবেন নাকি? কিন্তু তিনি তো মুড়ি খান না!

অনতিবিলম্বেই ব্যাপারটা বুঝতে পারি। দি'মা নয়, আমি খাব। তেমনি এক থালা মুড়ির মধ্যে দুটি রসগোল্লা দিয়ে থালাখানি আমার দিকে বাড়িয়ে দি'মা বলেন, "নে ধর।"

"আমার যে একদম খিদে পায় নি।" বিনীত স্বরে বলি।

"খিদে পায় নি!" দি'মা ভেংচি কাটেন, "বললেই হল? সেই কোন্ দুপুরে দুটি মুড়ি খেয়েছিস, আর এখনও খিদে পায় নি?"

"সত্যি বলছি, একদম খিদে পায় নি। তুমি পেট টিপে দেখ।" আমি গায়ের চাদর ও জামা সরাতে চাই।

দি'মা হেসে দেন, "তিন বছরের নাতি আমার, পেট টিপে দেখতে হবে ওনার খিদে পেয়েছে কিনা!" একটু থেমে আবার বলেন, "আচ্ছা এই নে, কমিয়ে দিলাম। আর গোলমাল করিস নে, লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড় তো।"

শ্যামা মুচকি হাসছে। আমার অসহায় অবস্থাটা রসিয়ে উপভোগ করছে। বড্ড রাগ হচ্ছে ওর ওপর। কিন্তু তা প্রকাশ করার উপায় নেই।

অগত্যা মুড়ির থালাটা কাছে টেনে নিই। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে যায় নিজের থেকেই। বলি, "আবার মুড়ি?"

"এখেনে মুড়ি ছাড়া আর কি পাব বাবা! আজকের রাতটা একটু কষ্ট কর্। কাল তোকে ভাত রেঁধে খাওয়াব।"

আমার বয়সটা বোধ করি এই স্নেহশীলা রমণীর পাল্লায় পড়ে কমে গেছে। তিনি আমাকে প্রবোধ দিচ্ছেন, ছেলে ভুলাচ্ছেন।

হেসে একমুঠো মুড়ি মুখে দিই।

দি'মা খুশি হন। হেসে বলেন, "এই তো লক্ষ্মী ছেলে।"

"তুমি খাবে না?"

"খাব বৈকি। এই যে চারটে রসগোল্লা নিয়েছি।"

"আর কিছু খাবে না?"

"না রে বাবা, আমি বুড়ো মানুষ। আমাদের কি রাতে বেশি খেতে আছে?"

কথাটা সমর্থনযোগ্য নয়। তবে প্রতিবাদ করাও নিরর্থক। তাই কথা না বাড়িয়ে মুড়ির থালায় মনঃসংযোগ করি, একমুঠো মুড়ি মুখে পুরে চিবোতে শুরু করি। দি'মা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টিতে পরম প্রশান্তি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, পরীক্ষা দিচ্ছি—মুড়ি চিবানোর পরীক্ষা। আর দি'মা 'গার্ড' দিচ্ছেন, যাতে না ফাঁকি দিতে পারি।

না, আর পারছি না। দুপুরে মুড়ি চিবিয়ে যে চোয়াল-ব্যথা হয়েছে, তা এখনও কমে নি। অথচ আবার মুড়ি চিবোতে হচ্ছে। মুড়ি-চর্বণ দেখছি রীতিমত শক্তিক্ষয়কারী প্রক্রিয়া। অথচ সাগরযাত্রীরা তাঁদের দন্তসহযোগে এ কদিনে যা মুড়ি-মর্দন করবেন, তা এক জায়গায় জমা করলে হিমালয়ের একটি ছোটখাটো শৃঙ্গের মত উঁচু হয়ে যাবে।

কিন্তু আমি যে আর পারছি না। আমার চোয়াল-জোড়া ব্যথা হয়ে গেছে, দাঁতের গোড়া টনটন করছে, গলা আটকে আসছে, দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। অথচ না পারছি খাওয়া বন্ধ করতে, না পারছি মুড়িগুলো ফেলে দিতে। দি'মা এদিকে তাকিয়ে ঠায় বসে রয়েছেন।

হঠাৎ তাঁর কি সুমতি হল। আমার জন্য জল আনতে তিনি গলুইতে চললেন। আপত্তি করলাম না। কিন্তু মুড়িগুলো কিভাবে কমিয়ে ফেলা যায়! উঠে গিয়ে পেছন দিকে ফেলে আসার সময় নেই, ইতিমধ্যে দি'মা এসে যাবেন। কাছাকাছি ফেলে দেবার আর জায়গাও নেই। কি করা যায়?

শ্যামা একটু এগিয়ে আসে আমার দিকে। চারিদিক দেখে নিয়ে আঁচল পাতে আমার সামনে। কানে কানে বলে, "খানিকটা মুড়ি ঢেলে দাও এখানে। সব দিও না। ধরা পড়ে যাবে।"

"কি করবেন? ফেলে দেবেন?"

"না, খাবার জিনিস ফেলে দেব কেন? খাব।"

"সে কি! এঁটো মুড়ি খাবেন? আমার পাপ হবে যে?"

"হোক্ গে। দেরি কোর না। ঐ দি'মা আসছেন।"

আর ভাববার সময় নেই। পাপ-পুণ্যকে ভুলে গিয়ে তাড়াতাড়ি বৈষ্ণবীর নির্দেশ পালন করি। সে আঁচলে মুড়ি নিয়ে সরে বসে।

দি'মা ফিরে আসেন। জায়গায় বসেন। আমার থালার দিকে তাকিয়ে

চুপ করে থাকেন।

দি'মা কি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন? আমি সভয়ে শ্যামার দিকে তাকাই। সে আবার ঐ মুড়ি খেতে আরম্ভ করেছে।

"এই তো লক্ষ্মী ছেলে আমার।" দি'মা আমাকে বলেন, "খিদে পায় নি তো ঐ এক থালা মুড়ি কে খেল বাবা! ওরে, তুই কি শেখাবি আমাকে, আমি মুখ দেখলে বুঝতে পারি। তোর খুব খিদে পেয়েছিল। নে, এবারে থালাটা রেখে দিয়ে শুয়ে পড়।"

হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি।

অধিকাংশ যাত্রী মুড়ি-চর্বণ পর্ব সমাধা করে শুয়ে পড়েছেন। যাঁরা বসে রয়েছেন, তাঁরা তাস কিংবা দাবা সহ ধূমপানে ব্যস্ত। কাজেই নৌকো মোটামুটি শান্ত। আর তাই কূলনাশিনী গঙ্গার কলকল ছলছল শব্দ সজাগ হয়ে উঠেছে। সেই শব্দের সঙ্গে সমতা রেখে আমাদের 'নৌকো দুলছে। মৃদু-মন্দ সে দোলায় আমরা আন্দোলিত হচ্ছি।

সহসা সেই নৌকো থেকে গানের সুর ভেসে আসে। আমাদের একটু আগে ডায়মণ্ড হারবার থেকে যাত্রা করেছিলেন ওঁরা। মাঝে মাঝেই গ্রামোফোন বাজিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে নোঙ্গর করার পর থেকে আর ওঁদের সাড়াশব্দ পাই নি। বোধ হয় খাওয়া-দাওয়ায় ব্যস্ত ছিলেন এতক্ষণ। এবারে কলের গান চালিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের গান—গঙ্গার গান—

"পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে (ওগো মা)!
শ্যামবিটপিঘনতটবিপ্লাবিনি ধূসর তরঙ্গ-ভঙ্গে (মা)।
পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!
কত নগ নগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি চরণযুগ মায়ি!
কত নরনারী ধন্য হইল মা তব সলিলে অবগাহি'!
বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে কত শত যুগ যুগ বাহি,
করি সুশ্যামল কত মরু প্রান্তর শীতল পুণ্য-তরঙ্গে।
(ওগো মা) পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!
নারদকীর্তন-পুলকিতমাধব-বিগলিতকরুণা ক্ষরিয়া,
ব্রহ্মকমণ্ডলু উচ্ছলি ধূর্জটি-জটিল-জটা 'পর ঝরিয়া,
অম্বর হইতে সম শতধারা জ্যোতিপ্রপাত তিমিরে—

নামি ধরায় হিমাচল-মূলে মিশিলে সাগর সঙ্গে।
(ওগো মা) পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!
পরিহরি ভব-সুখদুঃখ যখন মা শায়িত অন্তিম শয়নে
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব বরিষ সুপ্তি মম নয়নে ;
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে বরিষ অমৃত মম অঙ্গে
মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি! কলকল্লোলিনি গঙ্গে!
(ওগো মা) পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!"

শুনেছি এই গান শুনে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মোহিত হয়েছিলেন। আমারও বড় ভাল লাগল। মনে মনে ধন্যবাদ দিই ওঁদের। পরিবেশের সঙ্গে সমতা রেখে যাঁরা আনন্দের আসর বসান, তাঁরা নিঃসন্দেহে সংস্কৃতিবান্।

সব চেয়ে বিস্ময়কর, আর গানের শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। ওঁরা বোধ করি বিশ্রামের আয়োজন করছেন। গঙ্গার বুকে ঘুমিয়ে পড়ার আগে গঙ্গার বন্দনা করে নিলেন। প্রার্থনা করলেন, 'হে পতিতোদ্ধারিণি, তুমি উদ্ধার করো আমাদের,' উদ্ধার করো ছোট-বড় ও ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সকল সাগরযাত্রীদের।

শুয়ে শুয়ে তার কথাই ভাবা যাক—গঙ্গার কথা।

ভারতের প্রাচীন সভ্যতা যেমন গড়ে উঠেছে গঙ্গাকে কেন্দ্র করে, তেমনি আধুনিক ভারতের ইতিহাসও গড়ে উঠেছে গঙ্গাকে অবলম্বন করে। গঙ্গার বুক বেয়েই একদিন পর্তুগীজ ওলন্দাজ ফরাসী ও ইংরেজদের বাণিজ্যতরী, চুঁচুড়া ফলতা চন্দননগর ও কলকাতার ঘাটে এসে ভিড়েছিল। আর তারই পরিণতি ভারতের দুশ' বছরের পরাধীনতা।

কিন্তু না, আমি ভারতের কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি গঙ্গার কথা, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণার গঙ্গা। এই চব্বিশ পরগণার মাটি থেকেই ভারতে ইংরেজ রাজত্বের পত্তন হয়েছে। আর ইংরেজ রাজত্বের অবসানের পরে যে চব্বিশ পরগণা আমার মত লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারাকে আশ্রয় দিয়েছে।

চব্বিশ পরগণার মাটিতে বার বার ভারতের ভাগ্য নিরূপিত হয়েছে। মনে পড়ছে ১৭৩০ সালের কথা। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবং ওলন্দাজদের প্ররোচনায় মুঘল সম্রাটের প্রতিনিধি হুগলীর ফৌজদার 'বাঁকি বাজার' (বর্তমান কলকাতার পঁচিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল) থেকে অস্টেণ্ড

কোম্পানিকে বিতাড়িত করলেন। অথচ তাঁরা ওদের আগে বাংলায় এসে ১৭২৩ সালে সেখানে কারখানা স্থাপন করেছিলেন।

১৭৩৩ সালে অস্টেণ্ড কোম্পানি এদেশ ছেড়ে চলে গেলেন। সেদিন হুগলীর ফৌজদার তাঁদের সে আঘাত না হানলে হয়তো তাঁরাই পরবর্তীকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্থান অধিকার করে বসতেন। আর আজ ভারতের ইতিহাস্ অন্যভাবে লেখা হত।

পলাশীর যুদ্ধের পরে বাংলার নবনিযুক্ত নবাব মীরজাফর ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর একটি দলিল করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে চব্বিশ পরগণার জমিদারী-স্বত্ব দান করেন।. আর সেদিন থেকেই 'বণিকের মানদণ্ড····· দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে।'

চব্বিশটি পরগণায় তখন এই অঞ্চল বিভক্ত ছিল বলে, এই স্বত্বের নাম হয় চব্বিশ পরগণার জমিদারী-স্বত্ব।

১৭৫৯ সালে দিল্লীর সম্রাট এই জমিদারীর জন্য তাঁর প্রাপ্য খাজনা লর্ড ক্লাইভকে (তখন কর্ণেল) লিখে দেন। দানপত্রে সম্রাট বলেছেন যে, তিনি ক্লাইভের কাজে খুশি হয়ে তাঁকে এই পুরস্কার দিচ্ছেন। কাজটি হল ক্লাইভ সম্রাটের প্রথম পুত্র শাহ আলমের বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। সে যাই হোক্ ১৭৫৯ সালের ১১ই জুন লর্ড ক্লাইভ এবং কোম্পানির মধ্যে আর একটি দলিল স্বাক্ষরিত হল। কোম্পানির পক্ষ থেকে জে. জেড্. হল্‌ওয়েল এই দলিলে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির পর থেকে কোম্পানি লর্ড ক্লাইভকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত দু লক্ষ বাইশ হাজার টাকা বাৎসরিক খাজনা দিয়েছে। ক্লাইভের মৃত্যুর পরে কোম্পানি চব্বিশ পরগণার সর্বস্বত্ব লাভ করে। তখন এই জমিদারীর আয়তন ছিল ৪৮৮২ বর্গমাইল।*

চব্বিশ পরগণা থেকে ভারতের পরাধীনতা শুরু। কিন্তু সে পরাধীনতায় কেবলই মন্দ হয়েছে, তাই বা বলি কেমন করে! ইংরেজ শাসনে যেমন এদেশের বহু মন্দ হয়েছে, তেমনি ভালও হয়েছে অনেক। আর তার মধ্যে কলকাতার পত্তন, চব্বিশ পরগণার উন্নয়ন এবং সাগরদ্বীপে বসতি-স্থাপন অন্যতম।

কাজেই সেকথা না ভেবে গঙ্গার কথাই ভাবা যাক, চব্বিশ পরগণার গঙ্গা।

---

* Statistical and Geographical Report on 24 Pergunnahs District by Major Ralph Smythe—1857

সমগ্র চব্বিশ পরগণা জেলাই গঙ্গা ও তার শাখানদীর দ্বারা বিধৌত। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, এই শাখানদীগুলি এককালে খাঁড়ি বা খাল ছিল। পঞ্চাশ বছর আগেও এই সব শাখানদীর অধিকাংশ ছিল নাব্য। কিন্তু তখন মূল গঙ্গার বেশির ভাগ জল বয়ে যেত পদ্মা দিয়ে। ফলে গঙ্গা ও তার শাখানদীসমূহে পলি জমত। তাই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই ভয় করা হচ্ছে, গঙ্গা নাব্যতা হারিয়ে ফেলবে এবং কলকাতা বন্দরের মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু সে আশঙ্কা আজও সত্য হয় নি। ড্রেজার চালিয়ে বন্দরকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। আর সব চেয়ে বিস্ময়কর, গত শতাব্দীর তুলনায় এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে গঙ্গার নাব্যতার উন্নতি হয়েছিল।

কিন্তু এ উন্নতি কি কেবলই ড্রেজিং করার জন্য? না। গঙ্গা নিজেও বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে। সে কেবল মূল গঙ্গার জলের ওপরেই নির্ভর করে না। বর্ষাকালে ছোটনাগপুর জেলার অসংখ্য ছোট-বড় নদী ও ঝরণার জল তার পুষ্টিসাধন করে। গ্রীষ্মকালে গঙ্গা অনুস্রবণ (Percolation) বা ভূগর্ভস্থ জলধারার অনুপ্রবেশ (Underground infiltration) দ্বারা অনেকটা পুষ্ট হয়। এই জলধারার উৎস নদীতলের অনেক নিচে। গঙ্গা নিজেই এই সব কূপ খনন করেছে।

আরও একটি কারণে সেই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয় নি। গঙ্গা একটি জোয়ার-ভাঁটা-বিশিষ্ট (Tidal) নদী। মাঝে মাঝেই জোয়ারের টানে সুবিপুল জলরাশি সমুদ্র থেকে গঙ্গায় আসে। আমরা এই জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসকে বলি বান। হিসেব করে দেখা গেছে, গ্রীষ্মকালে বানে যে জল আসে, তার পরিমাণ বর্ষার বানের দ্বিগুণ। সব চেয়ে বড় বান হয় চৈত্র বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বানের উচ্চতা গড়ে ষোল ফুট আর বর্ষাকালে দশ থেকে সাড়ে তিন ফুট মাত্র।

ইদানীং কিন্তু ড্রেজিং করে গঙ্গার নাব্যতা আর রক্ষা করা যাচ্ছে না। ক্রমেই পলির পরিমাণ বাড়ছে। ফলে কলকাতা বন্দর ক্রমেই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং এ বছর (১৯২০ খ্রীঃ) মানে কলকাতা বন্দরের এই শতবার্ষিকী বছরে, যেন তার নাভিশ্বাস উঠেছে। বড় বড় জাহাজ এখন আর কলকাতায় আসতে পারছে না। বন্দরের গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে। আসামের চা এখন বেশির ভাগ কাণ্ডলা বন্দর দিয়ে রপ্তানি করা হচ্ছে। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে বর্তমানে মাদ্রাজের যোগাযোগ বেশি।

কেন এমন হল? বিশেষজ্ঞরা কি বলবেন জানি না, কিন্তু আমার ধারণা দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা প্রধানত এর জন্য দায়ী। দামোদর আর রূপনারায়ণ দিয়ে এখন আর আগের মত ছোটনাগপুর জেলার জল গঙ্গায় আসতে পারছে না। বাঁধ দেবার ফলে জলের পরিমাণ কমে গেছে। আর তাই বোধ করি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্প সম্পূর্ণ হলেই কলকাতা বন্দরের সব সমস্যার সমাধান হবে না। অজয় নদে বাঁধ দিয়ে আরও কিছু জল গঙ্গায় নিয়ে আসতে হবে।

তারপরে রয়েছে নোংরা ও দূষিত জলের কবল থেকে গঙ্গাকে রক্ষা করার সমস্যা। প্রতিদিন সোয়া পাঁচ কোটি গ্যালন নোংরা জল পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গায় মিশছে। এখুনি আইন করে কলকারখানা ও পৌরসংস্থাগুলোকে চোয়ানো জল ছাঁকার যন্ত্র বসাতে বাধ্য করা দরকার। নইলে অদূর ভবিষ্যতে গঙ্গার জল অপেয় হয়ে উঠবে।

হলদিয়াতে নতুন বন্দর গড়ে তোলা হচ্ছে। ভাল কথা। কলকাতা বন্দরকে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, হলদিয়ার হয়তো সে-সব সমস্যা থাকবে না। কারণ হলদিয়া সাগরের নিকটতর। আর তার ফলে বন্দর-সমস্যারও সমাধান হবে। কিন্তু তাতে কলকাতার কি এসে গেল? কলকাতা তো কেবল বন্দর নয়, কলকাতা ভারতের বৃহত্তম মহানগরী। আর গঙ্গাকে ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। কাজেই কলকাতার প্রয়োজনেই গঙ্গাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কারণ কলকাতা ও গঙ্গা দুইকে নিয়েই বাংলা—সোনার বাংলা।

দিদিমার দিকে চোখ পড়তেই আমার ভাবনা থেমে যায়। আমি না হয় গঙ্গার দিকে তাকিয়ে গঙ্গার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু তিনি চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা না করে অমন ভাবে গঙ্গার দিকে চেয়ে আছেন কেন? কার কথা ভাবছেন? শুধু তাই নয়, তাঁর দু'চোখের কোল বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। দিদিমা কাঁদছেন। কিন্তু কেন?

জিজ্ঞেস করি, "তুমি কাঁদছ দি'মা?"

দিদিমা চমকে ওঠেন। তিনি যেন হারিয়ে গিয়েছিলেন বহুদূরের কোন এক বিস্মৃতির জগতে, এইমাত্র এলেন ফিরে। তাড়াতাড়ি দু'হাতে চোখ মুছে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, "না। এমনি ওদের কথা ভাবছিলাম আর কি।"

"কাদের কথা দি'মা?"

একটুকাল চুপ করে থাকেন দি'মা। কি যেন ভাবেন। তারপরে বলেন, "ঐ শিবে আর কমলির কথা।"

"তখন কিন্তু বলেছিলে, তুমি তাদের কথা বলবে আমাকে!" আমি দি'মার দিকে তাকাই।

তিনিও তাকান আমার দিকে। গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, "শুনবি ওদের কথা?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে শোন্," দি'মা বলতে শুরু করেন—

দি'মার ভাস্বরপোর ছেলে শিবু। কালু অর্থাৎ তাঁর একমাত্র সন্তানের থেকে সে মাত্র দু' বছরের ছোট। কালুর অকাল মৃত্যুর পরে দি'মা তাই মাতৃহারা শিবুকে মাতৃস্নেহে মানুষ করেছিলেন।

শিশু শিবু দি'মার সীমাহীন স্নেহে পুষ্ট হয়ে কৈশোরে পদার্পণ করল। পাশের বাড়ির কিশোরী কমলা ছিল তার খেলার সাথী। হেসে-খেলে বড় হতে থাকল দুজনে। কিশোর-কিশোরী যৌবনে পা দিল। কৈশোরের সাথীকে জীবনসাথী করতে চাইল ওরা। এলো বাধা, শিবু ব্রাহ্মণ, কমলা কায়স্থ। কমলা অবস্থাপন্ন, শিবু মধ্যবিত্ত। শিবু কলকাতার ছেলে, কমলাদের আদিনিবাস পূর্ববঙ্গে। এত বাধাকে অতিক্রম করার সাধ্য হল না ওদের। দুজনের অভিভাবকরা কিছুতেই সম্মত হলেন না ওদের প্রস্তাবে —এমন কি দি'মার সুপারিশের পরেও তাঁরা অটল রইলেন। শিবুর বাবা তাকে ত্যজ্যপুত্র করতে চাইলেন আর কমলার বাবা চাইলেন তাকে তাড়িয়ে দিতে। আপত্তি করল না ওরা।

একদিন সকালে শিবু আর কমলাকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। দু-বাড়ির লোক দু-বাড়িতে দৌড়ে এলো। দুজনের বাবাই থানায় ডায়েরী করলেন। দুজনেই দুজনকে মামলা রুজু করার ভয় দেখালেন। কিন্তু কারও নামেই শেষ পর্যন্ত শমন এল না।

মাস গেল, বছর ঘুরে এল। একদিন দুই বাবা মিলিত হলেন। দুজনেই চোখের জল ফেললেন। তারপর অনেক পরামর্শের পরে দুজনে একসঙ্গে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপালেন। অনুরোধ করলেন ওদের ফিরে আসতে। প্রতিশ্রুতি দিলেন ফিরে এলে তাঁরা পরম সমাদরে ওদের ঘরে ফিরিয়ে নেবেন—মহাসমারোহে বিয়ে দেবেন।

কিন্তু তখন বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে। শিবু ও কমলা তখন সে বিজ্ঞাপনের গণ্ডীর বাইরে। অনুতপ্ত পিতাদের আন্তরিক আহ্বান তাদের কানে পৌঁছয় নি।

তারপরে শিবুর সঙ্গে দি'মার দেখা সেই দ্বারকায়। সে তখন আর শিবু নয়, স্বামী শিবানন্দ। সেদিনও সে দি'মার ডাকে সাড়া দেয় নি। সেদিন দি'মার চোখের জলে দ্বারকার মাটি ভিজেছে কিন্তু নিষ্ঠুর শিবুর মন ভেজে নি। শেষ পর্যন্ত সে তাঁর হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেছে। আর দেখা হয় নি শিবুর সঙ্গে। হয়তো আর হবেও না কোনদিন।

শিবুর কথা বলা শেষ হয়। দি'মা আঁচলে চোখ মোছেন। স্নেহশীল রমণী।

একটু বাদে বলি, "আচ্ছা শিবুবাবু কি কমলা দেবীর কথা কিছু বলেছেন? তাঁর কি হল? তিনিই বা সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন কেন?"

"সন্দেহ, বাবা সন্দেহ। সংসার নষ্ট করতে যার আর জুড়ি নেই। মিথ্যা সন্দেহ ওদের ভালবাসাকে মেরে ফেলেছে। (তাই তো আমি সবাইকে বলি বাবা, তোকেও বলছি—সন্দেহ করে জেতার চেয়ে, বিশ্বাস করে ঠকা অনেক ভাল।")

"আশ্চর্য!" আমি বলি, "শেষ পর্যন্ত ওঁরা দু'জনে দু'জনের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেললেন?"

"না, কমলা নয়, শিবু," দি'মা বলেন, "লক্ষ্ণৌতে ওরা একটা বস্তিতে ঘর নিয়েছিল। কমলার গয়নাগুলি শেষ হবার পরে ওরা আর্থিক টানাটানির মধ্যে পড়ে যায়। অনেক চেষ্টা করেও শিবু একটা চাকরি যোগাড় করতে পারে নি। একবেলা খেয়ে ও না খেয়ে দিন কাটতে থাকে ওদের। বাধ্য হয়ে কমলা একটা ছোট চামড়ার কারখানায় কাজ নেয়। সকালে শিবুর জন্য রান্না করে রেখে কাজে চলে যেত। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পরে রাতে বাড়ি ফিরে আবার রান্না করতে হত তাকে॥ অতিরিক্ত রোজগারের জন্য রাত জেগে ব্যাগ সেলাই করত সে।"

"তা সত্ত্বেও শিবুবাবু তাঁকে সন্দেহ করলেন?" আমি মাঝখান থেকে বলে উঠি।

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু কেন?"

"কমলা নিজে না খেয়ে শিবুকে খাওয়াতো, নিজে না পরে ওর জামা-কাপড় কিনে আনত, শিবু সেজন্য কমলার প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে হল ঈর্ষান্বিত। তার সন্দেহ কমলার এই রোজগার সবটাই সৎ উপায়ে অর্জিত নয়। সে তাকে অবিশ্বাস করতে শুরু করল। তার ওপরে একদিন বর্ষার রাতে সে যখন দেখল কারখানার যুবক মালিক কমলাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে গেল, সেদিন সে সন্দেহ হল বদ্ধমূল।

"শুরু হল অশান্তি। তবু কমলা শিবুকে সন্দেহমুক্ত করার অনেক চেষ্টা করেছে। যখন দেখল কিছুতেই তা হবার উপায় নেই, তখন শিবুর মিথ্যা সন্দেহকে সত্যে পরিণত করার জন্য সে মরীয়া হয়ে উঠল। সে সুন্দরী যুবতী, মোটামুটি লেখাপড়া জানে। তার ওপর কলকাতার মেয়ে। পাপের পথে পা বাড়িয়ে হোঁচট খেল না সে।"

"তাঁর সঙ্গে কি তোমার আর দেখা হয় নি ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"হয়েছে।"

"কোথায় ?"

"মহেশে। তার বাবুর সঙ্গে গাড়িতে করে রথযাত্রা দেখতে গিয়েছিল।"

"বাবু !" আমি চমকে উঠি।

"ক্ষীণকণ্ঠে দি'মা বলেন, "হ্যাঁ রে তাই। দু-তিনজনের হাত বদলে সে তখন এক মাড়োয়ারী মহাজনের রক্ষিতা। তারই সঙ্গে মেলায় গিয়েছিল।"

নিজের অলক্ষ্যেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে যায়। দি'মা চুপ করে আছেন। হয়তো হতভাগিনী কমলার কথাই ভাবছেন।

একটু বাদে বলি, "তাঁর সঙ্গে তোমার কোন কথা হয়েছিল ?''

"হ্যাঁ, সেই মোটা আধবুড়ো লোকটাকে দাঁড়াতে বলে সে আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলতে বলতে কেঁদে ভাসিয়েছিল।"

একটু শান্ত হবার পরে আমি ওকে বলেছিলাম, "তুই যা-ই হয়ে থাক্ মা, আমার কাছে সেই কমলাই আছিস। আমার সঙ্গে চল। আমি তোকে বুকে করে রাখব।"

"তা হয় না ঠাকুমা।" কমলা বলেছিল, "আমি যেখানে নেমে গেছি সেখান থেকে আর উঠে আসা যায় না। আপনার সাধ্যি নেই আমাকে টেনে তোলার। আমার জন্য চিন্তা করবেন না। ভগবান আমার সহায়।

কিন্তু সে যদি কখনও ফিরে আসে, তাকে একটু দেখবেন আর একবার বলবেন, আমি আজও তাকে তেমনি ভালবাসি। শেষ নিঃশ্বাস নেবার মুহূর্তেও এ ভালোবাসা অক্ষয় হয়ে থাকবে।”

থামলেন দি'মা। চেষ্টা করেও বলার মতো কথা পাচ্ছি না খুঁজে। আমি চুপ করে থাকি।

চোখ মুছে দি'মা শুয়ে পড়েন। তাই ভাল, তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন।

নৌকোর কোলাহল কমে গেছে। অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁদের নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাসের শব্দ এবং কূলনাশিনী গঙ্গার কলধ্বনি ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

॥ সাত ॥

ঘুম ভাঙল গানের সুরে। মধুক্ষরা নারীকণ্ঠের গান। কীর্তন গান—

“আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশ দিশ ভেল নিরবন্দা॥”

চোখ মেলে দেখি, আমার অনুমান মিথ্যে নয়। শ্যামাই গান গাইছে। বাবাজীকে গান শোনাচ্ছে শ্যামা। হয়তো রোজ সকালেই এমনি শোনায়—

“আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥”

সে গান গাইছে আবেগজড়িত সুরে। তার অর্ধনিমীলিত দুটি আঁখির কোল বেয়ে অশ্রু পড়ছে গড়িয়ে। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই তার। কেমন করে থাকবে? সে যে বিরহবিধুরা রাধে, সে যে উন্মাদিনী রাই। সে আপন মনে গেয়ে চলেছে—

“সোহ কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।

পাঁচবাণ অব লাখবাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা ॥”

শ্যামার গান শেষ হয়। ঘুম-ভাঙা যাত্রীদের চমক ভাঙে। নীরব নৌকো সরব হয়ে উঠল। সে রব অবশ্য সবটাই শ্যামার উদ্দেশে। তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ যাত্রীদল। বলা বাহুল্য তাদের মধ্যে দি'মাও আছেন। গান গেয়ে শ্যামা সবার মন হরণ করেছে। সে সত্যই ভাল গান গায়।

শ্যামা লজ্জা পায়। তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চোখ-মুখ মোছে। তারপরে অর্ধ-অচেতন বৈষ্ণবকে কি যেন একটু বলে বাইরে বেরিয়ে যায়।

একটু বাদে উঠে বসি। ব্যাগ খুলে গামছা ও দাঁতের মাজন বের করে আমিও গলুইতে আসি। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বসে আছে শ্যামা। কি যেন ভাবছে মনে মনে।

কি ভাবছে? গঙ্গার কথা, বাবাজীর কথা, কি নিজের কথা? ভাবুক শ্যামা। শ্যাম যে তার ভাবের ঘরে সিঁদ কেটেছে। ভাবের ঘোরে বিভোর হয়ে থাকুক শ্যামা।

কখন নৌকো ছেড়েছে টের পাই নি। আমরা তখন শ্যামার গান শুনছিলাম। এখন দেখছি নৌকো মুড়িগঙ্গায় চলে এসেছে। গঙ্গার বুক বেয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের নৌকো। গঙ্গার বুকে সোনালী রোদের পরশ। ইতিমধ্যে জলের রঙ পাল্টে গেছে। কিন্তু তাতে যেন গঙ্গার কোন পরিবর্তন হয় নি। সে যেমন ছিল, তেমনি আছে।

আজ আমি কেন যেন আর গঙ্গার কথা ভাবছি না। হয়তো সহযাত্রিনী শ্যামার সুরে ঘুম ভেঙেছে বলেই বার বার কেবল সহযাত্রীদের কথাই মনে আসছে। ভাবছি এই যে আমরা সাগর তীর্থের দিকে চলেছি এগিয়ে, এর সঙ্গে সঙ্গে কি আমাদের মনের কোন পরিবর্তন হচ্ছে?

নিশ্চয়ই হচ্ছে—নইলে কাল আমার সহযাত্রীরা যেমন পরনিন্দা ও পরচর্চা করেছেন, আজ তো আর তেমনটি করছেন না। তাঁদের আজকের আলোচনা সাগরমেলাকে কেন্দ্র করে। সেকালের মেলার সঙ্গে একালের মেলার পার্থক্য কি? তাঁরা যাত্রীদের পথকষ্ট ও সরকারী উদাসীনতার কথা বার বার বলছেন।

আমি নীরবে তাঁদের আলোচনা শুনছি আর ভাবছি এই মানুষগুলির

কথা। এঁরা সবাই আমার মতন সাধারণ মানুষ। আমারই মত সুখ-দুঃখ আর আনন্দ-বেদনায় পরিপূর্ণ এঁদের জীবন। কিন্তু আজ এঁদের দেখে মনে হচ্ছে, দুঃখ আর বেদনা বলে কিছু নেই এ জগতে। সুখ আর আনন্দ দিয়েই জীবন।

"আচ্ছা গোসাঁই, এ নদীটাও তো গঙ্গা !"

শ্যামার প্রশ্নে আমার ভাবনায় ছেদ পড়ে। পেছনে তাকিয়ে দেখি, সে আমার পাশে বসে আছে। নিঃশব্দে কখন যে আমার কাছে এগিয়ে এসেছে, টের পাই নি।

তার দিকে তাকাতেই চোখাচেখি হয়। শ্যামা হাসে। সূর্যের সোনালি রোদে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। ওর অবিন্যস্ত কুন্তল বাতাসে উড়ছে। ভারী ভাল লাগছে। সকালে গান গাইবার সময় তার সারামুখে যে বিরহবিধুর ভাবটি মূর্ত হয়ে উঠেছিল, সেটি এখনও যায় নি মিলিয়ে। আর তাই তাকে এমন সুন্দর লাগছে। সৌন্দর্য তো শুধু অবসর আর মিলনকে নিয়েই নয়, বিরহ আর অবসাদও যে সুন্দরের উপাদান। বিরহবিধুর কবি রচনা করেছেন 'মেঘদূত', আর বিরহকাতর সম্রাট গড়েছেন 'তাজমহল'।

"যা জিজ্ঞেস করলাম, তার উত্তর না দিয়ে অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে আছ যে ?" শ্যামা আবার বলে, "তুমি কি আমার প্রেমে পড়লে নাকি গো ?"

আবার চমকে উঠি। তাড়াতাড়ি চারিদিকটা দেখে নিই। না, কেউ বোধ হয় শুনতে পায় নি কথাটি। সে আস্তে আস্তেই বলেছে। কিন্তু আর চুপ করে থাকা নিরাপদ নয়। না-জানি আবার কি বলে বসবে! কিন্তু এবারে হয়তো সবাইকে শুনিয়েই বলবে। তাই উত্তর দিই, "গঙ্গা বৈকি, সবই গঙ্গা। গোটা বাংলা দেশই তো গঙ্গার অবদান।"

"দেখ গোসাঁই, আমি মূর্খ বোষ্টমী, তোমাদের ওসব জ্ঞান -বিজ্ঞানের কথা বুঝতে পারি নে আমি।"

হেসে বলি, "মূর্খ বলতে যাদের বোঝায়, আপনি তাদের দলে নন।"

"কেমন করে বুঝলে ?"

"আমার কথাটা যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের, আপনি তা বুঝতে পারলেন বলে।"

"না, তুমি বড্ড বাজে কথা বল গোসাঁই ! অযথা সময় নষ্ট না করে যা জিজ্ঞেস করলাম, তার উত্তর দেবে কি ?"

খুশি হই আমি। আমার অনুমান মিথ্যে নয়। শ্যামা মূর্খ বৈষ্ণবী নয়, সে সাধারণ লেখাপড়া জানে। নইলে সে এভাবে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইত না। আমি খুশিমনে তার প্রশ্নের উত্তর দিই, "এটি ভাগীরথী অর্থাৎ কলকাতার গঙ্গারই একটি অংশ। ঐ দ্বীপগুলি ও এই সাগরদ্বীপ সৃষ্ট হওয়ায় গঙ্গা এখানে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে, সাগরদ্বীপের দু'দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে গিয়ে মিশেছে। অর্থাৎ গঙ্গার দুটি ধারার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে সাগরদ্বীপ। পূবের এই ধারার নাম মুড়িগঙ্গা। অনেকে একে বড়তলা নদীও বলেন। ইংরেজরা বলতেন 'চ্যানেল ক্রীক্স'। আর পশ্চিমের ঐ প্রশস্ত ধারাকে আমরা বলি গঙ্গা, ইংরেজরা বলতেন হুগলী নদী। ওপারে মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমা অর্থাৎ প্রাচীন তাম্রলিপ্ত।"

"মুড়িগঙ্গা এখানে কতটা চওড়া হবে ?"

"দু মাইল।"

"হুগলী নদী ?"

"আট মাইল, সঙ্গমের কাছে বারো মাইল। চর নিয়ে আরও বেশি।"

"বাব্বা !" শ্যামা যেন আঁতকে ওঠে।

হেসে বলি, "এতেই ঘাবড়ে গেলেন ? মেঘনামুখ কতটা চওড়া জানেন ?"

"কত ?"

"চল্লিশ মাইল।"

"সে-ও তো গঙ্গা !" শ্যামা আবার প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ। সবই গঙ্গা। পূর্ব ভারতের সব নদী হয় গঙ্গা থেকে বেরিয়েছে, নয় গঙ্গায় এসে মিশেছে।"

"আচ্ছা এই মুড়িগঙ্গার সঙ্গম কতটা চওড়া ?"

"মাইল চারেক তো বটেই। নামখানার কাছেই নদী তিন মাইল চওড়া।"

"ফ্রেজারগঞ্জ নামখানা থেকে কতদূর ?"

"তেরো মাইল। বাসে ঘণ্টাখানেক সময় লাগে। কাকদ্বীপ থেকে নিয়মিত বাস যায় নামখানা। সেখানে খেয়া পেরিয়ে ফ্রেজারগঞ্জের বাসে উঠতে হয়। নামখানা কাকদ্বীপ থেকে নয় মাইল।"

"খুব সুন্দর জায়গা, না ?"

"হ্যাঁ। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য দর্শনীয়। প্রায় প্রতি পূর্ণিমাতে শত শত সৌন্দর্যপিপাসু সেখানে যান। তবে গ্রীষ্ম ও বর্ষায় না যাওয়াই ভাল।"

"কেন ?"

"বড্ড সাপের উৎপাত।"

"ওরে বাব্বা !" শ্যামা আঁতকে ওঠে, "আস্তিক মুনি, আস্তিক মুনি—মা-মনসা রক্ষা কর।"

"এখানে তো সাপ নেই, তাহলে মা-মনসাকে ডাকছেন কেন ?"

"নেই কিন্তু আসতে কতক্ষণ ! মনসার অসাধ্য কিছু নেই ! তুমি এত জান আর চাঁদ সদাগরের কথা জান না ?"

"জানি।"

"তাহলে ও-কথা বলছ কেন ?"

"না, তাঁকে ডেকে ভালই করেছেন।" আমি গম্ভীর স্বরে বলি।

"কেন ?"

"চাঁদ সদাগরের চোদ্দডিঙ্গার মত মা-মনসা হয়তো আমাদের নৌকো ডুবিয়ে দেবেন না, কিন্তু সাগরদ্বীপেও শুনেছি ফ্রেজারগঞ্জের মতই তাঁর বাহনদের দৌরাত্ম্য।"

"সত্যি বলছ ?"

"হ্যাঁ।" একবার একটু থেমে আবার বলতে থাকি, "বর্ষাকালে সুন্দরবনের অন্যান্য অঞ্চলের মতো যখন সাগরদ্বীপের ক্ষেত-খাড়ি সব জলে ভরে ওঠে, তখন সাপেরা আইলের ওপর আশ্রয় নেয়। ফলে এদের আকস্মিক কামড়ে বহু কৃষক প্রাণ হারায়।"

"কি কি সাপ আছে ?" শ্যামা প্রশ্ন করে।

উত্তর দিই, "গোখরো, মণিরাজ, শঙ্খচূড় আর কেউটেই প্রধান। তারপরেই সুন্দরবনের নিজস্ব সাপ কালাচ। ছোট সাপ। সাধারণত দু' থেকে তিন ফুট লম্বা হয়। শরীরে কালো রঙের ওপরে সাদা দাগ। ফণাহীন।"

"খুব বিষাক্ত বুঝি ?"

"হ্যাঁ। এদের বিষ অবশ্য গোখরো বা কেউটের মত অত তাড়াতাড়ি কাজ করে না। তবে বিষের তীব্রতা মোটেই কম নয়। স্থানীয় ওঝারা বলে—পচা বিষ। এদের গতিবিধি অতি ভয়ানক। দিনে বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু রাতে ঘরের বেড়ায়, চালে এমন কি বিছানার মধ্যে পর্যন্ত এদের দেখতে পাওয়া যায়। এরা নীরব ও ধীরগতি কিন্তু মানুষ কিংবা পশুকে হঠাৎ কামড়ে দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায়।"

"তাই নাকি! কি সর্বনাশ! মা-মনসা, তুমি রক্ষা করো। কিন্তু কোন্ ভরসায় তাহলে এত লোক সাগরে আসে?"

"শীতের ভরশায়।"

"মানে?"

"শীতকালে তারা গর্তের বাইরে বের হয় না।"

"তাই বল!" শ্যামা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে।

একটু থেমে শান্তস্বরে আবার বলে, "এবারে ফ্রেজারগঞ্জের কথা বল।"

একবার ভেবে নিয়ে বলতে শুরু করি, "ফ্রেজারগঞ্জ একটি দ্বীপ। ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার দক্ষিণতম প্রান্তে সাগরতীরে অবস্থিত। আগের নাম ম্যাক্লেনবারগ্ আয়ল্যাণ্ড। স্থানীয় নাম নারায়ণতলা। ১৯০৩ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের লেফ্‌টান্যাণ্ট গভর্নর ছিলেন স্যার এনড্রু ফ্রেজার। এই রমণীয় স্থানটি দর্শন করে তিনি একে কলকাতাবাসীদের জন্য একটি স্বাস্থ্যাবাস হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁরই আন্তরিক প্রচেষ্টায় জায়গাটা একটি জনপ্রিয় জনপদে পরিণত হয়। ফ্রেজার সাহেবের নামানুসারে দ্বীপের নতুন নাম হল ফ্রেজারগঞ্জ। সেই নামেই সে আজ সর্বত্র পরিচিত।

"ফ্রেজার সাহেব জনহীন দ্বীপটিকে জঙ্গলমুক্ত করে জনপদে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু অতীতে এ দ্বীপটি জনহীন ছিল না। জঙ্গল পরিষ্কার করার সময় দুটি বিরাট তেঁতুল ও মনসা গাছের কাছে কয়েকটি ভাঙা বাড়ি পাওয়া গিয়েছিল। তাই মনে হয়, অতীতে সেখানে মানুষ বাস করতেন। পরে সম্ভবত পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের অত্যাচারে দ্বীপটি জনহীন হয়ে পড়েছিল।

"একটি সর্বভারতীয় সৈকতাবাস হিসেবে গড়ে ওঠার সকল যোগ্যতাই ফ্রেজারগঞ্জের আছে। কলকাতা থেকে দূরত্ব ৮০ মাইল। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফ্রেজারগঞ্জের উপকণ্ঠে ঝাউগাছে ছাওয়া বকখালিতে গড়ে তুলেছেন পর্যটন-কেন্দ্র। কলকাতা থেকে নিয়মিত বাস যাতায়াত করছে।"

"আচ্ছা গোসাঁই!" আমি থামতেই শ্যামা বলে, "সাগর থেকে ফেরার সময় ফ্রেজারগঞ্জ হয়ে যাওয়া যায় না?"

"যাবে না কেন? মেলা থেকে ছয়েরঘেড়ি ও চেমাগুড়ি হয়ে নামখানা যেতে হবে, সেখান থেকে বাসে বকখালি।"

"তুমি আমাকে একটু নিয়ে যাবে?" শ্যামার স্বরে অনুরোধ।

"আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আপনি যেতে পারবেন কি?"

"কেন পারব না? তুমি নিয়ে গেলে ঠিক পারব।"

"বাবাজীকে কি করবেন? তিনি তো অত ধকল সইতে পারবেন না?"

শ্যামার উজ্জ্বল মুখখানি সহসা নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে। মুহূর্তে তার সব উৎসাহ উবে যায়। সকল উচ্ছ্বাসের অবসান হয়। সে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপরে ক্ষীণস্বরে বলে, "তুমি ঠিকই বলেছ গোসাঁই, আমি পারব না যেতে। আমার যে হাত-পা বাঁধা।"

"কেন পারবেন না?" আমি বলি, "এমন একটা দূরের পথ নয়। নিয়মিত বাস যাচ্ছে। বাবাজী ভাল হলে, পরে একসময় গিয়ে ঘুরে আসবেন।"

শ্যামা একটু হাসে। বলে, "আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছ?"

"না, সত্যি কথাই বলছি।"

"কিন্তু তুমি নিজেও জান যে কথাটা সত্যি নয়। তোমার বাবাজী আর কোনদিন ভাল হবেন না।"

নির্মম সত্যকে অস্বীকার করি কেমন করে? তাই চুপ করে থাকি।

শ্যামা আবার হাসে। তেমনি অসহায় হাসি। তারপরে স্বাভাবিক স্বরে বলে ওঠে, "আচ্ছা গোসাঁই, আমরা যে পথে সাগরে চলেছি, চাঁদ সদাগরের সময় নাকি মানুষ সে পথে সাগরে যেতো না? মহাপ্রভুও এ পথে পুরী যান নি?"

"হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। তখন আদিগঙ্গাই ছিল গঙ্গার প্রধান প্রবাহ।"

"তার মানে কালীঘাটের গঙ্গাই ছিল বড়গঙ্গা!"

"হ্যাঁ।"

"একটু বল না, সেই গঙ্গার কথা।"

"একালের গঙ্গা ও সেকালের গঙ্গা এক নয়। সেকালের গঙ্গার মূল গতিপথ ছিল আদিগঙ্গা বা ট্যালিস নালা দিয়ে।"

"আচ্ছা আদিগঙ্গাকে 'টালি-নালা' বলা হয় কেন, টালিগঞ্জ দিয়ে বয়ে গেছে বলে কি?"

"না।" আমি উত্তর দিই, "বরং ঐ একই কারণে টালিগঞ্জ নামটি হয়েছে।"

"কারণটা কি?"

"অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে মেজর ট্যালিস নামে একজন সাহেব টালির

ব্যবসা করতেন। ঐ অঞ্চলে তাঁর টালির আড়ত ছিল বলে টালিগঞ্জ নামটি হয়েছে। ১৭৮৫ সালে তিনি ব্যবসার প্রয়োজনে একটি খাল কেটে আদি-গঙ্গাকে বিদ্যাধরীর সঙ্গে যুক্ত করে দেন। ফলে আদিগঙ্গা একেবারেই মজে যায়। স্থানীয়রা বাঁধ দিয়ে কোথাও বা ধানচাষ করেন, কোথাও বা পুকুরের সৃষ্টি করেন। এখনও বাসে গড়িয়া থেকে জয়নগর যাবার সময় পথের পাশে সারি সারি পুকুর দেখতে পাওয়া যায়। আজও তাদের নামের সঙ্গে গঙ্গা যুক্ত হয়ে আছে। যেমন 'মিত্তিরদের গঙ্গা', 'বোসদের গঙ্গা', 'ঘোষদের গঙ্গা' ইত্যাদি। এগুলি সবই আদিগঙ্গার অংশ। বহু প্রাচীন গ্রাম এই অঞ্চলে অবস্থিত, যেমন বোড়াল রাজপুর হরিনাভি বারুইপুর ও জয়নগর-মজিলপুর ইত্যাদি। এই সব গ্রামে মাটি খুঁড়ে দু'হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।"

"ট্যালিস সাহেবের সেই খাল কাটার জন্যই কি আদিগঙ্গা বুজে গেল?"

"না।" আমি বলি, "কারণ তৎকালীন বাংলাদেশের সার্ভেয়ার জেনারেল জেম্স রেনেল ১৭৬৫ থেকে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অঙ্কিত তাঁর বিখ্যাত মানচিত্রে আদিগঙ্গার উল্লেখ করেন নি। মনে হয় তার আগেই আদিগঙ্গা মজে গিয়েছিল। শোনা যায় নবাব আলিবর্দী খাঁ সরস্বতী নদীকে বাঁচিয়ে তুলবার আশায় গঙ্গায় একটি খাল কেটে সরস্বতীর সঙ্গে যুক্ত করার পর থেকেই আদিগঙ্গার প্রবাহ কমে আসতে থাকে। ট্যালিস সাহেব খাল কাটার পরে প্রবাহ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।"

আমি থামতেই শ্যামা বলে ওঠে, "ঠিকই বলেছো, শ্রীমদবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতে পড়েছি শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলচন্দ্রকে দর্শন করবার জন্য শান্তিপুরের আচার্যগৃহ থেকে পুরীধামে যাত্রা করেন। তিনি আদিগঙ্গার তীর ধরে বারুইপুরে আসেন। তখন বারুইপুরকে বলা হত আটিসারা। তিনি সেখানে শ্রীঅনন্ত নামে জনৈক ভাগ্যবান ভক্তের বাড়িতে সারারাত কীর্তন করেন। জায়গাটির বর্তমান নাম কীর্তনখোলা। সেই পুণ্যতিথিটি ছিল ১৫১০ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমা। সেই থেকে প্রতি দোল-পূর্ণিমায় অনন্তের শ্রীপাটে উৎসব হয়ে আসছে।

"শ্রীমন্মহাপ্রভু তারপরে মথুরাপুর পার হয়ে চক্রতীর্থে আসেন। সেখানকার শাসক শ্রীরামচন্দ্র খাঁ তাঁকে পুরীধামে যাবার জন্য নৌকো ঠিক করে দেন।"

শ্যামা আবার থামে। আমি তার দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকি। শ্যামা

চোখ নামিয়ে নেয়। স্বর করে শুরু করে—

"হেনই সময়ে কহে রামচন্দ্র খান।
'নৌকা আসি ঘাটে প্রভু! হৈল বিদ্যমান॥'
সেইক্ষণে 'হরি' বলি শ্রীগৌরসুন্দর।
উঠিলেন গিয়া প্রভু নৌকার উপর॥
শুভদৃষ্ট্যে লোকেরে বিদায় দিয়া ঘরে।
চলিলেন প্রভু নীলাচল—নিজপুরে॥"

শ্যামা থামলে জিজ্ঞেস করি, "শ্রীচৈতন্যভাগবতে এ অঞ্চলের কোন বর্ণনা আছে কি?"

"আছে।" শ্যামা উত্তর দেয়, জিজ্ঞেস করে, "শুনবে?"

"হ্যাঁ।"

শ্যামা তেমনি স্বর করে শুরু করে—

"কূলে উঠিলে সে বাঘে লইয়া পলায়।
জলে পড়িলে সে বোল কুম্ভীরেই খায়॥
নিরন্তর এ পানীতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন প্রাণ দুই নাশ করে॥"

শ্যামা একটু থামে। তারপরে আবার বলে, "কিন্তু ভক্তবৃন্দ ভয় পেয়েছেন দেখে প্রভু হুঙ্কার দিয়ে তাঁদের কি বললেন জান?"

"কি?"

"বললেন— 'কেন ভয় কর' কার।
এই না সম্মুখে সুদর্শনচক্র ফিরে।
বৈষ্ণবজনের নিরবধি বিঘ্ন হরে'॥
কিছু চিন্তা নাহি, কর কৃষ্ণসঙ্কীর্তন।
তোরা কি না দেখ-হের ফিরে সুদর্শন॥"

"আপনি দেখছি, শ্রীচৈতন্যভাগবৎ খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন।"

"সবই ওঁর কৃপায়।" শ্যামা ইশারায় বৃদ্ধ বৈষ্ণবকে দেখায়। বলে, "ওঁর কাছে পড়তে বসলে যে মন না দিয়ে রক্ষে নেই। অন্যমনস্ক হলে, হাতের কাছে যা পাবেন তাই ছুঁড়ে মারবেন। যাক্ গে সে কথা, তুমি আদিগঙ্গার কথা বল।"

"কি বলব? আপনি যে অনেক জানেন।"

"বাজে বকবক না করে যা জান বলে ফেল তো।"

বাধ্য হয়ে বলতে থাকি, "কাকদ্বীপের একটু আগে আদিগঙ্গা এসে গঙ্গায় মিশত। তারপরে কিছুটা একসঙ্গে দক্ষিণে এসে সাগরদ্বীপের পূব দিয়ে প্রবাহিত হত। সেই প্রবাহই এই মুড়িগঙ্গা। তবে তখনকার দিনে এই নদী থেকে আবার একটি ধারা বেরিয়ে পূর্ববাহিনী হয়ে বিদ্যাধরীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল—তাকেও আদিগঙ্গা বলা হত।

"আদিগঙ্গা তখন সুপ্রশস্ত ও সুগভীর নদী ছিল বলে বড় বড় বাণিজ্যতরী আদিগঙ্গা দিয়েই যাতায়াত করত। ফলে বারুইপুরের কাছে আটঘরা একটি বড় বন্দরে পরিণত হয়েছিল।"

"শুনেছি রাজপুরের কাছেও নাকি একটা বন্দর ছিল?"

"হ্যাঁ। এখন বলে 'বড়দার খোল', সেকালে বলত, 'বড়দহ'। বছর পঁচিশেক আগেও সেখানে একটা বিরাট বটগাছের সঙ্গে জাহাজ বাঁধার প্রকাণ্ড একটা লোহার শেকল বাঁধা ছিল।"

"এখন নেই কেন?"

"বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় সরকার থেকে গাছ কেটে শেকলটা খুলে আনা হয়েছে।"

"আচ্ছা নেতাজীর পৈতৃক গ্রাম কোদালিয়া মানে এখনকার সুভাষগ্রামও নাকি আদিগঙ্গার তীরে অবস্থিত ছিল?"

"নেতাজীর পূর্বপুরুষ গোপীনাথ বসু ছিলেন গৌড়ের নবাব হুশেন শাহ-র নৌসেনাপতি। তিনি গৌড় থেকে যুদ্ধজাহাজে চড়ে বারুইপুর হয়ে কোদালিয়ায় আসা-যাওয়া করতেন। বারুইপুর তখনও বড় বন্দর।"

"কতদিন আগে গঙ্গার মূলধারা আদিগঙ্গা দিয়ে প্রবাহিত হত?" শ্যামা আবার প্রশ্ন করে।

"অন্তত ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তার মানে হাজারখানেক বছর আগে আদিগঙ্গা দিয়েই গঙ্গার অধিকাংশ জল সাগরে গিয়ে পড়ত। তখন আদিগঙ্গাই ছিল গঙ্গার প্রধান ধারা।"

"বলি ও ভালোমানুষের ব্যাটা, বলি কানের মাথা খেয়ে কি গপ্পে বসেছিস?"

কণ্ঠস্বরটা কানে আসতেই চমকে উঠি। নৌকোর ভেতরে তাকাই। হ্যাঁ, যা ভেবেছি, দি'মাই বলছেন। আর বলছেন আমাকে। তাড়াতাড়ি উঠে

দাঁড়াই। ভেতরে আসি। নিঃশব্দে দি'মার পাশটিতে এসে বসি। শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করি, "কি, ডাকছিলে কেন ?"

"আমার শ্রাদ্ধ করতে।"

"তার এখনও দেরি আছে।"

"তা আর বলবি না ! নইলে শত্তুর বলি কেন ?"

"আমি তোমার শত্তুর ?"

"তাছাড়া আর কি ? শত্তুর না হলে কেউ এমন ভোগায় ? সেই কখন মুখ ধুতে গেলি আর এতক্ষণে ফিরে আসা হল ! আমি যে তখন থেকে খাবার নিয়ে বসে আছি, সে খেয়াল আছে ?"

"খাবার ! খাবার তো ওপারে মানে কচুবেড়িয়ায় গিয়ে খাব ভেবেছি। ওখানে চা পাওয়া যাবে।"

"সে যখন পাওয়া যাবে, তখন দেখা যাবে। ওপারের অনেক দেরি। এখন তো মুড়িচারটে খেয়ে নে।" দি'মা চারটে নারকোলের নাড়ু ও ছুটি রসগোল্লাসহ একথালা মুড়ি আমার সামনে রাখেন।

"আবার মুড়ি !" আমি আঁতকে উঠি।

"তা তোর জন্যে পোলাও-কালিয়া এখেনে আমি কোথায় পাব ? আর কথা না বাড়িয়ে মুড়ি কটা খেয়ে নে দেখি ! কাল রাতে ভাল খাওয়া হয় নি, অনেক বেলা হল, পিত্তি পড়ে যাবে।"

কোনটাই সত্যি নয়। কিন্তু সে-কথা বলে লাভ নেই। কেবল বলি, "আমি এতগুলো খেতে পারব না।"

"খুব পারবি। চেষ্টা করেই দেখ্ না। আচ্ছা কমিয়ে দিচ্ছি।" দি'মা মুঠো ছুয়েক মুড়ি টিনে রেখে দিয়ে থালাখানা আমার হাতে দিয়ে বলেন, "নে, খেয়ে নে।"

প্রতিবাদ করা নিরর্থক। কিন্তু আমি এতগুলো মুড়ি খাব কেমন করে ? কালকের দাঁত-ব্যথা যে এখনও কমে নি। কাল রাতে তবু শেষদিকে শ্যামা সাহায্য করেছিল, কিন্তু আজ এই প্রকাশ্য দিবালোকে তার পক্ষেও কিছু করা সম্ভব নয়।

শ্যামা গলুই থেকে ভেতর আসে। দি'মা ও বাবাজীর মাঝে এসে বসে। বাবাজী সকাল থেকেই অজ্ঞানের মত পড়ে আছেন।

শ্যামা আমাদের দিকে ঘুরে বসে। হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে, "দি'মা

বুঝি নাতিকে খাওয়াবার জন্য সাধ্য-সাধনা করছেন ?''

''আর বলিস কেন ? যতবার খেতে দেব, ততবার এমনি করবে। ধন্যি মা-বাপ, কোন্ ভরসায় তারা এমন ছেলেকে একা একা পাঠায় !''

"তারা জানতেন, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।" আমি হেসে বলি।

শ্যামাও হেসে দেয়।

দি'মা রেগে বলেন, "কথা অনেক হয়েছে। এবারে খেয়ে নে তো।''

''হ্যাঁ হ্যাঁ, খেয়ে নাও গোসাঁই। সাধালক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না। দেখছ না, আমাদের অবস্থা। সারাজীবন না খেয়ে থাকলেও কেউ খেতে বলবে না।''

"তুই খাবি নাকি ?'' দি'মা তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন।

"দিলে খাব বৈকি, বড্ড খিদে পেয়েছে।''

আর সময় নষ্ট করা সমীচীন নয়। তাড়াতাড়ি শ্যামার দিকে থালাখানি এগিয়ে ধরে বলি, "নিন না এখান থেকে, আমি এত খেতে পারব না।"

"আহা, তোর থেকে আবার দিচ্ছিস কেন ? এই তো মুড়ি রয়েছে।" দি'মা প্রায় চীৎকার করে ওঠেন। তিনি মুড়ির টিনের দিকে হাত বাড়ান।

আমি তাঁর হাতখানি ধরে ফেলি, সবিনয়ে বলি, "সত্যি বলছি দি'মা আমি এতগুলি খেতে পারব না।"

আর শ্যামা ? সে ইতিমধ্যে তার কাজ সেরে ফেলেছে। আমার থালা থেকে প্রায় অর্ধেকটা মুড়ি নিজের আঁচলে ঢেলে নিয়েছে।

অসহায়া দি'মা চারটি নাড়ু তার হাতে দিয়ে বললেন, "খেয়ে নে। সেই সকাল থেকে তোরা না খেয়ে রয়েছিস।"

"তুমিও তো কিছু খাও নি দি'মা।" আমি খেতে শুরু করি।

"ওরে বোকা ছেলে, আমাদের কি সন্ধ্যাহ্নিক শেষ না করে জল মুখে দিতে আছে ?"

"তা সে-সব কখন শেষ হবে ?"

"ওপারে গিয়ে নৌকো বাঁধলেই আহ্নিকে বসব। তারপরে যা হোক কিছু মুখে দেব।"

"ওপারের যে এখনও অনেক দেরি।"

"না, না, অনেক দেরি হবে কেন ? ঐ তো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।"

"সে তো তখনও দেখা যাচ্ছিল।"

"কখন ?"

"যখন আমাকে খেতে দিয়েছিলে।"

"নাঃ, তোর সঙ্গে আর বক্‌বক্‌ করতে পারি নে বাপু!" দি'মা বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। বুঝলাম তিনি প্রসঙ্গটার ওপরে যবনিকা টেনে দেবার জন্য এই অভিনয়টুকু করছেন।

বাতাস উজানে বইছে বলে পাল খুলে ফেলতে হয়েছে। দাঁড় বেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে নৌকো। কচুবেড়িয়া ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। ঘোড়ামারা, খাসিমারা আবার দূরে চলে গেছে। লোহাচড়াকে তো দেখাই যাচ্ছে না। সে সাগরদ্বীপের আড়ালে চলে গেছে। যাক্‌ গে। আমরা চলেছি সাগরে। সাগর ছাড়া আর কিছুই চাই না দেখতে।

কচুবেড়িয়াকে এখান থেকে বড় ভাল লাগছে। লাগবেই তো, সে যে সাগরদ্বীপের প্রবেশ তোরণ। তবে জানি না ওখানে গিয়ে পৌঁছলে, আমার এ মনোভাব স্থায়ী হবে কিনা? কারণ ওখানে দোকানে দোকানে মাইক বাজছে। সেই অসহনীয় শব্দলহরীর সামান্য যা এখানে এসে পৌঁছচ্ছে, তাতেই ওখানকার অবস্থা উপলব্ধি করতে পারছি।

কিন্তু কচুবেড়িয়া এখনও কিছু দূরে। কাছের মানুষকে না দেখে দূরের বন্দরকে দেখা উচিত হচ্ছে না। তাই নৌকোর ভেতরে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনি। সেই একই দৃশ্য—প্রায় সকলেই ঝোলাঝুলি খুলে খাবার বের করেছেন। কেউ খেতে শুরু করেছেন, কেউ বা শুরু করার চেষ্টায় আছেন। তবে কেউই শব্দহীন নন। প্রত্যেকেই কিছু একটা বলছেন অথবা শুনছেন।

সহসা কানে আসে, "এই ছোঁড়ার অত রস!"

"তাহলে আর বলছি কি? আরে কাল রাতে আমি নিজে দেখেছি, কাকদ্বীপের পথে-ঘাটে ঐ বোষ্টমীটার সঙ্গে ঢলাঢলি করছে।"

"তাই বল! নইলে আজ সারা সকাল গলুইতে বসে এত কথা কিসের?"

আমার কান দুটো গরম হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমি নিরুপায়। জগতের সব অপবাদের প্রতিবাদ করা যায় না। তাই চুপ করে বসে মুড়ি চিবুতে থাকি। কেবলই ভয় হচ্ছে—ওদের কথা দি'মার কানে না যায়। তিনি তাঁর নাতির বিরুদ্ধে এ অপবাদ বরদাস্ত করবেন না। একটা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি করবেন। ভাগ্যিস তিনি কানে একটু খাটো!

কিন্তু শ্যামা? সেও কি শুনছে না বৃদ্ধাদের আলোচনা? তাকে দেখে তো মনে হচ্ছে না, সে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধা কিংবা বিচলিতা। সে সমানে মুড়ি

চিবিয়ে চলেছে। যেন সংসারে মুড়ি-চর্বণের চেয়ে বড় কর্তব্য আর কিছু নেই।

বৃদ্ধাদের কথা কানে আসছে। ওঁরা বলছেন, "আচ্ছা বোষ্টমীটাই বা কি ? বুড়ো বোষ্টমকে নিয়ে তীর্থে চলেছিস কোথায় তাঁর একটু সেবা-শুশ্রূষা করবি তা নয়, তুই কিনা বয়সে ছোট একটা ছোঁড়ার সঙ্গে পীরিত করছিস !"

সহসা শ্যামা কথা বলে ওঠে। সেই বৃদ্ধাদের জিজ্ঞেস করে, "মাসি, একটা গান ধরব ?"

বৃদ্ধারা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। তাঁরা এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কোনমতে উত্তর দেন, "গান ! সে তো ভাল কথা।"

"কিন্তু গানটা তোমাদের পছন্দ হবে কি ?" শ্যামা জিজ্ঞেস করে।

"কি গান ?"

শ্যামা সুর করে বলে ওঠে, "পীরিতিতে মজলে মন, বয়সে কিবা এসে যায়…"

শ্যামা থামে। আমার দিকে একবার তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে বৃদ্ধাদের বলে, "কেমন গান বল তো মাসি ?"

"মন্দ কি !" জনৈকা বৃদ্ধা উত্তর দেন।

"হ্যাঁ, ভালই তো।" আর একজনও তাঁকে সমর্থন করেন।

"তাহলে ওকথা বলেছিলে কেন ?" তীক্ষ্ণ স্বরে শ্যামা প্রশ্ন করে।

"কি কথা !" বৃদ্ধারা একযোগে বলে ওঠেন। তাঁরা যেন আকাশ থেকে পড়েন।

"ভান করছ কেন ? তোমাদের সব কথা আমি শুনেছি। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আর সে-কথাটা জানো না—'যার ভাতার তার ভাতার, কেঁদে মরে হরে ছুতার।' তাই বলছি, অন্যের ভাবনা না ভেবে নিজেদের ভাবনা ভাবো। মনটাকে একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করো—তীর্থে চলেছ !"

বৃদ্ধারা শ্যামার উক্তি নীরবে হজম করেন। তাঁরা মুড়িগঙ্গার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। গঙ্গাজলে মনটাকে ধুয়ে ফেলছেন কি ?

দি'মা উঠে বসেছেন। আমি প্রমাদ গণি। ওঁদের আলোচনা এবং শ্যামার উক্তি নিশ্চয়ই তাঁর কানে গেছে। এবারে না জানি তিনি কি বলে বসবেন ! নৌকোটাও ছাই বড্ড আস্তে আস্তে চলেছে। কচুবেড়িয়ায় পৌঁছে গেলেই দি'মা আহ্নিকে বসবেন।

আমার অনুমান কিন্তু সত্য হয় না। দি'মা অন্য কথা বলেন, "হ্যাঁ রে,

একটা সত্যি কথা বলবি ?''

"তোমাকে মিথ্যে বলব ? দি'মা তুমি এত পর ভাব আমাকে ?"

দি'মা বিপদে পড়েন। কোনমতে বলেন, "ওরে পাগল ছেলে, পর ভাবলে কি আর এত মানুষ থাকতে তোকে কথাটা জিজ্ঞেস করছি ?''

"কী কথা ?"

"তুই কেন সাগরে যাচ্ছিস ?"

আবার সেই প্রশ্ন।—"এমনি।" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিই।

"যাবার কি আর কোন চুলো ছিল না ?"

"ছিল। কিন্তু সে-সব চুলোয় গেলে যে তোমাকে পেতাম না দি'মা "

"বলিস না, ওরে অমন করে বলিস না।" দি'মার চোখ দুটি মুহূর্তে অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। তিনি আঁচলে চোখ মুছে বিকৃত কণ্ঠে বলেন, ''তোরা তো কাছে থাকার মানুষ নয় রে। পরে আমার বড় কষ্ট হয়।"

শ্যামা এতক্ষণ চুপ করে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। কথার থমথমে ভাবটা বোধ করি ভাল লাগে না তার। তাই আবহাওয়াটাকে হাল্কা করে তুলবার জন্য মাঝখান থেকে বলে ওঠে, "তুমি বুঝি শুধু দি'মার জন্যই সাগর-মেলায় চলেছো গোসাঁই ?''

"তুই বড্ড হিংসুটে !'' দি'মা কৃত্রিম গম্ভীর স্বরে শ্যামাকে বলেন।

শ্যামা হাসে। দি'মা গম্ভীর থাকতে পারেন না, তিনিও হেসে ফেলেন।

আমি বলি, "কেবল দি'মার জন্য আসব কেন ? আপনাদের সবার জন্যই এসেছি। সবার সঙ্গে মিলন হবে বলেই তো মেলায় আসা।''

"ঠিকই বলেছিস বাবা।'' দি'মা যোগ করেন, "মিলন নিয়েই মেলা আর মেলার সেরা সাগরমেলা—সব তীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর একবার।"

খনখনে কাশির শব্দে শ্যামা চমকে ওঠে। আমাদের কথা যায় থেমে। শ্যামা তাড়াতাড়ি বাবাজীর দিকে ঘুরে বসে, কাছে এগোয়, তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

বাবাজী কাশছেন—ভীষণভাবে কাশছেন। কাশির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুকটা দুলে উঠছে। তাঁর যেন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

কাল থেকেই নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন। কাল রাতে তো বটেই, আজ সকালেও সাড়াশব্দ পাই নি। ভেবেছি ঘুমোচ্ছেন তিনি—ঘুমালে ভালই হবে, সহজে সুস্থ হয়ে উঠবেন।

এখন দেখছি, তিনি আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কাল রাতেও তাঁর কাশি শুনেছি। কিন্তু সে কাশি যেন এত খারাপ ছিল না। এ তো কাশি নয়, এ যেন জীবনীশক্তিটুকু জীইয়ে রাখার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। থেকে-থেকেই কেশে উঠছেন। কাশি থামলেই গোঙানি শুরু হচ্ছে। খুব বেশি ছটফট করছেন। কিন্তু কোন কথা বলছেন না।

শ্যামাও যেন একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছে। অনন্ত কাল রাতের মত নিরুদ্বিগ্ন নয় সে। তার হাত কাঁপছে। সে কাঁপা গলায় বাবাজীকে জিজ্ঞেস করে, "খুব কষ্ট হচ্ছে কি?"

বাবাজী বোধ হয় উত্তর দেবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। তিনি তাঁর দুর্বল একখানি হাত নেড়ে কি যেন বোঝাতে চাইছেন। তাঁর দু-চোখের কোল বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। শ্যামা তার কথা বুঝতে পারছে কি?

শ্যামা নিজের আঁচল দিয়ে তাঁর চোখ মুছিয়ে দেয়। তারপরে নিজের চোখ দুটি মুছে এগিয়ে যায় মালপত্রের কাছে। ঝোলা থেকে একটা কালো বোতল বের করে। ছিপি খুলে খানিকটা রঙ্গীন পদার্থ কাচের গ্লাসে ঢালে। অনেক কষ্টে তার একটু বৈষ্ণবের মুখে দেয়। কিন্তু বৃথা। ওষুধ তাঁর গলায় যায় না, গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। তাঁর দু চোখের কোল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসছে। অসহায় দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন। কিছু বলতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন না। আর তাই অক্ষম বাবাজীর এই নীরব কান্না। সংসারে সবাইকেই একদিন এই কান্না কাঁদতে হয়। সে সব বুঝতে পারে, দেখতে পারে, শুনতে পারে কিন্তু কিছুই বলতে পারে না। তার সেই না-বলা কথা কেউ কখনও জানতে পারে না।

শ্যামাও পারে না জানতে। বাবাজী কি বলতে চাইছেন, বুঝতে পারছে না সে। তাই তার চোখ দুটিও সজল হয়ে উঠেছে। সে কেবল অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাবাজীর দিকে।

আমরাও অসহায়। কি সাহায্য আমরা করতে পারি তাঁকে? নীরব সহানুভূতি জানানো ছাড়া আর কোন সাধ্য নেই আমাদের। তাঁর কষ্টে কষ্ট পাচ্ছি কিন্তু সে কষ্টের কোন উপশম করতে পারছি না।

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই। খেয়াল হতে দেখি, বাবাজীর কাশিটা যেন একটু কমেছে। হ্যাঁ কমেছে বৈকি, নিশ্চয়ই কমেছে। কিন্তু গোঙানিটা

বেড়েছে। সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে শ্বাসকষ্ট। বেশ কিছুক্ষণ বাদে বাদে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন তিনি। প্রতিবার শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সারা শরীর দুলে উঠছে। মনে হচ্ছে এইবার বুঝি প্রাণটুকু বেরিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ বাদে গোঙানিটা কমে এলো। শরীরের দোলানিটাও স্তিমিত হল। তিনি চোখ বুঝলেন—শান্ত হলেন। আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেন কি?

একটু বাদে শ্যামা আমাদের দিকে ঘুরে বসে। মৃদু হেসে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে। আমরাও আশ্বস্ত হই। তাহলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই।

শ্যামা বলে, "আপনাদের সবাইকে কষ্ট দিলাম।"

"না না, কষ্ট কিসের?" অনেকেই প্রতিবাদ করে ওঠেন।

বাবাজীকে দেখিয়ে দি'মা বলেন, "কষ্ট তো পাচ্ছেন উনি!"

"এই যে এতক্ষণ উৎকণ্ঠায় কাটালেন, এ কি কম কষ্টের?" শ্যামা বলে।

"কিন্তু যাঁর জন্য আমরা এতক্ষণ কষ্ট পেলাম, তাঁর কষ্ট কিছু কমল কি?" আমি জিজ্ঞেস করি।

শ্যামা উত্তর দেয়, "তিনি এখন দুঃখ-কষ্টের ওপরে।"

"মানে?"

"না, না, ভয় নেই, মারা যান নি।" শ্যামা আশ্বাস দেয়। বলে, "এখন উনি এমনি মড়ার মতো পড়ে থাকবেন কয়েক ঘণ্টা। তারপরে উঠে বসবেন। একেবারে ভাল হয়ে যাবেন। কিছুদিন খাবেন-দাবেন, হেঁটে-চলে বেড়াবেন। খুব ভাল থাকবেন। একদিন হঠাৎ কাশি দেখা দেবে—আবার অসুস্থ হয়ে পড়বেন। কয়েক বছর থেকে এইভাবে চলে আসছে।" একবার থামে শ্যামা। আরেকটি স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলে, "মনে হচ্ছে মেলাটা কেটে যাবে ভাল ভাবে। সুস্থ শরীরে স্নান ও দর্শন করতে পারবেন। মা-গঙ্গা অসীম করুণাময়ী।"

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সহযাত্রী বলে ওঠেন, "গঙ্গা মাঈকি......"

"জয়।" যাত্রীরা সমস্বরে জয়ধ্বনি করে ওঠেন। কচুবেড়িয়া প্রায় এসে গেল। একটু বাদেই আমরা সাগরদ্বীপের মাটি স্পর্শ করব।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি। শ্যামাও নির্বাক।

নীরবতার অবসান করতে একসময় শ্যামাকে বলি, "এমন মুমূর্ষু মানুষকে নিয়ে সাগরে এলেন কেন?"

"আসা দরকার বলে।" শ্যামা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

উত্তরটা পছন্দ হয় না আমার। বিরক্ত স্বরে বলি, "কিসের দরকার?"

"জীবনের। প্রতি ধর্মপ্রাণ মানুষকে একবার আসতেই হয় গঙ্গাসাগরে।"

"না এলে কি হয়?" তিক্তকণ্ঠে প্রশ্ন করি।

"পাপ হয়।"

এর পরে আর কি বলব? তর্ক করে মানুষের বিশ্বাস বদলে দেওয়া সম্ভব নয়। তবু বলি, "আপনি কি বলতে চান, যাঁরা গঙ্গাসাগর আসেন না, তাঁরা সবাই পাপী!"

"আমি নয়, উনি বলেন।" শ্যামা দেখিয়ে দেয় বাবাজীকে। বলে, "তাই বহুকাল থেকেই ওনার সাগরে আসার ইচ্ছে, কিন্তু প্রতিবার একটা না একটা বাধা এসে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়াবেই তো, তীর্থ ডাক না দিলে যে তীর্থে আসা যায় না। তাই এবার যখন সময় ও সুযোগ হল, আমাকে বললেন—চল্ গঙ্গাসাগর যাই। বললাম আপনার শরীর ভাল নয়, এ বছরটা থাক্। উনি বললেন—আমার শরীর কি কোনদিন আর ভাল হবে যে আগামী বছরের জন্য সাগরযাত্রা স্থগিত রাখবি? মন বলছে, এবার না গেলে এ জীবনে আর গঙ্গাসাগর যাওয়া হবে না আমার। তাই বলছি, চল্ এবারেই যাওয়া যাক্। আর অযথা চিন্তা করছিস কেন, একদিন তো চলে যেতেই হবে। সাগরের পথে কিম্বা সাগরে গিয়ে যদি আত্মা দেহমুক্ত হয়, তাহলে তার চেয়ে বড় পুণ্যের আর কি থাকতে পারে? সেকালে মানুষ দেহরক্ষার জন্য সাগরে যাত্রা করতেন, আমি না-হয় সাগরযাত্রার জন্যই দেহরক্ষা করলাম।" শ্যামা এবার থামে। একসঙ্গে অনেক কথা বলেছে সে। সে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করছে কি?

একটু বাদে সে আবার বলে, "এর পরে আমি তাঁকে কেমন করে বাধা দিই বল? তাই ওনাকে নিয়ে রওনা হলাম সাগরে। ভাবলাম, এই ভাল হল। সব তীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর একবার।"

সেই একই কথা, যে কারণে ভুজাওয়ালা এসেছে, দি'মা এসেছেন, আমার সহযাত্রীরা সবাই এসেছেন, সেই একই কারণে শ্যামা অসুস্থ অশক্ত অশীতিপর স্বামীকে নিয়ে সাগরে চলেছে। আর চুপ করে থাকতে পারি না। বলি "আশ্চর্য আপনাদের পুণ্যাকাঙ্ক্ষা!"

"এতেই আশ্চর্য হলে!" শ্যামাও যেন আশ্চর্য হয়। বলে, "পুণ্যের চেয়ে

যে বড় লোভ আর নেই এ জগতে। পুণ্যলোভেই কাপালিক নিরপরাধ নবকুমারকে বলি দিতে চেয়েছিল, পুণ্যলোভাতুর সহযাত্রীরাই মোক্ষদার নিরপরাধ পুত্র রাখালকে জলে ফেলে দিয়েছিল। পুণ্যের প্রয়োজনে জগতে যত পাপ হয়েছে, অত পাপ আর কিছুতে হয় নি।"

কথাটা মিথ্যে নয়। তবু শ্যামার যুক্তি মেনে নিতে মন চায় না। তাই চুপ করে থাকি। শ্যামাও আর বলছে না কিছু। সে চুপ করে বসে আছে। কি যেন ভাবছে।

কি ভাবছে শ্যামা? নিজের কথা? পুণ্যলোভী স্বামীর কথা? অথবা দুজনের কথা?

॥ আট ॥

বুড়ো মাঝির চীৎকারে আমার ভাবনা যায় হারিয়ে। সে বলছে, "আমরা কচুবেড়িয়ায় এসে গেছি। জেটি ছাড়িয়ে ঐ বড় গাছটার কাছে নৌকা বাঁধব। চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় পাবেন। আপনারা স্নান-খাওয়া সেয়ে নিন। ভাঁটা হলেই নৌকো ছাড়ব।"

সারা নৌকোয় সাড়া পড়ে যায়। সবাই উঠে বসেন। পোঁটলা-পুঁটলি খুলে চাল-ডাল ও বাসনপত্র বের করতে থাকেন। কেবল শ্যামা বসে আছে চুপ করে। সে তেমনি অপলক নয়নে জ্ঞানহীন স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার তীরে নামার ব্যস্ততা নেই, রান্না-খাওয়ার তাগিদ নেই।

নৌকো ভিড়ল। মাল্লারা একখানি তক্তা ফেলে সিঁড়ি বানিয়ে দিল। যাত্রীরা হৈ-হৈ করে নামতে শুরু করেন। নেমে গেলেন সবাই। কেবল রয়ে গেলাম আমরা। আমি দি'মা বাবাজী ও শ্যামা। আর বাবাজী তেমনি অজ্ঞানের মতো পড়ে আছেন। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত কানে আসছে না।

দি'মা শ্যামাকে জিজ্ঞেস করেন, "তুই রান্না-খাওয়া করবি নে?"

"না, এখন আর ও-সব হাঙ্গামা করতে ভাল লাগছে না।"

"তাহলে কি না খেয়ে থাকবি?"

"এই তো মুড়ি খেলাম, পরে খিদে পেলে কিছু খেয়ে নেব।"

"না, তা হয় না" দি'মা বলেন।

"কিন্তু আমার যে এখন ও-সব হাঙ্গামা করতে ইচ্ছে করছে না দি'মা।"

"অনিচ্ছাতেই করতে হবে। নিজের শরীরটাকে সুস্থ না রাখলে অসুস্থ স্বামীর সেবা করবি কেমন করে? চাল-ডাল, তরিতরকারি, বাসনপত্র সব আছে। বের করে দিচ্ছি। নাতি সঙ্গে যাচ্ছে। চটপট খিচুড়ি আলুভাজা রেঁধে দুজনে খেয়ে আয়। বাবাজীর জন্য চিন্তার কিছু নেই, আমি রয়েছি তাঁর কাছে।" তিনি জিনিসপত্র নামাতে শুরু করলেন।

"সত্যি বলছি দি'মা, আমার রান্না করতে একদম ইচ্ছে করছে না।" শ্যামার স্বরে অনুনয়।

দি'মা কর্কশ স্বরে বলেন, "তাহলে আমিই যাচ্ছি। কিন্তু খেতে তোকে হবেই। বেশ তুই বোস এখেনে, রান্না হলে নাতি এসে ডেকে নিয়ে যাবে। আর বাবাজীর জন্য বার্লি জ্বাল দিতে হবে কি? তাহলে দিয়ে দে আমাকে।"

দি'মা বাকি জিনিস বের করতে থাকেন।

আমি শ্যামার দিকে তাকাই। চোখাচোখি হয়। বলি, "জিদ্‌টা কি বজায় না রাখলেই নয়?"

"না।" শ্যামা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে। তারপর একটু হেসে বলে, "আমার জিদ্ আর বজায় রাখতে দিলে কই? তোমাদের জিদ্ যে আমার জিদের চেয়ে বড়। বসে আছ কেন, সব নিয়ে চল।" সে উঠে দাঁড়ায়।

দি'মা খুশি হন। স্নিগ্ধ স্বরে বলেন, "এই তো লক্ষ্মী মেয়ে আমার। যা, গরম গরম চারটি খেয়ে আয় গে।"

আমিও উঠে দাঁড়াই। জিনিসপত্র সব থলিতে ভরে নিই।

শ্যামা বলে, "আমি আপনার কথা শুনেছি দি'মা, আপনাকেও আমার একটা কথা শুনতে হবে।"

"কি কথা?"

"আমি রান্না করছি, আপনাকেও চারটি খেতে হবে।"

"এই দেখো, পাগলীর কথা শোন! ওরে আমি বামুনের বিধবা, আমি কেমন করে খাব?"

"কেন খেতে পারবেন না?"

"বোকা মেয়ে, তা হয় না।" একবার থামেন। তারপরে বলেন, "তোরা চলে গেলে আমি আহ্নিকে বসব। তারপর যা হোক্ কিছু খেয়ে নেব।"

"ও, বুঝতে পেরেছি।" শ্যামা সহসা গম্ভীর হয়ে যায়।

"কি বুঝলি শুনি?"

"আমার হাতের রান্না খাবেন না, এই তো!"

দি'মা কোন উত্তর দিতে পারেন না। শ্যামার অনুমান মিথ্যে নয়।

শ্যামার দু চোখের কোল বেয়ে কয়েক ফোঁটা অবাধ্য অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সে তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মোছে। যথাসম্ভব সংযত স্বরে বলে, "চল গোসাঁই, যাওয়া যাক্।"

"চলুন।" আমি ঝোলা হাতে এগিয়ে চলি।

শ্যামা আবার বলে, "দি'মা, যাবার আগে একটা কথা বলে যাই, আমি বৈষ্ণব হলেও বামুনের মেয়ে, বামুনের বউ। আমার রান্না খেলে জাত যেত না আপনার।"

"খেলে সত্যি খুশি হবি তুই?"

"হ্যাঁ, খুব খুশি।" শ্যামা ছোট্ট মেয়ের মতো উচ্ছল হয়ে উঠে।

"বেশ পরিষ্কার মত রান্না কর গে, আমি খাব।"

শ্যামা তাড়াতাড়ি নত হয় দি'মাকে প্রণাম করে।

"আরে আরে, কি করছিস!" দি'মা উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। একটু বাদে ছেড়ে দিয়ে বলেন, "যা, তাড়াতাড়ি কর গে।"

"হ্যাঁ যাচ্ছি। চল গোসাঁই।"

আমরা নেমে আসি নৌকো থেকে। মনে মনে ভাবি—কেবল বামুন শুনেই কি দি'মা শ্যামার রান্না খেতে রাজী হলেন, না শ্যামার চোখের জল তাঁর আজন্মের সংস্কারকে ভাসিয়ে দিল?

তীরে নেমে শ্যামা যেন আরও বেশি উচ্ছল হয়ে উঠল। কার সাধ্যি এখন তাকে দেখে বলে যে মাত্র কিছুক্ষণ আগেও সে নিশ্চল পাষাণপ্রতিমার মতো স্বামীর শিয়রে বসেছিল, আর তার স্বামী মৃত্যুপথযাত্রী!

শ্যামা বলে, "চল আমরা ঐ ঝোপটার পেছনে গিয়ে বসি।"

"অত দূরে?"

"হ্যাঁ, রান্না করতে করতে তোমার সঙ্গে দুটো ভালোবাসার কথা কইব, হাটের মাঝে বসব কি গো!"

একটু হেসে বলি, "পরকীয়া প্রেমে তো সবার সমান উৎসাহ না-ও থাকতে পারে।"

"তাতে রাইয়ের কি যায় আসে ?" একটু থামে সে। তারপর সবাইকে শুনিয়ে গাইতে শুরু করে—

"মুড়াব মাথার কেশ, ধরিব যোগিনী বেশ
যদি সোই পিয়া নাহি আইল।
এ হেন যৌবন পরশ রতন
কাচের সমান ভেল ॥"

এগিয়ে চলে শ্যামা। নৌকোর যাত্রীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে রান্নার আয়োজন করছিলেন। তাঁরা হাতের কাজ ফেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। কেউ বা আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন। আমার লজ্জা লাগছে কিন্তু শ্যামার সেদিকে খেয়াল নেই। সে গেয়ে চলেছে—

"গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে
যেখানে নিঠুর হরি ॥"

এসে পৌঁছই ঝোপের পাশে। শ্যামা গান থামিয়ে বলে, "কারও কাছ থেকে একটা কাটারি আর খানচারেক ইট কুড়িয়ে নিয়ে এসো। আমি উনুন বানিয়ে তরকারি কুটে নিচ্ছি। তুমি কাঠ আর জলের যোগাড়ে যাও।"

কাটারি আনতে গিয়ে জানতে পারি বাজারে কাঠের দোকান আছে আর সেখানেই টিউবওয়েল।

ফিরে এসে কথাটা শ্যামাকে জানাতেই সে বলে, 'তাহলে যাও আগে কাঠ নিয়ে এসো। কিন্তু দেখো, সেই সঙ্গে আবার নবকুমারের মত কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে এসো না যেন।" শ্যামা হাসছে।

আমি গম্ভীর স্বরে বলি, "বা রে, আনব কেমন করে ? কপালকুণ্ডলা তো এখানেই বসে আছে !'

"এই যে দেখতে পাচ্ছি পরকীয়া প্রেমে প্রচুর উৎসাহ ! তাহলে তখন অমন সাধু সাজা হয়েছিল কেন ?"

"সাধু সঙ্গে রয়েছি বলে।"

"আমি সাধু কে বললে তোমাকে ?"

"সংসারে সব কথা বলার দরকার হয় না।"

"যাক গে, আর সময় নষ্ট না করে এবারে যা বললাম, তাই কর দেখি।

কাঠ আর জল নিয়ে এসো।”

“তাড়িয়ে দিচ্ছেন?”

“না। কাজ সেরে ফিরে আসতে বলছি।”

“বেশ, যাচ্ছি।”

“যাওয়া নেই, বল আসছি।”

“তাই আসছি।”

“হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি এসো।”

আমি এগিয়ে চলি। মুড়িগঙ্গার তীরে মাটির বাঁধ। সাগরের নোনাজল যাতে ক্ষেতে ঢুকে ফসল নষ্ট না করতে পারে, তাই সারা সুন্দরবন জুড়েই এ ব্যবস্থা। গাঁয়ের মানুষের সাধ্য সামান্য। তারা আপন চেষ্টায় যে-সব বাঁধ দিয়েছে, তা বর্ষার ঢল ঠেকাতে পারে না। কোথাও কোথাও সরকার তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু অসাধু কর্মচারী ও ঠিকাদারদের জন্য সে-সব প্রচেষ্টার অধিকাংশই ব্যর্থতায় পর্যবসিত। যেমন ফ্রেজারগঞ্জের কথাই ধরা যাক্। গত বছর এক কোটি টাকা খরচ করে সেখানে পাকা বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল বিক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরের ভাঙন রোধ করা। এক বর্ষাতেই সে-বাঁধের অধিকাংশ ভেঙে গেছে। অপরাধ বর্ষার নয়, অপরাধ এই দুর্ভাগা দেশের—যে দেশ থেকে ব্রিটিশ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রেম বস্তুটিও বিদায় নিয়েছে। আর তারই ফলে স্বাধীন হবার তেইশ বছর বাদে সোনার দেশটা এমন রসাতলে তলিয়ে যেতে বসেছে।

মাটির বাঁধের ওপর দিয়ে জেটিঘাটে এসে পৌছই। ছোট জেটি—লঞ্চ ও বড় নৌকোর জন্য। জেটির দক্ষিণ পাড়টা পাথর আর ইট দিয়ে বাঁধানো হচ্ছে। জানি না আগামী বর্ষার পরে এ বাঁধেরও ফ্রেজারগঞ্জের বাঁধের অবস্থা হবে কিনা।

কচুবেড়িয়া আজ মেলামুখর। প্রতি মুহূর্তে নৌকো আসছে। দলে দলে যাত্রী নামছেন। বাসে জায়গা পাবার জন্য তাঁরা ছুটোছুটি করছেন। জায়গা দখল হবার পরে কেউ কেউ বাস থেকে নেমে আসছেন। কেনাকাটা করছেন। কেনাকাটা মানে খাদ্যবস্তু সংগ্রহ। আর খাদ্য মানে চিড়া-মুড়ি, গুড় ও কলা। এখানে কলাকে বলে রম্ভা।

মুদি মনোহারী আর কয়েকটা চায়ের দোকান নিয়ে কচুবেড়িয়া। সব দোকানেই ভিড় তবে সব চেয়ে বেশি ভিড় বাস-স্ট্যাণ্ডে। এখানেই বাস-স্ট্যাণ্ড।

সাধারণত একখানি বাস দৈনিক বারতিনেক যাতায়াত করে। কাকদ্বীপ কচুবেড়িয়া দিয়েই গঙ্গাসাগরের স্থায়ী পথ। এখন মেলার জন্য লঞ্চ চলছে, নইলে খেয়া ও ডিঙ্গিনৌকোই পারাপারের সম্বল। বাতাস ও স্রোত পক্ষে থাকলে ঘণ্টাখানেকও লাগে না। আর তা না থাকলে দ্বিগুণ সময় লেগে যায়। আমাদেরও তাই লেগেছে।

কচুবেড়িয়া সাগরদ্বীপের প্রায় উত্তর-পূর্ব প্রান্ত আর মেলাক্ষেত্র অর্থাৎ শ্রীধাম গঙ্গাসাগর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তসীমা। দুয়ের দূরত্ব প্রায় ১৮ মাইল। স্থায়ী 'বাস'টির প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লেগে যায়। শুনেছি সে বাসটি নাকি বড়ই বেয়াড়া। মাঝে মাঝেই বিগড়ে যায়। তখন বোঝা কাঁধে চাপিয়ে প্রখর রোদ কিম্বা প্রবল বৃষ্টি মাথায় করে পা চালানো ছাড়া যাত্রীদের আর কোন উপায় থাকে না। কারণ মেলার সময় ছাড়া অন্য সময়ে সাগরদ্বীপে মানুষ বহন করার জন্য অন্য কোন যান নেই।

তবে মাল বহন করবার জন্য সাইকেল-ভ্যান রয়েছে। বাস বিকল হয়ে যাবার পরে তাই নিয়েই কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। পাঁচ-ছ'জন মানুষ হাসতে হাসতে সওয়ার হন এক-একটি সাইকেল ভ্যানে। ঘণ্টায় মাইল পাঁচেক বেগে সাইকেল ভ্যান এগিয়ে চলে। যাত্রীরা রোদ অথবা বৃষ্টির হাত থেকে পরিত্রাণ পান না। তবু তাঁদের এই সবজির গাড়ি অপছন্দ নয়। কারণ চরণ দুখানি বিশ্রাম পায়—মানুষ শ্রীচরণের সেবক।

এখন অবস্থা অন্যরকম। মেলার জন্য প্রায় ডজনখানেক বাস এসেছে এখানে। তারা শেষরাত থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অনবরত যাত্রীবহন করছে। তাতেও ভিড় কমছে না। কমবে কেমন করে, কেবল মানুষ আর মানুষ! লক্ষ লক্ষ মানুষ আসছে সাগরদ্বীপে—আসছে নৌকোয়, লঞ্চে আর স্টীমারে। আসছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, ভারতের বাইরে থেকে। আসছে মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে সাগর-সঙ্গমে স্নান করে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করতে। আমরাও তাই আজ এখানে।

বাসে চড়ে মেলায় গেলে সমস্ত সাগরদ্বীপটি দেখা হয়ে যায়। ২২৪·৩০ বর্গমাইল (৫৮০·৯ বর্গ কিলোমিটার) জায়গা নিয়ে এই দ্বীপ। ৪৫টি গ্রাম আছে এই দ্বীপে। ১৫,৫৯৬টি বাড়িতে ১৬,১২১টি পরিবার বাস করেন। ১৯৫৯ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী স্থায়ী জনসংখ্যা ৯১,২২৯ জন। তাঁদের মধ্যে ৪৩,৯৩৬ জন নারী।

কচুবেড়িয়া থেকে সাগরমেলার বাসপথটি পিচবাঁধানো। সাগরদ্বীপে এই একটিই পাকা রাস্তা—ঠিক মাঝখান দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত প্রসারিত। পথের দুদিকে ক্ষেত-খামার আর মাটির ঘর। পথের পাশে নালা আর মাঝে মাঝে দু-একটা ডোবা। গ্রামের গরীব মানুষরা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে প্রায়ই মাছ ধরায় মেতে থাকে। অবশ্য যে-সব নালা ও ডোবায় কচুগাছ লাগানো হয়েছে, সেগুলিতে নয়।

বেয়াড়া বাসটি থামতে থামতে এগিয়ে চলে। কচুবেড়িয়ার পরে বাস থামে বামুনিয়াখালি। তারপরে বেঁচিবাড়ি হয়ে ফুলডুবি। সেখানে সুন্দর একজোড়া শিবমন্দির আছে।

তারপরে জুলপিমোর ও চিত্তমোর পেরিয়ে হরিণবাড়ি। দ্বীপের মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত বড় গ্রাম। একমাত্র পাকাবাড়ির মালিক কানাই ডাক্তার। মেডিক্যাল স্কুল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনে। কিছুদিন জেল খাটার পরে ছাড়া পেলেন। নতুন আদেশ হল চব্বিশ পরগণা জেলার বাইরে চলে যেতে হবে। কাকদ্বীপের মানুষ। নিজের দেশ ছেড়ে কোথায় যাবেন? ভাবলেন, বৃটিশ গুপ্তচররা খোঁজ পাবেন না তার। পেলও না অনেকদিন। তিনি মনের সুখে সমাজসেবা ও রাজনীতি করে বেড়ালেন কয়েক বছর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লেন। আবার জেলে গেলেন।

জেল থেকে বেরিয়ে কিন্তু কানাই ডাক্তার কাকদ্বীপে ফিরে গেলেন না। চলে এলেন সাগরদ্বীপে। অবহেলিত দ্বীপের উন্নয়নে মনোনিবেশ করলেন সেই থেকেই তিনি এখানে আছেন। সাগরের মায়া যে বড়ই কঠিন মায়া।

হরিণবাড়ির পরে খুদিগুড়িয়া। তারপরে রুদ্রনগর—সাগরদ্বীপের সদর। সেখানেই ব্লক ডেভেলপমেণ্ট্ অফিস।

রুদ্রনগরের পরে চৌরঙ্গী, দিগম্বরী ও ছয়েরঘেরি। নামখানা চেমাগুড়ি হয়ে যাঁরা মেলায় যান, তাঁরা ছয়েরঘেরিতে গিয়ে মূল-পথ অর্থাৎ এই কচুবেড়িয়া-গঙ্গাসাগর পথে পড়েন। চেমাগুড়ি থেকে ছয়েরঘেড়ি দু-মাইল। ভি. আই. পি.-দের সাগরস্নানের জন্য ছয়েরঘেড়িতে তৈরি হচ্ছে হ্যালিপ্যাড্। হ্যালিকপ্টারে কলকাতা থেকে ওখানে আসতে মাত্র বিশ মিনিট সময় লাগবে।

ছয়েরঘেড়ি থেকে মেলাক্ষেত্র মাত্র পাঁচ মাইল। পথে পড়ে ইষ্টানন্দ বাজার ও কালীবাজার। তারপরেই গঙ্গাসাগর গ্রাম—পথের দু-পাশে দুটি

দোকান, কয়েকখানি বাড়ি আর একটি টিউবওয়েল। সেখান থেকেই বাঁধের ওপর দিয়ে একটি পায়ে-চলা-পথ চলে গেছে কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের 'লাইট-হাউস' ও 'হাই-ফিক্স' (বেতার সংযোগ) স্টেশন হয়ে 'সাগর-সীমাফোর' বা গঙ্গার জল পরিমাপ কেন্দ্র অর্থাৎ সাগরসঙ্গম পর্যন্ত।

বাস কিন্তু আরও মাইলখানেক এগিয়ে সেচ বিভাগের ডাকবাংলো পর্যন্ত যায়। তারপরেই একটি কাঠের পুল পেরিয়ে শ্রীধাম গঙ্গাসাগর।

তবে সেই মেলাক্ষেত্রের কথা এখন থাক্। আমরা তো সেখানেই চলেছি। চলেছি সাগরমেলায়—সহস্র বৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাবেশে।

কচুবেড়িয়া বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছেই জ্বালানি কাঠের দোকান। আর সেখানেই দেখা হয় এখানকার প্রবীণতম ব্যক্তি রজনী মোড়লের সঙ্গে। তিনি কয়েকজন যাত্রীর কাছে সেকালের কথা বলছিলেন। বৃদ্ধ হলেও স্থবির নন। বয়সের ভারে সামান্য একটু নুয়ে পড়েছেন মাত্র। যৌবনে যে দীর্ঘদেহী স্বাস্থ্যবান পুরুষ ছিলেন, কোন সন্দেহ নেই। গায়ের রঙটাও খুব কালো নয়। ভালই লাগে ভদ্রলোককে। ভাল লাগে তাঁর কথাবার্তা। তিনি বলছেন—"সাড়ে চারকুড়ি দুই বছর বয়স হল আমার। আর সাগরদ্বীপে আমার হল গিয়ে এই চারকুড়ি বছর। আমি বাতিঘর তৈরি হতে দেখেছি।"

"আপনার দেশ কোথায়?" মাঝখান থেকে প্রশ্ন করে বসি।

বৃদ্ধ বলেন, "মেদিনীপুর-রসুলপুরের নদীর ধারে। আপনাদের কপাল-কুণ্ডলার দেশে, তবে গাঁয়ের কথা কিছুই আর মনে নেই এখন। বাবার সঙ্গে সাগরদ্বীপে এসেছিলাম, আর ফিরে যাই নি।"

"আপনি সেকালের সাগরদ্বীপের কথা বলুন।" আমি অনুরোধ করি।

"তখন সাগরদ্বীপে মানুষ ছিল কম। কিন্তু মানুষে মানুষে ভাব ছিল খুব বেশি। মানুষ তখন মানুষের শত্রু ছিল না। মানুষের শত্রু ছিল বনের বাঘ আর জলের কুমীর। গাঁয়ের মানুষরা দল বেঁধে বাঘ আর কুমীর মারত। মারতে পারলে কালীপূজা করা হত। যেমন-তেমন করে নয়, খুবই ঘটা করে হত সেই পুজো। আমাদের গাঁয়ের কাপালিকবাবাকে নিয়ে আসা হত। তিনি শব-সাধনা করতেন।"

"সেই কাপালিকবাবার কি হল শেষ পর্যন্ত?"

"কি আর হবে! সবার যা হয়, তেনারও তাই হল!"

"মারা গেলেন?"

"রাম রাম, ছি ছি, কি সব বলছেন? মারা যাবেন কেন? তিনি হলেন গিয়ে সিদ্ধপুরুষ। তিনি কি মারা যেতে পারেন? তিনি দেহরক্ষা করলেন।"

ভুলটা বুঝতে পারি। সাধু-সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে সাবধানে কথা বলা উচিত। জিজ্ঞেস করি, "স্বেচ্ছায় দেহরক্ষা করলেন?"

"তা…", বৃদ্ধ একটু থামেন। তারপরে বলেন, "তা বলতে পারেন। তবে শেষটা বড়ই দুঃখের।"

"কি রকম?"

"শুনেছি শবসাধনা করতে বসে কি নাকি ভুল হয়েছিল তাঁর। তাই তিনি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। বলির খড়্গ দিয়ে দুজন শিষ্যকে খুন করে নিজে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন। আর কেউ কোনদিন দেখতে পায় নি। দেখবে কেমন করে—মা-গঙ্গা যে কোলে করে স্বর্গে নিয়ে গেছেন তাঁকে।"

উনুন বানিয়ে আমারই পথ চেয়ে বসেছিল শ্যামা। ফিরে আসতেই বলে, "বড্ড দেরি করে ফেললে গোসাঁই। ওদিকে যে মানুষটা অজ্ঞান হয়ে আছেন।"

"দি'মা তো রয়েছেন কাছে। যদি বলেন, গিয়ে দেখে আসি একবার।"

"না না, তার দরকার নেই। তুমি বরং উনুনটা ধরিয়ে দাও। আমি নদী থেকে একটা ডুব দিয়ে আসি।"

"ডুব দেবার কোন দরকার আছে কি?"

"আছে বৈকি। দি'মা খাবেন, স্নান না করে কি রান্না করা যায়?"

আর কোন কথা না বলে আমি নিজের কাজ করতে থাকি। শ্যামা স্নান করতে রওনা হয়। হেসে বলি, "সাবধানে স্নান করবেন।"

"নইলে কি হবে? কুমীরে খাবে?"

আমি চুপ করে থাকি। শ্যামা চলতে চলতে বলে, "তা খেলে তো ভালই হবে তোমার, আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে।"

মিনিট পনেরোর মধ্যে ফিরে আসে শ্যামা। এসেই বলে, "এই তো গুড বয়, চমৎকার আগুন হয়েছে!"

সে তাড়াতাড়ি খিচুড়ি চাপিয়ে দেয়।

আমি হাসতে হাসতে বলি, "রান্না তো চাপালেন, কিন্তু খেতে পারবেন কি?"

"না পারার কি কারণ থাকতে পারে?" শ্যামা পাল্টা প্রশ্ন করে।

"আমি যে উনুন ধরিয়েছি।"

"তাতে কি হয়েছে?"

"আমি তো বামুন নই।"

"ও, এই কথা!" শ্যামা একটু থামে। তারপরে বলে, "গোসাঁই, ব্রজবর নাগর গোকুল-রঞ্জন কানুও তো বামুন ছিলেন না, তবু যে তিনি চিদানন্দ, মানুষের সর্বইন্দ্রিয়ের একমাত্র আধার।"

এ কথার পরে আর কি বলব? তাই চুপ করে থাকি। শ্যামা তরকারি কুটতে বসে। তাকে ভারী ভাল দেখাচ্ছে। সে গেরুয়া রঙের শাড়ি পরেছে। গায়ে দিয়েছে সাদা জামা। খোঁপা খুলে চুল ছড়িয়ে দিয়েছে পিঠে। আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকি।

শ্যামা কাজ করতে করতে বলে, "আসল কথা কি জান?"

"কি?"

"ভক্তি। ভক্তি না হলে জগতে কোন কাজ হয় না। যোগ বল, সাধনা বল, জ্ঞান বল—সব কিছুর জন্যই যেমন চাই ভক্তি, তেমনি খাওয়া-পরা চলা-ফেরা কোন কিছুই ভক্তি ছাড়া হয় না। তাই ভক্তিভরে রান্না করে দিলে আমি চণ্ডালের খাবারও খেতে পারি।"

শ্যামা থামে। কিন্তু আমি তার দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকি। সবিস্ময়ে তাকে দেখতে থাকি।

শ্যামা জিজ্ঞেস করে, "অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছ কেন?"

আমার চমক ভাঙে। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিই। কিন্তু শ্যামার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারি না।

শ্যামা আবার বলে, "এই রে, সেরেছে!"

"কি?"

"তোমার মন আমাতে মজেছে।"

গতকালও শ্যামা এ কথা বলেছে। কোন উত্তর দিতে পারি নি। কিন্তু তার সহজ ও সুমধুর ব্যবহার আজ আমাকেও অনেকখানি সহজ করে তুলেছে। তাই আজ হেসে বলি, "তাতে দোষ কি?"

"বা রে, আমি যে পরস্ত্রী!"

"রাধাও তো পরস্ত্রী ছিলেন।"

"এক্ষেত্রে আরও দোষ আছে।"

"কি ?"

"তুমি ভদ্রঘরের শিক্ষিত যুবক, আর আমি অশিক্ষিতা বৈষ্ণবী।"

"আপনি বৈষ্ণবী কিন্তু অশিক্ষিতা নন।" আমি শ্যামার দিকে তাকাই। একবার চোখাচোখি হয়। শ্যামা তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নেয়। তার হাতের কাজ থেমে যায়। সে চুপ করে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করি, "বলুন আপনি কে ?"

শ্যামা মুখ তুলে আবার আমার দিকে তাকায়।

আমি বলি, "আমি আপনার সত্যিকারের পরিচয় জানতে চাইছি।"

"তাতে তোমার কি লাভ ?"

"আমি আপনার কথা জানতে পারব।"

শ্যামা একটুকাল চুপ করে থাকে। তারপরে বলে, "তোমার কি সে কথা একান্তই জানা দরকার ?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ তাহলে শোন।" শ্যামা হাতের কাজ শুরু করে। কাজ করতে করতে বলতে থাকে, "আমার বাবা ছিলেন মফঃস্বল শহরের স্কুলমাস্টার। আমরা দু'ভাই এক বোন। কাজেই মা-বাবা ও দাদাদের চোখের মণি ছিলাম আমি।

"যথাসময়ে ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ভর্তি হলাম। ছোটবেলা থেকেই গান শিখতাম। তাই লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গীতচর্চাও চলতে থাকল।

"কেন জানি না, গানের মধ্যে কীর্তন সব চেয়ে ভাল লাগত আমার। বাড়ির পাশেই ছিল এক বৈরাগীর আখড়া। মাঝে-মাঝেই সন্ধ্যেবেলা কীর্তন ও বাউল গানের আসর বসত। আমি প্রায়ই গান শুনতে যেতাম।

"সেখানেই প্রথম দেখলাম কৃষ্ণগোপালকে, কলকাতার কীর্তনীয়া। দেখেই ভাল লাগল। গান শুনে আরও ভাল। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি মিষ্টি গলা।

"আলাপ করে তাকে একদিন বাড়িতে আসার নেমন্তন্ন করলাম। কি জানি হয়তো আমাকেও তার ভাল লেগে থাকবে। পরদিন বিকেলেই সে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হল। আমার খুবই ভাল লাগল। বাবাও গান বড় ভালোবাসতেন। কেষ্টর গান শুনে তিনিও খুব খুশি হলেন।

"কি কারণে জানি না, তারপর থেকে কেষ্ট প্রায়ই আমাদের শহরে

আসতে শুরু করল। আর এলেই সে আমাদের বাড়িতে আসত। আমাকে গান শেখাতো। ক্রমে এমন হল যে, কোন সপ্তাহে কেষ্ট না এলে আমি অস্থির হয়ে পড়ি। দিনে কাজ করতে পারি না। রাতে ঘুম আসে না। নীরবে অশ্রুপাত করি। কেষ্ট বৈরাগীর জন্য চোখের জল ফেলত শ্যামলী ভট্টাচার্য। অনেক ভেবেও বুঝতে পারতাম না কেন এমন হল? কেবল এটুকু বুঝতাম, কেষ্ট কাছে থাকলে ভাল লাগে আমার। তবে এই ভাল লাগা যে ভালোবাসা, তা আমি তখনও বুঝতে পারি নি।

"কিন্তু বুঝতে পেরেছিল কেষ্ট। তাই সেদিন সে সোজাসুজি প্রস্তাব করল পালিয়ে যাবার, সামান্য আপত্তি করে আমি রাজী হলাম। কারণ তখন আমার মনে হয়েছিল, সমস্ত জগতের বিনিময়েও কেষ্টকে কাছে পেতে হবে। একমাত্র সে-ই পারে আমার জীবনকে পূর্ণ করে তুলতে।

"কিন্তু কেষ্ট বলল, কেবল পালিয়ে গেলে হবে না, চাই টাকা—অনেক টাকা। সে-ই সুযোগ তৈরি করার উপায় বলে দিল। দাদারা সন্ধ্যার সময় কোনদিনই বাড়ি থাকত না। ভাল গান হবে বলে মা-বাবাকে নিয়ে আখড়ায় গেলাম। তারপরে গানের খাতা আনার অছিলায় মা-র কাছ থেকে চাবি নিয়ে বাড়িতে এলাম। বাক্স ও আলমারি খুলে গয়না টাকা ও কাপড়চোপড় একটা সুটকেসে ভরে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে এসে কেষ্টর সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠলাম।

"বৈষ্ণবাটি থেকে বৃন্দাবন বহুদূর। কিন্তু সেবারে আমার মোটেই তা মনে হয় নি। বরং কেষ্টকে কাছে পেয়ে দিনকে তখন ঘণ্টার মত মনে হয়েছিল আমার। আর মথুরা বৃন্দাবন ও আগ্রার দিনগুলি তো আরও রমণীয়। হাসি আর খুশি, উত্তেজনা আর আনন্দ দিয়ে ভরা সেই দিনগুলি। নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েও কেষ্টকে কাছে পাবার আশ মিটত না।

"বস্তুতান্ত্রিক কেষ্ট কিন্তু আমার যৌবনকে নিঃস্ব করেই সন্তুষ্ট হয় নি। একদিন সে আমাকেও সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে অদৃশ্য হল। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, কেষ্ট নেই। আর তার সঙ্গে আমার গয়নার বাক্স ও বাকি টাকাপয়সা উধাও হয়েছে।" শ্যামা থামে। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নীরবে নিজের কাজ করে যেতে থাকে।

"তারপর?" অসহিষ্ণু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করি।

"তারপরের ইতিহাস আরও বেদনাবিধুর। বাস্তবজ্ঞানশূন্য উনিশ বছরের একটি মেয়ে বৃন্দাবনের পথে পথে একমুঠো ভাতের জন্য ঘুরে বেড়াতে থাকল।

শুধু শুনেছিলাম, রাধা-কৃষ্ণের আশীর্বাদে বৃন্দাবনে কেউ উপোসী থাকে না। কিন্তু সেই জায়গাটি খুঁজে পেতে দুদিন উপোস করতে হয়েছে আমাকে।

"বৃন্দাবনে কয়েকটি ভজনাশ্রম আছে। সেখানে যে কেউ গিয়ে নাম লিখিয়ে যদি সকাল-বিকেল মিলিয়ে ঘণ্টা দশেক হরিনাম করে, তাহলে আট আনা পয়সা পায়। কোন-কোনদিন খাবারও জুটে যায়। আর দোল ও জন্মাষ্টমীর সময় পাওয়া যায় শাড়ি ও তুলোর কম্বল। তেমন একটি আশ্রমে নাম লেখালাম আমি। কিছুদিন চলল এইভাবে।

"তারপরে একদিন সেখানেই সাক্ষাৎ হল ওঁর মানে তোমার বাবাজীর সঙ্গে। তিনিও নামকীর্তন শুনতে গিয়েছিলেন সেখানে। আমার কণ্ঠস্বর শুনে ভাল লাগল তাঁর। গান শেষ হবার পর কাছে ডাকলেন আমাকে। তিনি প্রায় আমার বাবার বয়সী, কাজেই নিঃসঙ্কোচেই তাঁর সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলাম।

"সব শুনে তিনি বললেন—আমার সঙ্গে কলকাতায় চল। আমার আশ্রমে থাকবে।"

"আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো আমার। কোন উত্তর দিতে পারলাম না। তিনি আবার বললেন—না, না, ভিক্ষারিণীর মতো নয়, তুমি থাকবে নিজের অধিকারে। আশ্রমের কাজ করবে, ঠাকুরসেবায় আমাকে সাহায্য করবে আর সবাইকে ঠাকুরের গান শোনাবে। আপত্তি করো না। আমি বলছি, এতে তোমার ভাল হবে। তুমি ভাল থাকবে। আমাকে বিশ্বাস করো।

"বিশ্বাস করেছিলাম। তাড়াতাড়ি নত হয়ে প্রণাম করলাম তাঁকে। তিনি আমাকে হাত ধরে টেনে তুললেন। শুধু সেই অসহায় অপমানিত জীবন থেকে নয়, তিনি আমাকে টেনে তুললেন পরিচ্ছন্ন জীবনে।"

ভাবি ঠিকই বলেছে শ্যামা, নইলে তাকেও আজ কমলার মতই পতিতার জীবন যাপন করতে হত। কিন্তু সেকথা না বলে প্রশ্ন করি, "আপনি তাঁর সঙ্গে কলকাতায় এলেন?"

"হ্যাঁ।"

"বাড়িতে মা-বাবার কাছে গিয়েছিলেন?"

"না। তোমার বাবাজী গিয়েছিলেন, তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার জন্য সেই দুঃসহ অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে তিনি হাসিমুখে ফিরে

এসেছেন।"

"তারপরে কি হল?"

শ্যামা একটু ম্লান হেসে বলে, "পরে শুনো। এখন খেতে বসে যাও, রান্না হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে নৌকোয় গিয়ে দি'মাকে পাঠিয়ে দাও। আর ঠিক কথা, আমার মালপত্রের মধ্যে দেখবে, হরলিক্স-এর একটা বোতল আছে। সেটা দি'মার হাতে দিয়ে দিও, ওঁর জন্য একটু হরলিক্স বানিয়ে নেব। ঘুম ভাঙার পরে যদি একটু খেতে পারেন।"

"বেশ তো, খেতে দিন। কিন্তু সেই সঙ্গে সংক্ষেপে তার পরের কথা বলুন।"

"সে কথা কি না শুনলেই নয়?" শ্যামা আমাকে খাবার দেয়।

"আপত্তি না থাকলে বলুন, আমার বড্ড শুনতে ইচ্ছা করছে।"

"আপত্তি!" শ্যামা আবার হাসে, তেমনি ম্লান হাসি—"যা সত্যি তা বলতে আপত্তি থাকবে কেন? সত্য যে কঠিন হলেও সুন্দর—সে পরমসুন্দর।"

"তাহলে বলুন।"

"পরের ইতিহাস খুব বড় নয়, তবে একটু বিচিত্র। সে যাই হোক্। তারপরে তোমার বাবাজীর আর সব শিষ্য-শিষ্যার মতো আমিও আশ্রমের একজন হয়ে রইলাম। কিন্তু কেন জানি না, কিছুদিনের মধ্যেই আমি ওঁর প্রিয়পাত্রীতে পরিণত হলাম। ফলে শিষ্যারা আমাকে হিংসা করতে শুরু করল আর শিষ্যরা করতে থাকল অতিরিক্ত আদর।

"মাস ছয়েকের মধ্যেই আমার জীবন হয়ে উঠল দুঃসহ। কয়েকজন গুরুভাই তখন আমার রূপে এমন মোহগ্রস্ত যে তারা কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। কামনা চরিতার্থ করার জন্য আমাকে তারা নানারকম প্রলোভন দেখাতে থাকল। আমি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। তারা তখন প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে উঠল। আমার শ্লীলতাহানির চেষ্টা শুরু করল। ফলে সন্ধ্যার পরে আশ্রমের অন্ধকার ও নির্জন অংশে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও রাতে জানালা খুলে রাখবার উপায় রইল না।

"সাহায্য করা তো দূরের কথা, শিষ্যারা আরও নানা মিথ্যে বানিয়ে তোমার বাবাজীর কাছে লাগাতে আরম্ভ করল। আশ্রমে আমার টেকা দায় হয়ে উঠল। অথচ চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। কারণ বিশ্বসংসারে যে যাবার কোন জায়গা নেই, এটা আমার সব সময় মনে ছিল।

"কথাটা ওঁর কানে উঠেছিল অনেক আগেই, কিন্তু তিনি কখনও এ প্রসঙ্গে

আমাকে কিছু বলেন নি। শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা এমন পর্যায়ে এসে ঠেকল যে তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। একদিন দুপুরে হঠাৎ আমাকে ঘরে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখি আমার সব ব্রহ্মচারী প্রণয়ীরা বসে আছে। বুকটা কেঁপে উঠল। তবু নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলাম।

"আমি তাঁর পাশে গিয়েই বসে পড়লাম। তিনি জানালেন যে আমার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ এসেছে তাঁর কাছে। তারই তদন্তের জন্য তিনি সেই সভার ব্যবস্থা করেছেন। আমি কোনমতে জ্ঞানটুকু বজায় রেখে চুপ করে বসে রইলাম। তিনি শিষ্যদের নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করতে বললেন। একে একে তারা তাদের বক্তব্য রাখল। প্রত্যেকেরই একই অভিযোগ, আমি নাকি কোন-না-কোন সময় তাদের প্রত্যেককে প্রেম নিবেদন করেছি। অতএব আমার ওপর তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আমার সঙ্গে কণ্ঠিবদল করতে চায়।

"বৈষ্ণব হয়ে, ব্রহ্মচারী হয়ে, আশ্রমবাসী হয়েও যে মানুষ এত মিথ্যেবাদী হতে পারে, তা বোধ করি তোমরা ভাবতে পারবে না। আমার কাছে আজ অবশ্য এমন ঘটনা মোটেই বিস্ময়কর নয়। তবে সেদিন আমিও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। উনি যখন জিজ্ঞেস করলেন, আমার কিছু বলার আছে কিনা, আমি কোন প্রতিবাদ করতে পারলাম না। তিনি বঝতে পারলেন আমার মনের অবস্থা। তাই শিষ্য-শিষ্যাদের চলে যাবার নির্দেশ দিলেন। বললেন, আমার সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা করে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবেন।

"ওরা চলে যাবার পরে তিনি বললেন,—যা অবস্থা দেখছি, কারও সঙ্গে তোকে কণ্ঠিবদল করতেই হবে।

"আমি তা পারব না, কিছুতেই পারব না। চীৎকার করে উঠলাম। আমার বুকের মাঝে জমে থাকা সব কথা একসঙ্গে বেরিয়ে এল। সব বললাম তাঁকে।

"তিনি স্নিগ্ধ স্বরে বললেন,—শান্ত হ। পারব না বললেই কি পরিত্রাণ পাওয়া যায়! অনেক সময় অনিচ্ছায় পারতে হয়। আর তাছাড়া এতে তো তোর অনিচ্ছা হওয়া উচিত নয়। ওরা সবাই আমার শিষ্য—ভাল ছেলে। যাকে তোর পছন্দ হয়, তুই তারই সঙ্গে কণ্ঠিবদল কর্। দেখবি, তারপরে কেউ তোকে আর বিরক্ত করবে না।

"ওদের কাউকেই যে আমার পছন্দ হয় না।

"কেন ?

"ওরা সবাই ভোগী, ওরা পশু।

"একটু হেসে তিনি বলেন—ভোগী হলেই পশু হয় না রে। মানুষই ভোগ করে আবার মানুষই ত্যাগ করে।

"তা হোক গে, আপনি যদি জোর করে ওদের কারও সঙ্গে আমার কণ্ঠিবদল করান, আমি গলায় দড়ি দেব।

"এমন উত্তরের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি চুপ করে রইলেন।

"আমি আবার বললাম—ওরা কেউ তেমন নয়, ওরা কেবলই ভোগী।

"কিন্তু কারও সঙ্গে কণ্ঠিবদল না করে তুই যে এখানে টিকতে পারবি না। মেয়েদের জীবন হচ্ছে তরল পদার্থের মত, একটা আধার না হলে স্থির থাকতে পারে না। পুরুষ হচ্ছে সেই আধার। আর বিয়ে বা কণ্ঠিবদল হল সমাজের ছাড়পত্র, সৎ ও সুন্দর জীবনযাপনের অধিকার।

"আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। দু'হাতে তাঁর একখানি পা জড়িয়ে ধরে বললাম—আপনি আমাকে পায়ে ঠাঁই দিন। আমি তাঁর পায়ে মাথা খুঁড়তে থাকলাম।

"কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল। তারপরে তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—আমি তোকে ঠাঁই দিয়েছি শ্যামা, কিন্তু তাতেও যে তোর সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।

"আমি উঠে বসলাম। আঁচলে চোখ মুছে বলে বসলাম,—আপনি আশ্রয় দিলে কার সাধ্য আমার ক্ষতি করে? আমি আপনার সঙ্গে কণ্ঠিবদল করব।

"তিনি বলে উঠলেন—আমার সঙ্গে ?

"আমি উত্তর দিলাম,—হ্যাঁ। আমি সারাজীবন আপনার দাসী হয়ে থাকব। আপনি আমাকে পায়ে ঠাঁই দিন।

"আমি আবার তাঁর পায়ে পড়তে চাইলাম। কিন্তু এবারে তিনি আমাকে দু'হাতে কাছে টেনে নিলেন। আমার চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যেতে থাকল।

"একটু বাদে তিনি বললেন—কিন্তু আমি যে বুড়ো হয়ে গেছি। আমি তো তোর দেহ ও মনের কোন দাবিই মেটাতে পারব না শ্যামা।

"আমার কোন পার্থিব দাবি নেই। আমার দেহ-মন সবই তো প্রাণ-গোবিন্দকে সঁপেছি প্রভু। আপনি শুধু আমাকে এই দুঃসহ উৎপীড়নের হাত

থেকে রক্ষা করুন।

"বেশ তাই হবে, তিনি বললেন। আমি তাঁকে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

"সেই থেকেই আমি ঐ বৃদ্ধ বৈষ্ণবের বৈষ্ণবী। তাঁরই দয়ায় আজও আমি মানুষের মতো বেঁচে আছি। ওঁর মতো দয়াময় মানুষ এ সংসারে বড় একটা দেখা যায় না গোসাঁই। কৃষ্ণ করুণা-সিন্ধু, তিনি আমাকে এমন প্রেমময় স্বামী দিয়েছেন।"

শ্যামা থামে। সে আঁচলে চোখ মোছে। শ্যামা কি কাঁদছে! না না, কাঁদবে কেন? শ্যামা স্বামী-সোহাগিনী। নিশ্চয়ই ওর চোখে উনুনের ধোঁয়া লেগেছে, তাই চোখে জল এসেছিল। সেই জল মুছে ফেলল শ্যামা।

হ্যাঁ, ঠিকই ভেবেছি। তাই হবে। ঐ তো শ্যামা স্বাভাবিক স্বরে বলছে, "সে কি, বসে রইলে কেন? খাওয়া হয়ে গেছে, এবারে তাড়াতাড়ি নৌকায় গিয়ে দি''মাকে পাঠিয়ে দাও?"

"হ্যাঁ যাচ্ছি।" আমি তাড়াতাড়ি থালাখানি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াই।

"ও কি, থালাটা নিয়ে কোথায় চললে?"

"নদীতে।"

"কেন, বিসর্জন দেবে নাকি?"

হেসে বলি, "না, ধুয়ে নিয়ে আসব।"

"ডেঁপোমি করো না তো।" শ্যামা ধমক লাগায়। বলে, "লক্ষ্মী ছেলের মতো থালাখানি ওখানে রেখে, হাত-মুখ ধুয়ে নৌকোয় চলে যাও।"

"কিন্তু···, আমার এঁটো থালা আপনি ধোবেন কেন?"

"আমার কাজ বলে।"

"মানে?"

"তোমাদের এঁটো ধোবার জন্যই যে আমাদের জন্ম। তোমাকে থালা ধুতে দিলে আমার পাপ হবে। তুমি আমাকে পাপের ভাগী করো না গোসাঁই।"

এর পরে আর প্রতিবাদ করা বৃথা। কাজেই বিনা বাক্যব্যয়ে থালাখানি মাটিতে রেখে আমি নদীর দিকে এগিয়ে চলি।

কে? দি'মা না? হ্যাঁ, দি'মাই তো। কিন্তু তিনি অমন ছুটে আসছেন কেন? পড়ে যাবেন যে!

আর তাঁর তো এখন এখানে আসার কথাও নয়। বাবাজী একা রয়েছেন। কথা ছিল, দি'মা আহ্নিক সেরে অপেক্ষা করবেন। আমি নৌকোয় গেলে, তিনি খেতে আসবেন।

"দি'মা আসছেন কেন? কি হয়েছে?" শ্যামাও দেখতে পেয়েছে। সব ফেলে সে ছুটে আসে আমার কাছে। আমরা ছুটে চলি দি'মার কাছে।

দি'মা কাছে আসেন। তিনি মাটিতে বসে পড়েন। কেঁদে ওঠেন, "ওরে তোরা এখনও এখানে? ওদিকে যে সব শেষ হয়ে গেছে!"

"কি?"

"কি হয়েছে?" শ্যামা চীৎকার করে ওঠে। সে দি'মার পাশে বসে পড়ে।

দি'মা দু'হাতে জড়িয়ে ধরেন শ্যামাকে। তেমনি আকুল কণ্ঠে বলে ওঠেন, "তোর যে সর্বনাশ হয়ে গেছে মা!"

"কি হয়েছে?" আমিও দি'মার পাশে বসে পড়ি।

"কি হয়েছে আমার?" শ্যামা কেঁদে ওঠে।

"বাবাজী নেই।"

"নেই!"

"না বাবা, নেই।"

দি'মার হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ায় শ্যামা। সে টলতে টলতে এগিয়ে চলে। তাড়াতাড়ি তার কাছে আসি। ওর কম্পমানা দেহটাকে সযত্নে ধরে নিয়ে নৌকোয় চলি। দি'মা একা বসে থাকেন সেই বালুকাবেলায়।

সহযাত্রীরা সবাই নির্বাক। কেউ বা তীরে, কেউ বা নৌকোয়। সবাই সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে—শ্যামার দিকে।

সাবধানে শ্যামাকে ধরে উঠে আসি নৌকোয়। অপেক্ষমান সহযাত্রীরা সরে দাঁড়ায়। নৌকোর ভেতরে তাকাই—কেউ নেই। কেবল বাবাজী একা।

না, বাবাজী নেই। পড়ে আছে তাঁর প্রাণহীন দেহ। তিনি নেই। তিনি চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে—শ্যামাকে ছেড়ে। চলে গেছেন মানুষের মায়া কাটিয়ে, মাটির পৃথিবী ছাড়িয়ে। কোথায়? কোথায় চলে গেলেন বাবাজী?

জানি না। কেবল জানি, শ্যামা শত ডাকাডাকি করলেও তিনি আর আসবেন না ফিরে।

কিন্তু কে বলবে তিনি নেই? আমরা তাঁকে যেভাবে দেখে গেছি, ঠিক সেই ভাবে শুয়ে রয়েছেন তিনি। সবই তো রয়েছে, তাহলে তিনি নেই কেন?

একটা ধাক্কা দিয়ে আমাকে দূরে সরিয়ে দেয় শ্যামা। সে ছুটে যায় নৌকোর ভেতরে। বাবাজীর নিথর দেহটার উপর আছড়ে পড়ে। তাঁর নিস্পন্দ বুকে মুখ গুঁজে পাগলের মত কেঁদে ওঠে শ্যামা।

আমি এসে তার পাশে বসি। সহযাত্রীরা আসেন। আসেন দি'মা। কন্তু আমরা কেউ কোন কথা বলতে পারছি না।

কি বলব? বাবাজী বুড়ো হয়েছিলেন, অনেকদিন ধরে ভুগছিলেন—কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁর সব কষ্টের অবসান হয়েছে—তিনি ভালই গিয়েছেন।

কিন্তু শ্যামা যে তাঁর স্ত্রী। স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা জানা নেই আমার।

আমি চুপ করে থাকি। চুপ করে আছেন দি'মা। সহযাত্রীরাও সবাই নীরব।

কেবল কথা বলছে শ্যামা। বলছে নিজের অভাগিনী জীবনের কথা। বলছে তার স্বামীর মহত্ত্বের কথা। তাঁকে বলছে—শেষ পর্যন্ত এই তোমার মনে ছিল! তাই তুমি ডাক্তারবাবুর বারণ না শুনে সাগর রওনা হয়েছিলে, আর কাল রাতে আমাকে ও-সব কথা বলেছিলে! গঙ্গার বুকে শুয়ে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করলে তুমি! তুমি মহৎ, তুমি দয়াময়, তুমি পুণ্যবান—মা-গঙ্গা তোমাকে কোলে তুলে নিলেন। কিন্তু আমি—আমার কি হবে? ওগো স্বার্থপর, আমার জন্য যে কিছুই রেখে গেলে না তুমি! আমি কি নিয়ে থাকব?

কে তার এ প্রশ্নের উত্তর দেবে? কিন্তু আমি যে তার কান্না আর সইতে পারছি না।

নেমে আসি নৌকো থেকে। ধীর পদক্ষেপে ফিরে আসি সেই ঝোপের ধারে। কাক ও কুকুরগুলি সরে যায় দূরে। শ্যামা ও দি'মার অভুক্ত খাবার নয়ে ওরা এতক্ষণ মহোৎসবে মেতেছিল। তাই আমার আগমনে অসন্তুষ্ট ওরা। দূরে দাঁড়িয়ে সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ করছে।

না, এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। এখানে বসে শ্যামা তার জীবনকাহিনী বলেছে আমাকে। বলেছে বাবাজীর দয়া আর ভালবাসার কথা। বলেছে বাবাজী কেবল তাকে আশ্রয় দেন নি, তাকে উদ্ধার করেছেন। সেই বাবাজী আর নেই। তার সঙ্গে শ্যামার চিরবিচ্ছেদ ঘটেছে।

অথচ এখানকার বালিতে আর বাতাসে এখনও আমি ওদের মিলিত জীবনের মধুর স্পর্শ পাচ্ছি। সেই সুন্দর জীবনের মধুময় স্মৃতি নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে শ্যামাকে। মানুষ-মরণশীল, কিন্তু অমর মানুষের স্মৃতি।

॥ নয় ॥

গঙ্গা, হ্যাঁ গঙ্গা বৈকি, মুড়িগঙ্গাও গঙ্গা। নাম যাই হোক, একই ধারা—পতিত-পাবনীর পুণ্যধারা। সেই গঙ্গার তীরে বাবাজীর শেষকৃত্য সম্পাদন করে আমরা যখন নৌকো ছাড়তে পারলাম, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে।

ভাঁটা হয়েছে অনেকক্ষণ। তার ওপরে বাতাসও অনুকূলে। পালে জোর হাওয়া লাগছে। দুখানা পালই লাগানো হয়েছে। বেশ জোরে নৌকো চলেছে। বুড়ো মাঝি বলছে, হাওয়া না পড়ে গেলে আমরা এই ভাঁটাতে অর্থাৎ সন্ধ্যের আগেই গঙ্গাসাগর পৌঁছে যাব।

কিন্তু যাত্রীরা এখন সে-সব কথা বড় একটা ভাবছে না। এখন তাদের সবারই নজর শ্যামার দিকে—সান্ত্বনা ও সহানুভূতির নজর। কাল এমন কি আজ সকালেও যারা তাকে আড়ালে 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা', 'কলির রাধে' কিম্বা 'বেহায়া বোষ্টমী' বলেছে, তারা পর্যন্ত তার প্রতি সহানুভূতিশীল। এখন তাদের চোখে নেই সেই ঘৃণা কিম্বা লালসার দৃষ্টি। দি'মা তো বলতে গেলে শ্যামাকে আঁকড়ে ধরে আছেন।

আমিও শ্যামার দিকে তাকিয়েছিলাম। ভাবছিলাম তার ভাগ্যহীনা জীবনের কথা। শ্যামা গান ভালোবাসে। গানের জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছে তাকে। কেষ্ট ভাল গান গাইত বলে, একদিন সে সবাইকে ছেড়ে, সব কিছু ফেলে তার হাত ধরে পথে নেমেছিল। সেই কেষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা করল। জীবনের পথ হারিয়ে ফেলল শ্যামা। পথহারা শ্যামা অন্ধকারে ঘুরপাক খেতে থাকল।

এই সময় বাবাজীর সঙ্গে দেখা। তিনি তাকে হাত ধরে সেই হারিয়ে-যাওয়া পথে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

সে আজ কতদিন আগের কথা, শ্যামা বলে নি আমাকে। কিন্তু বোধ করি বছর পনরোর বেশি নয়। আর তখন তার বয়স বাবাজীর অর্ধেকেরও

কম। কাজেই তিনি কোনদিন শ্যামার দেহ ও মনের দাবি মেটাতে পারেন নি। তবু বাবাজীকে অবলম্বন করে এতকাল মানুষের মতো বেঁচেছিল শ্যামা।

সেই বাবাজী আর নেই। তিনি পুণ্যবান। গঙ্গাসাগরের পথে সাগর দ্বীপের মাটিতে দেহরক্ষা করলেন। কিন্তু শ্যামা! সে এখন কি করবে? কোন্ অবলম্বনকে সম্বল করে সে জীবনের বাকি দিনগুলি বেঁচে থাকবে?

এখন সে আমাদের সঙ্গে সাগরে চলেছে। তাছাড়া যাবেই বা কোথায়? সাগর-স্নান সেরে তাকে ফিরতে হবে আশ্রমে। ফিরতে হবে একা। শুনেছি বেশ বড় আশ্রম, ভাল আয়। কিন্তু বাবাজীর জীবদ্দশায় যারা শ্যামাকে ভক্তি করত, তারা এখন আবার তাকে ভালোবাসতে চাইবে না তো! যদিও বা অত বড় অসম্মান না করে, আশ্রমের সম্পত্তি ঠকিয়ে নিতে বাধা কোথায়? বাবাজীও কাল রাতে শ্যামাকে এই সব আশঙ্কার কথাই বলছিলেন। শ্যামাকে কি আবার পথে নামতে হবে?

"কি অত ভাবছিস মা!" দি'মা শ্যামাকে জিজ্ঞেস করেন। আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে। আমি দি'মার দিকে তাকাই। তিনি তাকিয়ে আছেন শ্যামার দিকে।

"আর কি ভাবব?" শ্যামা তার জলভরা চোখ দুটি মুছে শান্ত স্বরে উত্তর দেয়, "ভাবছি, যে মানুষটা চলে গেল তার কথা আর আমার কথা। কি দুর্ভাগ্য নিয়েই জন্মেছিলাম! যার কাছ থেকে এত নিলাম, শেষ সময়ে তার সামনে থাকতে পারলাম না, এমন কি মুখে একটু গঙ্গাজল পর্যন্ত দিতে পারলাম না!"

"সামনে থাকলেও তা পারতিস না মা। আমি তো সামনে ছিলাম, বুঝতেই পারি নি, কখন তাঁর প্রাণটুকু বেরিয়ে গেছে। বুঝতে পারলে কি আর তোকে ডেকে আনতাম না?" দি'মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়েন।

শ্যামা নীরবে চোখ মোছে। আমিও চুপ করে থাকি।

দি'মা আবার বলেন, "তুই তো ভাগ্যবতী মা, সংসারে কজন স্বামীর শেষ সময়ে কাছে থাকতে পারে! আমার কথাই ভাব্—গিয়েছিল সরকারী কাজে, মারা যাবার তিন দিন পরে খবর এলো।" দি'মা চোখ মোছেন।

শ্যামা তবু নীরব। আমিও কোন কথা পাচ্ছি নে খুঁজে। কি বলব?

একটু বাদে দি'মা-ই আবার বলেন; "সে তো কবে চলে গেছে, কিন্তু দেখ্ আমি আজও আছি, আরও কতকাল থাকব কে জানে? কি সম্বল করে আমি

বেঁচে আছি জানিস ?'' .

"কি ?" শ্যামা জিজ্ঞেস করে।

"আমি সব সময়ে তার কথা ভাবি। আমার মনের জগতে সে আজও বেঁচে আছে।" দি'মা একটু থামেন। তারপরে বলেন, "তাই বলছিলাম মা নিজের কথা না ভেবে তাঁর কথা ভাব্। সেই সঙ্গে সব শোক ভগবানের পায়ে সঁপে দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়া।"

শ্যামা তবু নীরব।

দি'মা আবার শুরু করেন, ''সংসারে তো কেউ চিরকাল থাকে না শ্যামা। একদিন সবাইকেই যেতে হবে। তবু সংসারের পথে সবল পায়ে চলতে হবে এগিয়ে। কালুর বাবা ঐভাবে চলে গেল। কালু তখন ছ'বছরের। তার মুখের দিকে তাকিয়ে সেদিন আমি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। নইলে তখন তো আমার বয়স তোর থেকেও কম।

''কিন্তু নিষ্ঠুর ভগবান তো আমার সে সুখটুকুও সইতে পারলেন না। আমার ষোল বছরের কলেজে-পড়া ছেলেও একদিন আমাকে ছেড়ে চলে গেল।''

''কি হয়েছিল তার ?'' শ্যামা প্রশ্ন করে।

''বোধ হয় টাইফয়েড। ডাক্তার ধরতে পারে নি। উনিশ দিনের জ্বরে ছেলে আমাকে ছেড়ে চলে গেল চিরদিনের মতো।" দি'মা একটু চুপ করে নিজে সামলে নেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সফল হন না। কান্নামেশানো করুণ স্বরে কোনমতে বলেন, ''তবু দেখ্ আমি বেঁচে আছি।'' দি'মা কেঁদে ফেলেন।

শ্যামা তাড়াতাড়ি তাঁর চোখ মুছিয়ে দেয়।

ওরা একটু স্বাভাবিক হতেই আমি দি'মাকে জিজ্ঞেস করি, ''তোমরা কি আজ কিছুই খাবে না ?''

"না বাবা, আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।"

"কিন্তু উনি ? উনিও কি কিছু খাবেন না ?"

"কেন, ও তখন খায় নি !" দি'মা বিস্মিতা।

"না," আমি বলি, "খেতে বসার আগেই তো তুমি গিয়ে খবর দিলে।"

"তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। তাই তোর খাবার কথাটা আমার মনেই পড়ে নি।" দি'মা শ্যামাকে বলেন, ''যাক গে, আমার কাছে সাবু ও

কলা আছে। মেখে দিচ্ছি। তুই একটু খেয়ে নে। আমি বলছি, এতে তোর কোন দোষ হবে না।"

ভেবেছিলাম শ্যামা আপত্তি করবে। কিন্তু সে বলে, "চারটি বেশি করে মাখবেন দি'মা।"

"খুব খিদে পেয়েছে বুঝি ?"

"না, আপনাকেও একটু খেতে হবে।"

"আমাকে…"

"আপনি না খেলে আমি খাব না দি'মা, তা আগেই বলে রাখছি।"

দি'মা আর কোন কথা না বলে তাঁর ঝোলা থেকে সাগু ও বাটি বের করে জলের জন্য গলুইতে চলে যান।

দি'মা চলে যাবার পরে শ্যামাকে বলি, "আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।"

"কেন বল তো ?"

"দি'মাকে খাওয়াবার জন্য নিজে খেতে রাজী হলেন।"

শ্যামা একটু হাসে—ম্লান হাসি। বলে, "নিজের জন্যই আমি খাচ্ছি গোসাঁই ! বাঁচতে তো হবে।" একটু থামে সে। তারপরে সহসা তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করে, "একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না !"

"কি সে কথা ?"

"সে আমাকে এত ভালোবাসত, আর আজ আমাকে এভাবে একা ফেলে চলে গেল ? সে এত নিষ্ঠুর !" শ্যামা ডুকরে কেঁদে ওঠে।

কেটে যায় কিছুক্ষণ। শ্যামা কান্না থামায়। চোখ মোছে। তাকিয়ে থাকে গঙ্গার দিকে। অনন্তকালের গঙ্গা—যে গঙ্গার সঙ্গমে চলেছে শ্যামা।

চুপ করে থাকা ভাল দেখায় না। আস্তে আস্তে বলি, "কেউ কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না। সময় হলে সবাইকে এমনি একা চলে যেতে হয়। ধৈর্য ধরে সেই পরমুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা করাই জীবনের ধর্ম।"

দি'মা ফিরে আসেন। তিনি কলা বের করে সাগু মাখেন। শ্যামাকে দেন, নিজে নেন। ওঁরা খেতে শুরু করেন।

আমি বেরিয়ে আসি বাইরে। গলুইতে এসে বসি।

নৌকো এগিয়ে চলেছে। ডাইনে সাগরদ্বীপের তটরেখা—আঁকা-বাঁকা। কোথাও জনপদ, কোথাও জঙ্গল। কোথাও বা বালিময় বেলাভূমি। মাঝে মাঝে ক্ষেত। এখন শস্যহীন। বাঁয়ে গঙ্গা—মুড়িগঙ্গা। বিক্ষুব্ধ না হলেও

শান্ত নয়। তার সারা অঙ্গে ছোট ছোট ঢেউয়ের প্রলেপ। সামনে ও পেছনে—যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল ঢেউ আর ঢেউ। সীমাহীন জলধির বুক জুড়ে সংখ্যাতীত উর্মিমালা। বার বার কবিগুরুর 'দেবতার গ্রাস' কবিতাটি মনে পড়ছে—

দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।
মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর
খল জল ছল-ভরা, তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁষিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের, লালায়িত মুখ।
হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমূক,
অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন,
সর্ব-উপদ্রবসহা আনন্দভবন
শ্যামলকোমলা, যেথা যে-কেহই থাকে
অদৃশ্য দু বাহু মেলি টানিছ তাহাকে
অহরহ, অয়ি মুগ্ধে, কী বিপুল টানে
দিগন্তবিস্তৃত তব শান্ত বক্ষ-পানে !...'

"রাম রাম বাবুজী, বড়ো সুন্দর বোলেন তো !"

বাস্তবে ফিরে আসি। লজ্জা পেয়ে পেছনে তাকাই। ভুজাওয়ালা আমার আবৃত্তির তারিফ করছে। নিজের অলক্ষ্যেই আবৃত্তি শুরু করে দিয়েছিলাম, ভুজাওয়ালা পেছনে বসে মনোযোগ দিয়ে শুনেছে। শুনেছে আরও অনেকে, যারা গলুইতে বসে আছে, তারা সকলেই। কিন্তু তারিফ করল কেবল ভুজাওয়ালা। কারণটা স্পষ্ট—এখানে সেই একমাত্র অবাঙালী।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ভুজাওয়ালা আবার বলে, "গঙ্গাজী রামজীকা কিরপাবারি—বোলিয়ে বাবুজী, হ্যায় কি নহী ?"

জানি কথাটা রামায়ণের কোথাও লেখা নেই। তবু সমর্থন করতে হয়। ভুজাওয়ালা যে ভক্তিগঙ্গায় ডুব দিয়েছে—রামভক্তি। তার কাছে সবই রাম।

তাই বলি, "ঠিকই বলেছেন, সবই সেই পরম মঙ্গলময়ের করুণাধারা।"

"বহুৎ আচ্ছা বোলিয়েছেন। রামজী আপ্‌কা ভালা কোরবেন, কিরপা কোরবেন।"

ছোট ছোট ঢেউগুলি এসে নৌকোর গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ছে—ফেনার সৃষ্টি করছে। আর সেই স্ফটিক-স্বচ্ছ ভাসমান জলধারার বুকে দিনান্তের শেষ সূর্য রামধনু দিচ্ছে এঁকে।

দি'মা ও শ্যামার খাওয়া হয়ে গেছে। ওরা বাইরে আসে। মুখ ধুয়ে দি'মা চলে যান ভেতরে কিন্তু শ্যামা এসে বসে আমার পাশে। আমারই মতো জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। এ তো কেবল জল নয়, এ যে গঙ্গা—জীবনগঙ্গা।

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই। সহসা শ্যামা জিজ্ঞেস করে, "কি ভাবছ?"

"কিছু না।"

শ্যামা হাসে। বলে, "তা যে সম্ভব নয় গোসাঁই! মানুষের মন কখনই স্থির হয়ে থাকতে পারে না, কিছু-না-কিছু ভাবতেই হয় মানুষকে।" একবার থামে সে। তারপর বলে, "আমি জানি, কি ভাবছ তুমি।"

চমকে উঠি, শ্যামা কি আমার মনের খবর পেয়ে গেছে? কিন্তু সেকথা না জিজ্ঞেস করে কৃত্রিম হেসে বলি, "বলুন তো কি ভাবছিলাম!"

"ভাবছিলে ওঁর কথা। ভাবছিলে, কি আশ্চর্য মানুষের জীবন! কোথাকার মানুষ, কোথায় এসে দেহরক্ষা করলেন! আর কারাই বা তাঁর সেই মহা-প্রয়াণের সাক্ষী হয়ে রইল! কিন্তু এর চেয়ে বরণীয় মৃত্যু যে মানুষের আর হতে পারে না গোসাঁই। তাই তো জ্ঞানীরা বলে গেছেন—

'গঙ্গায়াং জ্ঞানতো মৃত্বা মুক্তিমাপ্নোতি মানবঃ।
অজ্ঞানাদ্ ব্রহ্মলোকং চ যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥
গঙ্গায়াং চ জলে মোক্ষো বারাণস্যাং জলে স্থলে।
অন্তরীক্ষে চ গঙ্গায়াং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে॥'

"গঙ্গাগর্ভে দেহত্যাগে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে আর বারাণসীধামে জলে-স্থলে মৃত্যু হলে মোক্ষলাভ হয়, কিন্তু গঙ্গাসাগরে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যেখানেই মৃত্যু হোক মোক্ষলাভ অবশ্যম্ভাবী।" শ্যামা থামে।

ঠিকই বলেছে সে, মাহাত্ম্যের দিক থেকে গঙ্গাসাগরের স্থান সবার উপরে। সেই সাগরদ্বীপের উপকণ্ঠে গঙ্গাজলে দেহত্যাগ করলেন বাবাজী। পুণ্যকামী

মানুষের এর চেয়ে বরণীয় মৃত্যু আর কি হতে পারে?

কিন্তু আমি তো এ-সব কথা ভাবছিলাম না! শ্যামা কি আমার নাম করে নিজের ভাবনা ব্যক্ত করল? হয়তো তাই, কিন্তু বলি না সে-কথা। বরং এবারে সত্যি সত্যি বাবাজীর ভাবনা পেয়ে বসে আমাকে। আপন মনে ভেবে চলি—বাবাজী চলে গেলেন, কিন্তু তিনি তো কিছুই সঙ্গে নিয়ে গেলেন না। যা যেমন ছিল, তেমনি আছে। কেবল তিনি নেই। যে শ্যামাকে রক্ষা করার জন্যে সকলের সকল উপহাস উপেক্ষা করে বৃদ্ধ বয়সে তিনি একটি কন্যাসম শিষ্যার সঙ্গে কণ্ঠীবদল করেছিলেন, সেই শ্যামাকে একা রেখে আজ তাঁকে চলে যেতে হল। চলে যেতে হল তাঁর সাধের আশ্রমকে ছেড়ে, প্রিয় শিষ্য-শিষ্যাদের ছেড়ে, সুন্দর এই পৃথিবীকে ছেড়ে। কিন্তু এত সব ছেড়ে তিনি কোথায় গেলেন?

জানি না। কেউ জানে না। মনে পড়ছে শঙ্করাচার্যের সেই অমর

‘কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ।
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥’

কিন্তু আমি এ-সব কথা ভাবছি কেন? আমি চলেছি ভক্তি আর ভালোবাসা, ভোগ আর ত্যাগ, আশা আর নিরাশার মিলনভূমি সাগরমেলায়। সেখানে কতশত শ্যামা আসবে। তাদের কত সুখ, কত দুঃখ দেখতে হবে। এক শ্যামার শোকে এমন বিচলিত হয়ে পড়লে যে আমার মেলায় যাওয়াই বৃথা হবে।

তবে কি আমি নিজেকে শ্যামার কাছ থেকে সরিয়ে নেব দূরে! না, তারই বা কি প্রয়োজন? শ্যামা সেই সুবিশাল জনসমুদ্রের একটি বারিকণা, যে মহা-সিন্ধুর মাঝে আমি নিজেকে ভাসিয়ে দিতে চাই!

সহসা শ্যামা বলে ওঠে, “তুমি এমন চুপ করে আছ কেন গোসাঁই, আমি যে আর অবাধ্য মনটার সঙ্গে পেরে উঠছি না। কেবল তাঁর কথা মনে পড়ছে, তাঁর ভাবনা ভাবতে হচ্ছে। এমন হতে থাকলে, আমি যে পাগল হয়ে যাব। তার চাইতে তুমি অন্য কোন কথা বল, আমি শুনি।”

কথাটা আমারই খেয়াল হওয়া উচিত ছিল। তাই তাড়াতাড়ি বলি,

"বেশ, বলছি শুনুন।"

"কি বলবে?"

"সাগরদ্বীপের কথা।"

"বল।" শ্যামা আমার আরও কাছে এগিয়ে আসে।

বলতে শুরু করি—"গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের মোহনায় অবস্থিত সাগরদ্বীপ, ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত একটি চতুর্ভুজাকৃতি ভূখণ্ড। উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। আগে দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় তিরিশ মাইল। সাগরের ঢেউয়ে ভেঙে ভেঙে এখন দাঁড়িয়েছে মাত্র মাইল বিশেক। পুব থেকে পশ্চিম প্রান্তের দূরত্ব মাত্র পাঁচ-ছয়, মাইল, কোথাও বা সামান্য বেশি। এটিই দ্বীপের প্রস্থ। সাগরদ্বীপ যে এককালে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল তার বহু প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে।"

"যেমন?" মাঝখান থেকে শ্যামা প্রশ্ন করে। মনে যাই থাক্, বাহ্যিক ব্যবহার ও কথাবার্তায় সে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

খুশি হয়ে তার প্রশ্নের উত্তর দিই, "এই দ্বীপে সুমতিনগর নামে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। সেখানে পুরাকালের মৃৎপাত্র ও কারুকার্যখচিত ছোট ছোট ইট পাওয়া গেছে। আর মাটির সাড়ে ছয় ফুট নিচে পাকাবাড়ি তৈরি করার জন্য চৌবাচ্চা এবং বাঁধানো চাতাল আবিষ্কৃত হয়েছে।

"এই দ্বীপের বেগুয়াখালি মৌজার মহিষামারী গ্রামে নেত্র দাস নামে জনৈক গৃহস্থের বাড়িতে মাটির নিচে প্রায় দশ ফুট লম্বা একটি নৌকো এবং একজোড়া পাতকুয়া পাওয়া গেছে। জোড়া পাতকুয়া সেকালের বর্ণ বৈষম্যের পরিচায়ক।

"সাগরদ্বীপের মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত হরিণবাড়ি গ্রামেও মাটির নিচে ছোট ছোট ইট দিয়ে তৈরি বাড়ির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

"মন্দিরতলা গ্রামের কাছে নদী থেকে ক্ষুদ্রাকৃতি সোনার ইট, মুঘল আমলের স্বর্ণমুদ্রা ও নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার পাওয়া গেছে। সেকালে ওখানেই নাকি এক রাজপ্রাসাদ ছিল, পরে সেটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

"মন্দিরতলা মন্দিরের কাছে এক বাড়ি থেকে ছোট একটি কারুকার্যময় প্রাচীন শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়েছে। এই গ্রামেই পুকুর কাটতে গিয়ে একটা বিরাটকায় নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে। কলকাতার কোন এক সংস্থা সেখান থেকে বহু দেবদেবীর মূর্তি নিয়ে গেছেন। শুধু সাগরদ্বীপে নয়, এই

দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন স্থানে জঙ্গল পরিষ্কারের সময় এমন সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গেছে যা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ·····"

"এ কি! থামলে কেন?" শ্যামা বলে ওঠে।

"ইংরেজীতে বলব?" আমি শ্যামাকে পরীক্ষা করতে চাই।

শ্যামা বলে, "বুঝতে পারব কি?"

"মনে হচ্ছে পারবেন।"

শ্যামা আমার দিকে তাকায়। আমার চোখে চোখ পড়ে তার। সে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলে, "বেশ বল।"

আমি আবার শুরু করি, "বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ David McCutchion তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, 'The Sundarban forests were once a settled and flourishing area, subsequently transformed into swamps and jungle by a rise in the water level......Not only temples, but many ancient statues, including rare Pala bronzes have been discovered......' "

"আশ্চর্য ব্যাপার তো!" শ্যামা মন্তব্য করে।

হেসে বলি, "এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ এই সাগরদ্বীপেই ছিল বাংলার প্রাচীনতম মহানগরী ও বন্দর।"

"তাই নাকি! শুনি নি তো কখনও?"

"কারণ, শুনতে চান নি কারও কাছে।"

"বল না একটু।"

"একটু নয়, সে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস।" হেসে বলি।

শ্যামা তবু অনুরোধ করে, "তা হোক গে, সংক্ষেপে একটু বলো না, আমার বড্ড শুনতে ইচ্ছে করছে।"

"বেশ শুনুন।" আমি বলতে শুরু করি, "বাংলাদেশের সভ্যতা সুপ্রাচীন, আর সে সভ্যতার জন্মভূমি এই বদ্বীপ-বাংলা। প্রাক্-আর্যযুগে বাংলা অনার্যভূমি ছিল, কিন্তু সেকালের বাঙালীরা অসভ্য ছিলেন না। দুর্ভাগ্যের কথা খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দের আগের ইতিহাস আজও আমরা জানতে পারি নি।"

"না পারো গে, তুমি তার পরের ইতিহাস বলো, তাতেই আমার চলে যাবে।" শ্যামা গম্ভীর স্বরে ফরমাশ করে।

সহাস্যে বলি, "তবে অনুমান করা যায় যে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের পর

ধীরে ধীরে গঙ্গাতীর দিয়ে আর্যসভ্যতা প্রাচ্যদেশ তথা পূর্বভারতে বিস্তৃত হতে থাকে। এখনকার বাংলা বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ ও উড়িষ্যার পূর্বাঞ্চল নিয়ে ছিল তখনকার প্রাচ্যদেশ। তখনকার নাম ছিল মিথিলা, পোণ্ড্রবর্ধন ও বঙ্গ। প্রয়াগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই দেশ। রাজা দশরথের আমলে বঙ্গ অযোধ্যা-রাজমণ্ডলের একটি প্রধান রাজ্য ছিল। আর সেই অধিকারে আজও অযোধ্যাবাসীরা সাগরমেলার প্রণামী অযোধ্যায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন।"

"জানি।" শ্যামা বলে।

আমি বলতে থাকি, "গ্রীক ও লাতিন লেখকদের কৃপায় খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের বাংলার কিছু ইতিহাস আমরা জানতে পেরেছি। তবে তাঁরা কিন্তু বাংলাকে প্রাচ্য কিম্বা বঙ্গ বলে উল্লেখ করেন নি। বলেছেন, গঙ্গারিডি বা গঙ্গাহৃদি (Gangaridae) অর্থাৎ গঙ্গারাঢ়ী বা গঙ্গারাষ্ট্র। অনেকের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে যে যৌধেয় বা যাদবজাতীয় আর্যগণ বঙ্গদেশে আসেন, তাঁরাই পরবর্তীকালে গঙ্গারিডি বলে পরিচিত হন।

"গ্রীকদূত মেঘাস্থিনিস মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় ছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকেই আমরা প্রথম গঙ্গারিডি রাজ্যের নাম জানতে পারি। এটি খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের বিবরণ।

"মেগাস্থিনিস এবং দিয়োদরস-য়ের বিবরণ থেকে জানা যায় যে গঙ্গারিডি অতিশয় শক্তিশালী রাজ্য ছিল। আলেকজাণ্ডারের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে মাতৃভূমি রক্ষা করার জন্য গঙ্গারিডি ও প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ বিরাট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা দু লক্ষ অশ্বসেনা, আশি হাজার পদাতিক, আট হাজার যুদ্ধরথ এবং ছ হাজার হাতি নিয়ে আলেকজাণ্ডারকে প্রতিহত করবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকলেন। আলেকজাণ্ডার কিন্তু এলেন না। তিনি গঙ্গারিডি রাজ্যের এই যুদ্ধপ্রস্তুতির কথা শুনে বিপাশার অপর তীর থেকে ফিরে গিয়েছিলেন। ভালই করেছিলেন, নইলে হয়তো আজ বিশ্বের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত। কিন্তু বাংলা যে বিশ্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডারের বিজয়-অভিযান স্তব্ধ করে দিয়েছে, একথা ইতিহাস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

"গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজধানী ছিল গঙ্গে বা গঙ্গারেজিয়া। এই নগরী তৎকালীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল। বুদ্ধদেবের সময় এই গঙ্গে বা গঙ্গাবন্দর থেকেই বিজয়সিংহ তাম্রপর্ণী তথা লঙ্কাদ্বীপে যাত্রা করেছিলেন। বিশ্বের ইতিহাসে বিজয়সিংহ বোধ করি প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন।

আর পরবর্তীকালে তাঁরই আদর্শ ও সাহসিকতায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতীয়রা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন।

"মহারাজ অশোকের শিলালিপিতে রাষ্ট্রকূট নামে এক জাতির উল্লেখ আছে। অশোক সম্ভবত রাষ্ট্রকূট বলতে গঙ্গারিডি জাতির কথাই বলেছেন। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৩ থেকে ২৩২ অব্দ পর্যন্ত অশোকের রাজত্বকাল।

"খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের লাতিন ও গ্রীক লেখকদের* রচনা থেকে জানা যায় যে গঙ্গারিডির রাজধানী গঙ্গাবন্দর থেকে রোমে মসলিন রপ্তানি হ'ত এবং এই বন্দরের কাছেই সোনার খনি ছিল। ফা হিয়েন বলেছেন, তাঁর তিন-চার শ' বছর আগে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে গঙ্গাবন্দরের সঙ্গে রোমের নিয়মিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। টলেমি বলেছেন, গঙ্গারিডি রাজ্য ভাগীরথীর পূর্বতীরে অবস্থিত ছিল।**

"পরবর্তীকালের অনেক কথাই আমরা ভারতীয় রাজাদের শিলালিপি ও লেখকদের রচনা থেকে জানতে পারি। কিন্তু তাঁরা কেউ গঙ্গারিডি বা গঙ্গারাষ্ট্র নামটির উল্লেখ করেন নি। মনে হয় গুপ্তযুগের আগেই গঙ্গারিডি রাজ্য বিভক্ত হয়ে যায়। তাই মহাকবি কালিদাস 'রঘুবংশ' কাব্যে বঙ্গ ও সুহ্মাদের কথা বলেছেন। তাঁরাই গঙ্গারিডি বা গঙ্গাজাতির উত্তরপুরুষ। কালিদাসের রচনাকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী। তিনি গাঙ্গেয় বদ্বীপকে বঙ্গভূমি বলেছেন।

"বৌদ্ধধর্মের বহু আগে বঙ্গদেশে জৈনধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। চব্বিশ জন জৈন তীর্থঙ্করের মধ্যে তেইশ জনের সঙ্গে বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

"স্বাভাবিক ভাবেই বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করে। বুদ্ধদেব নিজে বদ্বীপ বাংলায় এসে ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

"কালক্রমে মহারাজ শশাঙ্ক বঙ্গদেশের বৃহত্তর অংশের রাজা হন। তিনি শৈব ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের নানাস্থানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময় সমুদ্রপথে বহু বাঙ্গালী বালী, সুমাত্রা, লম্বক ও কম্বোজ প্রভৃতি দেশে গিয়ে শৈবমত প্রচার এবং শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। আর তারই ফলে পরবর্তীকালে কম্বোজ তথা কম্বোডিয়ার বিশ্ববিখ্যাত 'আঙ্কর-ভাট্'

Periplus of the Erythraean sea—circa 80 A.D.; Ptolemy—2nd Century A.D.

** বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

নির্মিত হয়।

"এই সমস্ত পরিবর্তন ও প্রগতিতে গঙ্গাসাগর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। পরবর্তীকালের ইতিহাসে এই বন্দরের কথা আমরা জানতে পারি য়ুয়ান চোয়াঙের বিবরণ থেকে। মহারাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে তিনি এদেশে এসেছিলেন। তখন গঙ্গারিডি রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল—যেমন কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপি ও সমতট। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে গাঙ্গেয়-বদ্বীপ সমতট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবার কেউ বা বলছেন গাঙ্গেয় বদ্বীপ তখন ছিল বঙ্গরাজ্য এবং বঙ্গ ও সমতট পাশাপাশি অবস্থিত দুটি পৃথক রাজ্য ছিল।*

"সে যাই হোক, এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা কিন্তু সকলেই একমত যে তখনও গঙ্গে বা গঙ্গানগর পূর্ব-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যবন্দর। আর সে নগর ছিল এই সাগরদ্বীপে—গঙ্গাসাগরে।"

"গঙ্গাসাগরে!" শ্যামা বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ, অধ্যাপক ডি. সি. সরকার তাঁর 'Studies in the Geography of ancient and medieval India' বইতে বলেছেন যে 'The location of the city of Ganga, capital of the Gangians or Vangas, in the vicinity of the confluence of the Ganga and the Sagara suggests that it was no other than the celebrated holy city of Gangasagara or Gangasagara-sangama mentioned in Indian literature,' আর সেই মহানগরী প্রাক্-গুপ্তযুগ থেকেই একটি পুণ্যতম সর্বভারতীয় তীর্থে পরিণত হয়েছিল।"

"তাহলে কি সেই সমৃদ্ধ প্রাচীন শহরটি এই দ্বীপে মাটির নিচে চাপা পড়ে রয়েছে?" আমি থামতেই শ্যামা প্রশ্ন করে।

উত্তর দিই, "সমস্ত শহরটা হয়তো নেই, কারণ সেকালের সাগরদ্বীপ অনেক বড় ছিল। তার বৃহত্তর অংশ ভেঙে গেছে। তাছাড়া নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হওয়ায় দ্বীপের অবস্থানেরও পরিবর্তন হয়েছে। তবে প্রাচীন গঙ্গানগরের কিছু অংশ যে এখনও এই দ্বীপে মাটির নিচে রয়েছে, তাতে কোন

---

*যশোহর-খুলনার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)—সতীশচন্দ্র মিত্র এবং সুন্দরবনের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—আবুল ফজল মোহম্মদ আব্দুল জলীল।

সন্দেহ নেই।"

"খনন করা হচ্ছে না কেন?"

"স্বদেশের ইতিহাসের প্রতি আমরা খুব বেশি শ্রদ্ধাশীল বলে।"

আমার উত্তর শুনে শ্যামা একটু হাসে। সে বোধ করি বুঝতে পারে যে এ ধরণের প্রশ্ন করা অর্থহীন। তাই সে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে। বলে, "যাক্ গে সে কথা, তুমি তার চেয়ে একালের সাগরদ্বীপের কথা বল।"

আমি আবার শুরু করি, "সাগরদ্বীপ ও তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চল যে পরবর্তী কালেও সমৃদ্ধ জনপদ ছিল, তারও অনেক প্রমাণ আমাদের হাতে এসেছে। সে-সব প্রমাণের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, জয়নগরের নিকটবর্তী মালয় ও বকুলতলা গ্রাম থেকে পাওয়া খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী ও মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের তাম্রলিপি, কাশীপুরের ভাস্কর্য এবং ১১৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত রাক্ষসখালির সেই বিখ্যাত তাম্রলিপি। রাক্ষসখালির লিপিখানি সত্যই দেখবার মতো।"

"তুমি দেখেছ?" শ্যামা প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ। কলকাতার যাদুঘরে আছে, আপনিও একদিন গিয়ে দেখে আসতে পারেন।"

শ্যামা হাসে। বলে, "আমার দেখে কি লাভ? যাক গে, তুমি সাগর দ্বীপের কথা বল।"

"রাক্ষসখালিতে প্রাক্-মুসলমানযুগের কতগুলি পোড়ামাটির শীলমোহরও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব পৌরাণিক স্মৃতিচিহ্নগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে সুদূর অতীত থেকেই সাগরদ্বীপ ও তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চল বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও বাণিজ্যিক জীবনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে আর সে প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল মহারাজা প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকাল পর্যন্ত।

"প্রতাপাদিত্যের পতনের পরে সাগরদ্বীপেরও পতন ঘটে। কিন্তু তারপরেও বহুকাল বিদেশী বড় বড় জাহাজগুলি সাগরদ্বীপের উপকণ্ঠে এসে নোঙর করত। যাত্রীরা পানসি নৌকোতে চড়ে কলকাতায় যেতেন।"

"পানসি নৌকো?" শ্যামা প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ।" উত্তর দিই, "জলমগ্ন চড়ার ভয়ে তখন বড় জাহাজ কলকাতায় যেত না।"

"তখনও গঙ্গায় চড়া ছিল?"

"ছিল বৈকি এবং তা ছিল আরও মারাত্মক, কারণ এখনকার মত তাদের

নাড়ীনক্ষত্র জানা ছিল না তখন।”

“কিন্তু পানসিতে সাগরদ্বীপ থেকে কলকাতায় যেতে কদিন লাগত?”

“দিন দুয়েক।”

“মাত্র!”

“হ্যাঁ, অন্তত উইলিয়াম হিকির স্মৃতিকথা থেকে তো তাই জানতে পারি।”

“উইলিয়াম হিকি! তিনি আবার কে?”

“তদানীন্তন কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের একজন এটর্ণী। তিনি ১৭৭৭ সালের ১লা নভেম্বর দুপুরে মাদ্রাজ থেকে সাগরদ্বীপে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেজর মেস্টেয়ার ও কর্ণেল ওয়াটসন। এই ওয়াটসনই পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় খিদিরপুর ডক নির্মাণ করেন।

“সে যাই হোক, তাঁরা সেদিন বেলা দুটোর সময় পানসিতে সাগরদ্বীপ থেকে কলকাতা রওনা হন। ছজন লোক দাঁড় বাইছিল, পানসি চলছিল খুবই তাড়াতাড়ি। সন্ধ্যা ছ'টার সময় তাঁরা কুলপিতে পৌঁছলেন। একটা সরাইখানায় রাত কাটালেন। মাছ মুরগী ডিম ও মদ সহযোগে খাওয়া খুবই ভাল হয়েছিল, কিন্তু মশার কামড় ও শেয়ালের ডাকের জন্য ভাল ঘুম হয় নি।

“পরদিন জোয়ার এলো বেলা দশটায়। প্রাতরাশের পর তাঁরা আবার পানসি ছেড়ে দিলেন। ধারণা ছিল, সেদিনই সন্ধ্যায় গার্ডেনরীচে কর্ণেল ওয়াটসনের বাড়িতে পৌঁছতে পারবেন। কিন্তু হঠাৎ উত্তুরে হাওয়া বইতে শুরু করায় মাঝিরা শ্রান্ত হয়ে পড়ল। সে-রাত কাটাতে হল উলুবেড়িয়ায়। উলুবেড়িয়া তখন নিতান্তই একটি গণ্ডগ্রাম। তবু তাঁদের মাংস-ভাত জুটে গেল।

“পরদিন খুব ভোরে রওনা হয়ে সকালে তাঁরা গার্ডেনরীচ পৌঁছলেন। গঙ্গাবক্ষ থেকে কলকাতাকে দেখেই, কলকাতার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন উইলিয়াম হিকি। তিনি তাঁর ‘মেমোয়ার্স অব্ উইলিয়াম হিকি’ (১৭৪৯-১৮০৯ খ্রীঃ) গ্রন্থে গার্ডেনরীচের বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখে গেছেন, ‘চারিদিকে গাছপালা—যেন সবুজের বন্যা নেমেছে। নিসর্গে কেবল সবুজের ঢেউ, যেন রঙের তুফান উঠেছে। এরকম অপূর্ব দৃশ্য দেখব, বিশেষ করে বাংলার মতন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, কল্পনা করি নি কখনও'।”*

* সুতানুটি সমাচার—শ্রীবিনয় ঘোষ।

"তিনি কতদিন কলকাতায় ছিলেন ?" শ্যামা জিজ্ঞেস করে।

সাগরদ্বীপের আলোচনায় এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। তবু শ্যামাকে অন্যমনস্ক করে রাখার জন্য বলি, "প্রায় একত্রিশ বছর, অর্থাৎ তাঁর পরবর্তী কর্মজীবন। ১৮০৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তিনি কলকাতা থেকে দেশে ফিরে যান। এর মধ্যে দু'বার ইংলণ্ডে যাওয়া ছাড়া বাকি সমস্ত সময়টাই কলকাতায় কাটিয়েছিলেন।"

"তিনি বিয়ে-থা করেন নি ?"

"করেছিলেন।" আমি উত্তর দিই। "তাঁর স্বদেশীয়া স্ত্রী শার্লতে ১৭৮৩ সালের ২৫শে ডিসেম্বর অসুখে মারা যান। ১৭৯১ সালের মার্চ মাসে তিনি জমাদারণী নামে একটি সুন্দরী চালাক-চতুর হিন্দুস্থানী মহিলার সঙ্গে আবার সংসার পাতেন। দুঃখের কথা মাত্র পাঁচ বছর বাদে ১৭৯৬ সালের ৪ঠা আগস্ট একটি পুত্রসন্তান প্রসবের পরে তিনিও মারা যান। এক বছরের মধ্যে ছেলেটিও মরে যায়।" আমি চুপ করি, কিন্তু শ্যামা নীরব। বুঝতে পারছি নিঃসন্তান বিপত্নীক হিকির জন্য তার মমতা-মাখানো মন কেঁদে উঠেছে। আর হয়তো সে নিজে সন্তানহীনা বলেই আঘাতটা একটু বেশি গুরুতর হয়েছে।

তাই তাড়াতাড়ি বলতে শুরু করি, "একত্রিশ বছর পরে হিকি যখন দেশে ফিরে যান, তখনও তেমনি পানসিতে করেই তিনি কলকাতা থেকে সাগরদ্বীপে এসেছিলেন। ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৮০৮ খ্রীঃ) গার্ডেনরীচ ঘাট থেকে নৌকোয় রওনা হয়ে ফলতায় রাত্রিবাস করেন। পরদিন সাগরদ্বীপে এসে 'ক্যাসল ইডেন' জাহাজে ওঠেন।"

শ্যামা তবু নীরব। বাধ্য হয়ে বলি, "আপনি তাহলে চুপচাপ জলের দিকে তাকিয়ে থাকুন, আমি ভেতরে যাই।"

"বা রে !" শ্যামা বলে ওঠে, "এরই মধ্যে সাগরদ্বীপের কথা হয়ে গেল ?"

"না।"

"তাহলে বলছ না যে বড় !"

"না শুনলে বলব কাকে ?"

"ও। আচ্ছা তুমি বল, এবারে মন দিয়ে শুনব—খুব মন দিয়ে।"

"তখন খিদিরপুর ডক নির্মিত হয়েছে। গঙ্গার পরিবহণ ক্ষমতাও নিশ্চয়ই এখনকার মতো খারাপ ছিল না, আর ইতিমধ্যে নিমজ্জমান চড়াগুলি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের কিছু জ্ঞান হয়েছিল। তবু সমুদ্রগামী অধিকাংশ বড় জাহাজ

সাগরদ্বীপ পর্যন্তই যাতায়াত করত। কিন্তু জনপদ হিসেবে সাগরদ্বীপের কোন মূল্য তখনও ছিল না। জাহাজঘাট হিসেবে যতটুকু মূল্য ছিল, তাও কমে গেল পরবর্তীকালে। কারণ কিছুকাল পরেই জাহাজগুলি কলকাতা পর্যন্ত যাতায়াত শুরু করে। ফলে বাংলার পরিবহণেও সাগরদ্বীপ তার মূল্য হারিয়ে ফেলে। যে স্থান একটি শ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক বন্দরে পরিণত হতে পারত, তা একটি অস্বাস্থ্যকর বনময় প্রান্তরে রূপান্তরিত হল। সামান্য যে কয়েকটি পরিবার এই দ্বীপে বাস করত, তারাও নদী পেরিয়ে তমলুক কিংবা কাকদ্বীপে চলে গেল।

"তবে ইংরেজ শাসকরা সাগরদ্বীপকে অবহেলার চোখে দেখেন নি। ১৮১১ সালেই তাঁরা এখানে বন কেটে বসত গড়ার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। জোনস্ নামে জনৈক য়ুরোপীয়কে সাগরদ্বীপের জমি বন্দোবস্তের জন্য দশ বছরের মেয়াদে পাট্টা দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি কিছুই করতে পারেন না।

"তাঁর পরে বিউমণ্ট নামে আর একজন ব্যবসায়ী চামড়ার কারখানা করার জন্য সাগরদ্বীপের একশ' একর জমি চেয়ে একখানি দরখাস্ত করেন। সেই সঙ্গে তিনি সরকারকে অনুরোধ করলেন, শিকারীদের যেন নির্দেশ দেওয়া হয় যে তাঁরা চামড়াগুলো তাঁর কারখানা থেকে পাকা করিয়ে নেবেন।

"১৮১৩ সালে বোর্ড অব রেভিনিউ তাঁর দরখাস্ত মঞ্জুর করেন। তাঁরা বিউমণ্টকে ভবিষ্যতে আরও সুযোগ-সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। তার পরের বছর বিউমণ্ট চাষের জন্য কিছু জমি চেয়ে আর একখানি দরখাস্ত করেন। কিন্তু সে দরখাস্ত মঞ্জুর করা হল না। কারণ সরকার তখন স্থির করেছিলেন যে কোন অভারতীয়কে এদেশে চাষের জমি দেওয়া হবে না। ফলে শেষ পর্যন্ত বিউমণ্ট-এর প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে গেল।

"১৮১৮ সালে আড়াই লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে 'সাগরদ্বীপ সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হল। তৎকালীন চব্বিশ পরগণার কালেক্টার মিঃ ট্রাওয়ার সহ বহু বিশিষ্ট ইংরেজ এবং ভারতীয় এই সমিতির অংশীদার ছিলেন। মিঃ ট্রাওয়ার ১৮১৯ সালে সাগরদ্বীপ পরিদর্শনে এলেন। তাঁর নামানুসারে দ্বীপের মধ্যাঞ্চলের নাম রাখা হল 'ট্রাওয়ার ল্যাণ্ড'।

"সমিতি সরকারের কাছে সাগরদ্বীপ উন্নয়নের পরিকল্পনা পেশ করে জমি চাইলেন। ১৮১৯ সালের ১০ই জুন সে দরখাস্ত মঞ্জুর হল। সরকার ১৮২০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে প্রথম তিরিশ বছর বিনা খাজনায় ও তারপরে

বিঘা প্রতি বাৎসরিক চার আনা খাজনায় সাগরদ্বীপ তাঁদের ইজারা দিলেন।

"প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজ আরম্ভ হল। নানা অদৃষ্টপূর্ব বাধায় কাজ ব্যাহত হতে থাকল। সব চেয়ে বড় বাধা এলো সমুদ্রের কাছ থেকে। বন কেটে ফেলার পরে দেখা গেল, বিক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরের তরাঙ্গাঘাত সহ্য করবার শক্তি সাগরদ্বীপের মাটির নেই।

"আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল না। তবু সকল বাধাকে উপেক্ষা করে কাজ চলল এগিয়ে। ১৮২০ সালের ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে অর্থাৎ প্রথম আট মাসে প্রায় চার বর্গমাইল জমি উদ্ধার হল। কিন্তু নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা এখানে এসে বাস করতে সম্মত হল না। তাই সমিতি সুদূর আরাকান থেকে পঁচিশটি মগ পরিবার নিয়ে এলেন। সঙ্গমের কাছে দুটি খাঁড়ির ধারে বসতি স্থাপন করলেন তাঁরা। তাঁদের যাতায়াতের জন্য একটি পথ তৈরী হল। সাগরদ্বীপ জনহীন হয়ে পড়ার পরে, ইংরেজদের চেষ্টায় এইভাবে আবার সেখানে জনবসতি গড়ে উঠল। ধীরে ধীরে আরও মানুষ এসে বাসা বাঁধল তার বুকে। ক্রমেই সে জনবহুল হয়ে উঠতে থাকল।

"কিন্তু সহসা প্রকৃতি বাদ সাধলেন। ১৮৩৩ সালে প্রবল ঘূর্ণিঝড় এসে প্রচণ্ড আঘাত হানল সাগরদ্বীপকে। সোসাইটির সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে গেল। এত বড় লোকসান সামলাতে পারলেন না তাঁরা। তাই সোসাইটি তুলে দিলেন।

"তাঁরা হার মানলেন কিন্তু মানুষ হার মানল না। হেয়ার, ম্যাক্‌ফারসন, হাণ্টার ও ক্যাম্বেল নামে চারজন য়ুরোপীয়ান সোসাইটির পরিত্যক্ত পরিকল্পনাকে পুনরায় বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য এগিয়ে এলেন। ১৮৩৪ সাল থেকেই চার বন্ধু কাজ শুরু করে দিলেন। জঙ্গল পরিষ্কার ও জনপদ গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরির কাজও হাতে নিলেন।

"কিছুকালের মধ্যেই লবণ উৎপাদনের জন্য সাগরদ্বীপ সুবিখ্যাত হয়ে উঠল। ব্যবসা ও বৃত্তির আকর্ষণে আবার দলে দলে মানুষ এসে বাসা বাঁধল সাগরদ্বীপে।

"প্রকৃতি কিন্তু মানুষের এই জয়যাত্রাকে অব্যাহত রাখতে চাইলেন না। বার বার আঘাত হানতে থাকলেন। ১৮৪২ সালের জুন ও ১৮৪৮ সালের অক্টোবরে ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল সাগরদ্বীপের ওপর দিয়ে। তা সত্ত্বেও কাজ

চলল। সৃষ্টিকামী মানুষ প্রকৃতির ধ্বংসলীলার কাছে আত্মসমর্পণ করল না।

"তবু বাধা এলো। প্রকৃতি নয়, মানুষের কাছ থেকেই। সরকার ব্যক্তিগত মালিকানায় সাগরদ্বীপে লবণ উৎপাদন বন্ধ করে দিলেন। তাঁরা এখানে একটি সরকারী লবণ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলতে চাইলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মিঃ ফ্রেজার এবং বাবু ইউ. কে. সেন সাগরদ্বীপ পরিদর্শনে এলেন। তখন এই দ্বীপকে আজিমাবাদ মহকুমার অন্তর্গত দক্ষিণ-সাগর পরগণা (Pergunnah Duckyn Sugur) বলা হত। মধুসূদনপুর ছিল প্রধান গ্রাম। সেখানে ছিল একটি ছোট থানা আর মাত্র ৩.১৬৪ বর্গ-মাইল বাসোপযোগী জমি। পনেরোটি মৌজায় বিভক্ত ছিল সেই ক্ষুদ্র পরগণা। জনসংখ্যা মাত্র ৪৯২ জন। একটি পাকা ও ৪৮২টি কাঁচা বাড়ি ছিল সমস্ত পরগণায়। গড়ে প্রতি বাড়ির জনসংখ্যা মাত্র ৩.২২ জন।*

"মানুষ যেমন সাগরদ্বীপ উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলে, প্রকৃতি তেমনি বাধা দিতে থাকেন। ১৮৫২ সালে আবার ঘূর্ণিঝড় হল। তবু সাগরদ্বীপে জনবসতি বেড়েই চলল। আর তাই বোধ করি প্রকৃতি মরীয়া হয়ে উঠলেন। ১৮৬৪ সালে চরম আঘাত হানলেন। সেবারের ধ্বংসলীলা ১৮৩৩ সালের প্রচণ্ডতাকেও ছাপিয়ে গেল। মানুষের সকল সৃষ্টিকে প্রকৃতি সাগরদ্বীপের মাটি থেকে নিঃশেষে মুছে ফেললেন। ৪১৩৭ জন অধিবাসীর মধ্যে মাত্র ১৪৮৮ জন কোনমতে প্রাণরক্ষা করতে পারলেন। মহামারী ও অনাহারের ভয়ে তাঁরাও পালিয়ে গেলেন। জনহীন মহাশ্মশানে পরিণত হল সাগরদ্বীপ।

"আর তারই ফলে সাগরমেলাও জনপ্রিয়তা ফেলল হারিয়ে। ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে বলা হয়েছে, কয়েক বছর সাগরমেলায় মাত্র হাজার পাঁচেক লোক যোগদান করেছে। অবশ্য এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে কিছুকালের মধ্যেই আবার পঞ্চাশ হাজারে দাঁড়ায়।

"সেই 'ক্যালকাটা রিভিউ' থেকে আমরা প্রায় একশ' বছর আগেকার গঙ্গাসাগর মেলার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাই।"

"কি রকম?"

---

* Statistical and Geographical Report of Twentyfour Pergunnahs by Major Ralph Smythe—1857.

শ্যামার প্রশ্নে থামতে হয় আমাকে। সে তাহলে মন দিয়েই আমার কথা শুনছে। খুশিমনে জবাব দিই, "তখনও সঙ্গমের বালুকাবেলায় মেলা বসত। হোগলা ও গাছের ডালপালা দিয়ে সারি সারি ঝুপরি তৈরি করা হত। সওদাগর ও সাধুরা পাশাপাশি ঝুপরিতে নিজ নিজ ব্যবসা চালাতেন। ময়লা অপসারণ ও জল নিষ্কাষণের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ফলে মেলায় প্রতিবারই মহামারী দেখা দিত। আর মেলার পরে তা ছড়িয়ে পড়ত সারা দেশে।"

"তা সাগরদ্বীপে আবার কবে থেকে চাষবাস শুরু হল?"

"বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে।" উত্তর দিই। বলি, "জীবিকার প্রয়োজনে তমলুক ও কাকদ্বীপের মানুষ আবার এসে বাসা বাঁধেন এই দ্বীপে। সরকারের কাছ থেকে জমি বন্দোবস্ত করে নিয়ে তাঁরা এখানে চাষবাস করতে থাকেন। সরকার তাঁদের নানাভাবে সাহায্য করেন। উৎসাহিত হয়ে আরও দলে দলে লোক আসতে থাকেন। আস্তে আস্তে জনসংখ্যা বেড়ে চলে। ১৯১১ সালে কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ এখানে স্থায়ী বাতিঘর নির্মাণ করেন। যাতায়াতের ব্যবস্থাও উন্নত হয়। ফলে যেমন দ্বীপের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়, তেমনি সাগরমেলাও তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করে।

"তারপর এলো ১৯৩০ সাল। কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মী পুলিসের দৃষ্টি এড়াবার জন্য পালিয়ে এলেন সাগরদ্বীপে। মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপের দিকে ইংরেজ পুলিসের তেমন নজর ছিল না। তাছাড়া তখন এখানে জনসংখ্যার তুলনায় বেশি ফসল উৎপন্ন হত। প্রচুর মাছ ও দুধ পাওয়া যেত। আর মানুষগুলিও ছিল বড়ই সরল। কাজেই সেই পলাতক রাজনৈতিক কর্মীরা বেশ বহালতবিয়তেই সাগরদ্বীপে বাস করতে থাকলেন।

"দেশের জন্য যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের পক্ষে খেয়ে আর শুয়ে সময় কাটানো সম্ভব নয়। তাই তাঁরা সমাজসেবায় মনোনিবেশ করলেন। সাগরদ্বীপের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করলেন। শিক্ষাপ্রসারের সাধনায় রামকৃষ্ণ মিশনও এগিয়ে এলেন।

"তাঁদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। এখন সাগরদ্বীপে আটটি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল এবং অনেকগুলি জুনিয়ার হাই স্কুল। ১৯৩৩ সালের আদম-সুমারী থেকে দেখা যায় যে সাগরদ্বীপের ৭৩,৬২৯ জন অধিবাসীর মধ্যে

২০,৪৭০ জন লেখাপড়া জানেন। অথচ এই নদীর ওপারে, কলকাতার সঙ্গে যুক্ত নামখানা থানার ৪১,৬০৯ জন অধিবাসীর মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ১০,১৮৭ জন। আনুপাতিক হারে সাগরদ্বীপে শিক্ষিতের সংখ্যা এখন আরও বেড়েছে।"

॥ দশ ॥

আমাকে থামতে দেখে শ্যামা বলে ওঠে, "নদীর ওপারেই বুঝি নামখানা ?"

"হ্যাঁ, এই তো। আমরা চেমাগুড়িতে এসে পড়েছি। দেখছেন না কত নৌকো, সব নামখানা থেকে এসেছে।" উত্তর দিই।

"তা দেখেই তো জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু এ জায়গাটার কি নাম বললে ?"

"চেমাগুড়ি।" একটু থেমে বলি, "বেশ তাড়াতাড়ি এসেছি বলতে হবে, খুব বেশি হলে আর ঘণ্টাখানেক লাগবে।"

"কোথায় যেতে ?"

"সাগরে—গঙ্গাসাগরে।"

"তাহলে তো এসে গেছি।"

"হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। ইচ্ছে ছিল একটা জায়গা আপনাকে দেখাব নৌকো থেকে, কিন্তু কথা বলতে বলতে কখন ছাড়িয়ে এসেছি, খেয়াল করি নি।"

"কি নাম জায়গাটার ?"

"মুড়িগঙ্গা।"

"মুড়িগঙ্গা তো নদী, এই নদী !"

"হ্যাঁ। এই নামে একটা জায়গাও আছে।"

"থাক্ গে। যারা যাবার, তারা গেছে চলে। তাই তাদের কথা না ভেবে যারা আছে, তাদের কথাই বলো।"

'গঙ্গা মাঈকি···জয়।···জয়।···গঙ্গা মাঈকি···'

যাত্রীদের জয়ধ্বনিতে আমার কথা যায় হারিয়ে। আমিও ওদের সঙ্গে গলা মেলাই। নৌকো তীরের দিকে এগিয়ে চলেছে।

এখানেও একটি অস্থায়ী জেটি নির্মিত হয়েছে। সেই জেটিতে নৌকো নোঙর করল। বুড়ো মাঝি বলল, পনেরো মিনিটের জন্য যাত্রাবিরতি। যাঁদের দরকার, তাঁরা চা খেয়ে নিতে পারেন।

অনেকেই চা খান না, কিন্তু প্রকৃতিগত প্রয়োজনে প্রায় সবাইকেই নামতে হল নৌকো থেকে। কাজ সেরে কেউ বা ফিরে গেলেন নৌকোয়, কেউ বা আমার মতো চায়ের দোকানের সামনে এসে ভিড় জমালেন।

গুটিকয়েক দোকান ও কয়েক ঘর গৃহস্থ নিয়ে ছোট গ্রাম চেমাগুড়ি। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বিদ্যাপীঠ। তাহলেও চেমাগুড়ি সারা বছর ধরে ঝিমোয়, কেবল সাগরমেলার সময় জেগে ওঠে। মেলাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে তারও চেষ্টার ত্রুটি নেই।

পনেরো মিনিটে না হলেও, পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই মাঝি নৌকো ছেড়ে দিল। আমরা বিদায় নিলাম চেমাগুড়ির কাছ থেকে। ধীরে ধীরে সেই ক্ষুদ্র জনপদটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুন্দরবন অঞ্চলের কিছু নিজস্ব গাছপালা আছে। এদের মধ্যে প্রথম বলতে হয় সুন্দরী গাছের (Heritiera Minor) কথা। তারপরে পশুর (Maliaccoe Class), বাইন অর্থাৎ বান (Abicennia Officinalis), ধোন্দল (Gamur), কেওড়া (Sonneratia Opetala), গরাণ (Ceriops Candolleana), গেঁয়ো বা গেমো (Excoccaria Agallocha), গর্জন (Diptero Carpus Turbinatus), গোলগাছ (Palm) এবং গিলে, লতা ও বেত।

তীরে একটা বড় গাছের গোড়ায় মাটির বেদিতে পাশাপাশি দুটি মূর্তি দেখতে পাচ্ছি। পূর্ণাবয়ব নয়, মুণ্ডমূর্তি। তাঁদের মাথায় পত্রাকার দীর্ঘ শিরস্ত্রাণ। চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না। বন্ধুবর ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে আমি এই মুণ্ডমূর্তি দেখেছি। তাঁরই কাছে শুনেছি—দক্ষিণবাহিনী গঙ্গার নাব্য অঞ্চলে ইনি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লৌকিক-দেবতা। নাম—দক্ষিণরায় বা দক্ষিণের রাজা। এ অঞ্চলের লোকসমাজে ব্যাপকভাবে পূজিত।

অনেকের ধারণা দক্ষিণরায় ব্যাঘ্রদেবতা। কিন্তু তুষারবাবু প্রমাণ করেছেন যে এ ধারণা সত্য নয়। তাঁর ভাষায়—'যুগসন্ধির কালে বিভিন্ন ধর্ম-সংস্কৃতি যখন ঘটনাচক্রে পরস্পরের সম্মুখীন হয় তখন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমে চলে

সমন্বয়ের চেষ্টা এবং এইভাবেই আদিম আচার বিশ্বাস ও লৌকিক দেব-দেবী শাস্ত্রীয় স্তরে উন্নীত হন। দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের এই ঐতিহাসিক বস্তুমূলক পথেই অন্যান্য স্থানের ন্যায় দক্ষিণ চব্বিশপরগণার আদিম উর্বরতা জাদু-বিশ্বাসের উৎসে উৎসারিত নৃমুণ্ড পূজা স্থানকালবিশেষে রূপান্তরিত হয়েছে দক্ষিণরায়ে।'

তুষারবাবুর মতে—'সুন্দরবন ও দক্ষিণ চব্বিশপরগণা অঞ্চলের যথার্থ ইতিহাস বহুলাংশে ভূতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদের উৎখনন এবং নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানীদের গবেষণার মুখাপেক্ষী।'

সাগরদ্বীপে সুন্দরী গাছ বড় একটা দেখছি না। কিন্তু অন্যান্য গাছ প্রায় সবই রয়েছে দেখছি। তবে এতক্ষণ সেই সঙ্গে ক্ষেতখামার বাড়িঘর চোখে পড়ছিল। এখন অর্থাৎ চেমাগুড়ি থেকে নৌকো ছাড়ার পরে কেবলই বান, ধোন্দল, কেওড়া, গরাণ, গেঁয়ো, গিলে আর বেতবন। যতদূর দেখা যাচ্ছে মাথা সমান উঁচু ঝোপ-ঝাড়ে বোঝাই বালুকাময় অনুর্বর প্রান্তর। শুনেছি এমনি বনাবৃত বালুকাবেলাতেই মেলা বসে—সাগরমেলা।

"মেলা আর কতদূর?"

প্রায় প্রত্যেকেরই একই প্রশ্ন। ধৈর্যহারা যাত্রীদল ক্রমাগত একই প্রশ্ন করে চলেছে। আর মাঝিমাল্লারা একই উত্তর দিচ্ছে—দূর নেই, এই এসে পড়েছি।

"কোথায়?"

"ঐ সামনের বাঁকটার পরের বাঁকটা ঘুরলেই মেলা দেখা যাবে।"

তারপরে আর কয় বাঁক, সে-কথা বলছে না বুড়ো মাঝি। তাহলেও যাত্রীরা তার উত্তরে আশ্বস্ত হচ্ছেন। আনন্দের আতিশয্যে চীৎকার করে উঠছেন, 'গঙ্গা মাঈকি…জয়।' আমরা অনেক সময়েই না-বুঝে বাধিত হই।

চেমাগুড়িতে শ্যামা ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। ভেবেছি ভালই হয়েছে। ওর একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু হঠাৎ সে আবার বেরিয়ে এলো বাইরে। এসে বসল আমার পাশে। বলি, "আবার উঠে এলেন কেন?"

"পারলাম না।" ক্লান্তকণ্ঠে শ্যামা উত্তর দেয়।

"কি?"

"আর ভেতরে থাকতে পারলাম না। নৌকোর ভেতরে ওঁর স্মৃতি আমাকে অক্টোপাসের মতো জাপটে ধরছে।" শ্যামার চোখ দুটি ছলছল করছে।

তাড়াতাড়ি বলি, "বেশ তো, এখানেই বসুন। তখন সাগরদ্বীপের কিছু কথা বলেছি, কিন্তু বলি নি কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কথা। যা না জানলে সাগরদ্বীপকে জানা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। শুনবেন সে-কথা ?"

শ্যামা আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে আমার দিকে তাকায়। একটু ম্লান হেসে জিজ্ঞেস করে, "কথার জাল দিয়ে আমার মনটাকে ঢেকে রাখতে চাইছ ?"

আমি চট্ করে কোন জবাব দিতে পারি না। চুপ করে থাকি।

শ্যামা আবার হাসে। ক্ষীণস্বরে বলে, "বেশ বল। কলকাতার কথা শুনে যদি কলকাতার মানুষের শোক ভুলে থাকা যায়, মন্দ কি ?"

আর সময় নষ্ট না করে বলতে শুরু করি, "পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের নাবিকরা কুবেরভূমি ভারতবর্ষে আসার জন্য জাহাজ জলে ভাসান। হারিয়ে যাওয়া ভারতবর্ষ আবিষ্কৃত হল। আবিষ্কার করলেন পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা। তিনি ১৪৯৭ সালের ৮ই জুলাই চারখানি জাহাজ নিয়ে লিসবন থেকে রওনা হয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ১৪৯৮ সালের ২০শে মে কালিকট বন্দরে পৌছন।

"এই আবিষ্কারের পর থেকেই স্পেন, পর্তুগাল, ডেনমার্ক, হলাণ্ড, ফরাসী ও ইংরেজরা বাণিজ্যের নামে ভারতবর্ষ লুট করতে আসতে থাকে। করাচী থেকে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন উপকূলে তাঁরা উপনিবেশ গড়ে তোলেন। বাংলাদেশের দিকে বোধ করি তাঁদের নজর পড়ে সব চেয়ে বেশি। ফলে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজরা কলকাতায় কুঠি নির্মাণ করেন।

"কিন্তু কলকাতায় কুঠি নির্মাণের আগে সাগরদ্বীপে একটি দুর্গ গড়ে তোলার প্রস্তাব কিছুকাল ইংরেজদের বিবেচনাধীন ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণ এই প্রস্তাব নাকচ করে দেন। ফলে ইংরেজরা সাময়িকভাবে উলুবেড়িয়ায় ঘাঁটি স্থাপন করেন।

"তারপরে ১৬৯০ সালের ২৪শে আগস্ট রবিবার, জব চার্ণক মাত্র তিরিশ জন প্রহরী নিয়ে গঙ্গার পূর্বতীরে গোবিন্দপুর গ্রামের উপকণ্ঠে এসে জাহাজ নোঙ্গর করেন। মুঘলসম্রাট চার্ণককে হুগলীর নিচে কোন স্থানে কুঠি নির্মাণ করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেজন্য তার পূর্বতীরে আসার কোন প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। বিশেষ করে যখন অন্যান্য সমস্ত য়ুরোপীয় বণিকগণ গঙ্গার পশ্চিমতীরেই বসতি স্থাপন করেছিলেন। পূর্বতীর তখন জনবিরল এবং বনময়। সুন্দরবনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় হিংস্র শ্বাপদে পরিপূর্ণ।

তার ওপরে আবার গোবিন্দপুর ছিল পূর্বতীরের সব চেয়ে অস্বাস্থ্যকর স্থান। কাজেই জব চার্ণকের স্থান নির্বাচন আজও বিস্ময়কর বলে মনে হয়।

"অনেকে বলেন, বর্তমান শেয়ালদার কাছে একটি পিপল-গাছের গোড়ায় জনৈক বৃদ্ধকে হুঁকা টানতে দেখে আর নিমতলার নিমগাছটিকে চার্ণকের খুব ভাল লাগায়, তিনি গোবিন্দপুর ও সুতানুটিকে নির্বাচিত করেছিলেন।

"কিন্তু কেবল মনোরম দৃশ্যে মুগ্ধ হয়েই চার্ণক স্থান-নির্বাচন করেছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর স্থান নির্বাচনের প্রথম কারণ, সম্ভবত তখনও আদিগঙ্গা জীবিত ছিল। তিনি দুই নদীর সঙ্গমস্থলে ইংরেজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয় কারণ, পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুরা গার্ডেনরীচের ওপরে আসত না। কথিত আছে তখন গার্ডেনরীচ ও শিবপুরের মধ্যে নাকি গঙ্গার ওপরে একটা মস্ত লোহার শেকল বাঁধা ছিল। তার এক-একটি কড়ার ওজন ছিল দশ সের। সেই শেকল ছিঁড়ে কিংবা ডিঙ্গিয়ে জলদস্যুদের নৌকো ওপরে আসতে পারত না। জব চার্ণকের স্থান নির্বাচনের তৃতীয় কারণ তুলনায় গোবিন্দপুর ও সুতানুটিতে ঘূর্ণিঝড়ের দাপট কম ছিল।

"তবে এ সবই অনুমান। সঠিক কারণ বলা খুবই কঠিন। আমরা কেবল জব চার্ণকের অসাধারণ দূরদর্শিতার তারিফ করার সঙ্গে নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে তিনি সম্যক অনুসন্ধান ও সূক্ষ্ম পরীক্ষার পরেই গোবিন্দপুর ও সুতানুটিকে নির্বাচন করেছিলেন। আর তারই ফলে পরবর্তীকালে কলকাতা বৃটিশ-ভারতের রাজধানী হতে পেরেছে। কিন্তু সে-সব পরের কথা। আগে রয়েছে অনেক কাহিনী, যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে পরবর্তীকালের ইতিহাস।"

"এ কি! থামলে কেন?" শ্যামা প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

হেসে বলি, "এখন থাক্, আর এক সময় বলব।"

"কেন এখনও তো পৌঁছতে দেরি আছে, ততক্ষণ বল না। সত্যি বলছি, আমার খুব ভাল লাগছে।"

অতএব আবার শুরু করতে হয়, "১৭৫৭ সালের ২০শে জুন সিরাজদ্দৌলা কলকাতা অধিকার করলেন। স্বাভাবিক ভাবেই তখন ইংরেজদের সাগরদ্বীপে চলে আসা উচিত ছিল। কিন্তু ফলতার ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ ইংরেজদের আশ্রয় দিলেন। তাই তাঁদের আর সাগরদ্বীপে আসার প্রয়োজন পড়ে নি। তাঁরা ২৮শে জুন ফলতায় পৌঁছন এবং প্রায় ছ' মাস সেখানে থাকেন।

"কলকাতার পরাজিত ইংরেজরা কোম্পানীর মাদ্রাজ শাখার কাছে সৈন্য সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। ছ' মাস বাদে কর্ণেল ক্লাইভ এবং অ্যাডমিরাল ওয়াট্‌সন বৃটিশ রণতরী নিয়ে ফলতায় উপস্থিত হলেন। তাঁরা ২৭শে ডিসেম্বর ফলতা থেকে যুদ্ধযাত্রা করে পরদিন রাতে বজবজ দুর্গ অধিকার করেন। দুর্গাধিপতি ও কলকাতায় সিরাজের প্রতিনিধি মানিকচাঁদ যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগেই বজবজ থেকে পালিয়ে যান। ইংরেজদের তাড়িয়ে সিরাজ তখন কলকাতার নাম রেখেছিলেন আলিনগর!

"বজবজের পরে কলকাতা। ক্লাইভ ২রা জানুয়ারী কলকাতা জয় করে নিলেন। নবাবের সৈন্যরা তখন ইংরেজদের সামান্য বাধা দিয়েছিলেন।

"নবাব চল্লিশ হাজার সৈন্যের সুবিরাট বাহিনী নিয়ে কলকাতায় এলেন। তিনি লবণ হ্রদ ও মারাঠা পরিখার মধ্যবর্তী স্থানে ব্যূহরচনা করলেন। ক্লাইভ কিন্তু মাত্র সাড়ে তেরোশ' য়ুরোপীয় এবং আটশ ভারতীয় সৈন্য নিয়ে সিরাজের সুবিশাল বাহিনীকে আক্রমণ করে বসলেন। সার্কুলার রোডের কাছাকাছি কোন স্থানে এই যুদ্ধ চলতে থাকল।

"অনেক বেশি শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও সিরাজ মোটেই সুবিধা করে উঠতে পারলেন না। তাঁরই বেশি সৈন্যক্ষয় হতে থাকল। তিনি নিরাপত্তার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই ৯ই ফেব্রুয়ারী ক্লাইভের সঙ্গে সন্ধি করলেন। তিনি ক্লাইভকে ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হলেন। তারপর ইংরেজদের কলকাতায় একটি টাঁকশাল নির্মাণ করার অনুমতি দিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে গেলেন।

"ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীবৃদ্ধির সোপান বেয়ে কলকাতা উত্তরোত্তর উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে থাকে। আর সেই সঙ্গে সাগরদ্বীপ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ক্রমেই অবনতির অন্ধকার গহ্বরে তলিয়ে যেতে থাকল।

"কিন্তু সে-কথা এখন থাক, ইংরেজদের কথায় ফিরে আসা যাক। বজবজ দুর্গজয়ের যুদ্ধই গঙ্গার বুকে শেষ যুদ্ধ নয়। তারপরেও বহু যুদ্ধ হয়েছে গঙ্গায়। আর তার মধ্যে ইংরেজ-ওলন্দাজ নৌযুদ্ধ বোধ করি সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য।

"সিরাজের কলকাতা জয়ের পরে ওলন্দাজরা ফলতায় ইংরেজদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরেজদের চব্বিশ পরগণার মালিক হয়ে বসতে দেখে তাঁরা বাংলাদেশের লাভজনক ব্যবসায় নিজেদের অধিকার হারাবার আশঙ্কা করতে থাকলেন। ফলে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

"১৭৬৯ সালের ২৩শে অক্টোবর ওলন্দাজরা সাতখানি সুরক্ষিত রণতরী নিয়ে অগ্রসর হলেন। শক্তিহীনতা সত্ত্বেও কেবল তিনখানি জাহাজ সম্বল করেই ইংরেজরা তাঁদের প্রথম আক্রমণ করে বসলেন।'

"মাত্র দু ঘণ্টা যুদ্ধ চলার পরে ওলন্দাজরা পরাজয় স্বীকার করে নিলেন। সাব্যস্ত হল, দুর্গরক্ষার জন্য দেড়শ' সৈন্য রেখে অন্যান্য সমস্ত ওলন্দাজ সৈন্যদের দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে এবং নবাবের অনুমতি ছাড়া তাঁরা ফলতার পরে কখনও একখানি জাহাজের বেশি নিয়ে যেতে পারবে না। বলা বাহুল্য, বাংলার নবাব তখন ক্লাইভের হাতের পুতুল।

"এই যুদ্ধজয়ের পরে গঙ্গাবক্ষে ইংরেজের অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তৃত হল। আর তারই ফলে অদূর ভবিষ্যতে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড রূপে দেখা দিল। তাই বলছিলাম গঙ্গা কেবল বদ্বীপ বাংলার জন্মদাত্রী নয়, সে ভারতের আধুনিক ইতিহাসের জনয়িত্রী।"

সোনালী সূর্য তলিয়ে গেল গঙ্গায়। সাগরযাত্রার পরে দ্বিতীয় দিনের সূর্য অস্ত গেল গঙ্গাবক্ষে। এখন কেবল তার সোনালী রেশটুকু টিকে আছে গঙ্গাজলে। একটু বাদে এটুকুও যাবে মিলিয়ে—সন্ধ্যা আসবে নেমে।

আর কতদূর—সাগরমেলা আর কতদূর? বুড়ো মাঝি যে বলেছিল সন্ধ্যার আগেই আমরা পৌঁছব সেখানে—যুগ-যুগান্তের সেই পরমতীর্থে?

"ঐ তো দেখা যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন না?" বুড়ো মাঝি একজন যাত্রীকে ধমক লাগায়। কি জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি? কি দেখাচ্ছে সে?

তীরের দিকে তাকাই। আরে, তাই তো! ঐ তো মেলা—সাগরমেলা। আমরা উত্তেজিত, আমরা উদ্‌বেলিত, আমরা উল্লসিত।

আমরা সবাই। বাইরে যাঁরা বসেছিলেন তাঁরা উচ্ছল কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'গঙ্গা মাঈকি···জয়, কপিল মুনিকি···জয়, গঙ্গাসাগরকি···জয়।'

নৌকোর ভেতরে হুটোপাটি শুরু হয়ে গেছে। সবাই একসঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছেন। দুজন মাল্লা ছুটে গিয়ে পথরোধ করে তাঁদের। সবাই এভাবে একসঙ্গে বেরিয়ে এলে নৌকোয় জল উঠে যাবে, মহাবিপদ হবে।

ওঁরা মর্মাহত। অনেকেই আবার গিয়ে জায়গায় বসেন। কেবল বলেন, 'গঙ্গা মাঈকি···জয়।'

সবাই কথা শোনে না। কেউ কেউ মাল্লাদের ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে

আসে বাইরে। আর বাইরে এসেই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে মেলার দিকে। কয়েক মুহূর্ত বাদে আপন মনে আবার বলে ওঠে, 'গঙ্গা মাঈকি··· জয়···।'

ওদের সঙ্গে দি'মাও বেরিয়ে এসেছেন বাইরে। তিনি আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান। অপলক নয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন মেলার দিকে। তারপরে বলেন, "বাব্বা, কি বিরাট মেলা ! মেলা তো নয়, যেন একটা শহর ! যতদূর দেখা যাচ্ছে কেবল নৌকো, জাহাজ, ছোট ছোট ঘর আর মানুষ ! ঐ যে সাদা চূড়া দেখা যাচ্ছে, ওটা নিশ্চই মন্দির—কপিলমুনির মন্দির। আর ঐ দেখ আলো জ্বলে উঠলো। ওমা ! এখানে ইলেকট্রিক লাইট আছে বুঝি ?"

এবারে আর তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পারি না। বলি, "না। বিদ্যুৎ নেই সাগরদ্বীপে। তবে কয়েক বছর থেকে সরকার জেনারেটারের সাহায্যে মেলায় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করেন।"

"তাই বল্। আচ্ছা এখনও তো সন্ধ্যা হয় নি, এখুনি আলো জ্বালিয়ে দিল কেন ?"

"কর্মচারীরা আগেভাগেই কাজটা সেরে রাখলেন আর কি !"

শ্যামা হেসে দেয় আমার কথা শুনে। এ হাসির সঙ্গে একটু আগের হাসির নেই কোন মিল। সে হাসি ছিল কান্নারই রূপান্তর। আর এ হাসি যে আনন্দের উচ্ছল প্রকাশ।

কিসের আনন্দ—পাবার ? কিন্তু শ্যামা আজ তার জীবনের একমাত্র অবলম্বনকে হারিয়ে ফেলেছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে যে নারী তার প্রিয়তমকে হারিয়েছে, তার এমন আচরণ বিস্ময়কর।

সহসা সবার মতো শ্যামাও চীৎকার করে ওঠে, 'গঙ্গা মাঈকি...জয়।'

আমার বিস্ময় বাড়ে। সেই সঙ্গে সেই চিরপুরাতন প্রশ্নটি আবার জেগে ওঠে মনে। কেন, কেন মানুষ তীর্থে এসে তার সব দুঃখ ভুলে যায়, ভুলে যায় নিজেকে ? কি আছে এখানে ? ভগবান ? কিন্তু কেউ তাঁকে দেখেছেন বলে তো শুনি নি ?

তবে কি প্রাকৃতিক দৃশ্য ? কিন্তু কোথায়, সুন্দর দৃশ্যের সামনে দাঁড়ালেই তো মনের অবস্থা এমন হয় না। গঙ্গাসাগরের চেয়ে দীঘা সুন্দর, গঙ্গোত্রীর চেয়ে মানালী সুন্দর। কিন্তু দীঘা কিংবা মানালীতে গিয়ে তো মনের অবস্থা তেমন হয় না, যেমনটি হয় গঙ্গোত্রী গিয়ে কিংবা হচ্ছে এখানে এসে !

অনেকের কাছেই এ প্রশ্ন করেছি, কেউ উত্তর দিতে পারেন নি। কেউ বলেছেন এ আমার সংস্কার, কেউ বলেছেন আমার মনই মনের এই অবস্থা সৃষ্টি করে। বিশ্বাস করি নি ওঁদের কথা, কারণ আমি স্থানমাহাত্ম্যে বিশ্বাসী।

সাগর-সৈকত ক্রমেই কাছে আসছে। সাগরের ঢেউয়ের দোলা লাগছে নৌকোয়। আমরা দুলে দুলে উঠছি আর দেখছি। দেখতে দেখতে দুলছি।

বালুকাময় সৈকত। নির্জন নয়, জনবহুল। অসংখ্য মানুষ চলা-ফেরা করছে। তবে এখান থেকে তাদের বড্ড ছোট দেখাচ্ছে, অনেকটা লিলিপুটের মতো মনে হচ্ছে। তাই তো হবে, আমরাও যে গালিভারের মতই এক আজব দেশে এসে পড়েছি। সারা বছর যে বালুকাবেলার অর্ধেকটা লুকিয়ে থাকে সাগরে আর বাকি অর্ধেকটা পড়ে থাকে জনহীন, আজ সেখানে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাবেশ।

লিলিপুটের দল বড় হচ্ছে। তীরভূমি ক্রমেই আমাদের কাছে আসছে। আর সেই সঙ্গে সমতা রেখে উল্লসিত যাত্রীদল অবিরাম বলে চলেছেন, 'গঙ্গা মাঈকি···জয়, কপিলমুনিকি···জয়, সাগর মেলাকি···জয়।' জয়, জয় আর জয়।

অবশেষে একসময় সংখ্যাতীত সারি সারি নৌকোর পাশে এসে আমাদের নৌকো ভিড়ল। আমরা এসেছি সাগরে—গঙ্গাসাগরে।

মেলা কিন্তু এখনও দূরে। নৌকো ভিড়েছে কিন্তু তীর এখনও প্রায় এক ফার্লং। এই পথটুকু পায়ে হেঁটে যেতে হবে। জল কম বলে নৌকো আর এগোতে পারবে না।

কথাটা শুনে সবাই আঁতকে উঠলেন, বিশেষ করে মেয়েরা—"কি সর্বনাশ, জলে নামতে হবে!"

"ওমা, সে কি কথা? আমি যে সাঁতার জানি না!"

"কি ভীষণ ঢেউ, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে যে!"

"শুনেছি সাগরে কুমীর আছে, হাঙর আছে। হে বাবা কপিলমুনি, এ তুমি কি করলে বাবা? আনলেই যদি, তা আর একটু কাছে টেনে নিলে না কেন?"

বুড়ো মাঝি তাঁদের ভরসা দেয়। বলে—"অল্প জল, ভেসে যাবার ভয় নেই। আর কুমীর ও হাঙরের দল এ কদিন গঙ্গাসাগর ছেড়ে চলে যায়, বাবার আদেশ। বাবা না আনলে, কেউ আসতে পারেন না এখানে। আর

বাবা যাদের নিয়ে আসেন, তিনি তাদের রক্ষাও করেন। তাছাড়া দরকার হলে মাল্লারা সাহায্য করবে আপনাদের।"

বাধ্য হয়েই মাঝির কথা বিশ্বাস করতে হয়। জলে না নামলে মেলায় যাওয়া যাবে না—যে মেলায় আসার জন্য এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত শোক!

জিনিসপত্র গোছগাছ করা হয়েছিল আগেই। এবারে পোশাক ঠিক করার পালা। পুরুষরা প্রায় প্রত্যেকেই 'আণ্ডারওয়্যার' কিংবা গামছা পরে ধুতি অথবা প্যাণ্ট মাথায় বেঁধে নিলেন। মেয়েরা যাঁরা শাড়ির মায়া কাটাতে পারলেন না, তাঁরা সায়া এবং ব্লাউজ পরেই প্রস্তুত হলেন। জলে নামার চেষ্টা শুরু হল।

কাজটা খুব সহজ নয়। নৌকোর পাটাতন জল থেকে অনেক নিচুতে। তাই ছেলেরা যত সহজে জলে লাফিয়ে পড়তে পারলেন, মেয়েরা তা পারলেন না। দুজন মাল্লার কাঁধে ভর দিয়ে তাঁরা বেসামাল অবস্থায় কোনমতে জলে নামলেন। আর নেমেই চিৎকার করে উঠলেন—ইস, কি ঠাণ্ডা!

সত্যি তাই। কর্দমাক্ত শীতল জলে পা দিতেই সমস্ত শরীরে একটা শৈত্যপ্রবাহ বইতে শুরু করেছে। আর ঠিক তখুনি দি'মা চিৎকার করে উঠলেন, "আমার জর্দার কৌটোটা ভেসে গেল!"

"কোথায়?"

কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। দি'মার জর্দার কৌটো অদৃশ্য হয়েছে গঙ্গাসাগরের অথৈ জলে।

জলে নেমেও দাঁড়িয়ে রইতে হল। মালপত্র নৌকোয় রেখে জলে নেমেছি। এবারে মাল্লাদের সহায়তায় সেই সব পিঠে ও মাথায় নিতে হবে।

আমাকে মাথায় মাল চাপাতে দিলেন না দি'মা। বললেন, "তোর হাত খালি না থাকলে আমি কাকে ধরে পাড়ে যাব? তার চেয়ে বরং ঐ জোয়ান মাল্লাটাকে বল্, আমাদের মালপত্র পৌঁছে দিয়ে আসবে। পয়সা দেব'খন।"

শ্যামাও সমর্থন করে তাঁকে।

তাই করতে হল। দু হাতে দি'মা ও শ্যামাকে ধরে আমি এগিয়ে চললাম। ওঁদের খুবই কষ্ট হচ্ছে। দি'মা খাটো মানুষ, তাঁর প্রায় বুক-সমান আর শ্যামার কোমর অবধি জল। জল তো নয়, বরফ। তার ওপর বেশ বড়

বড় ঢেউ।

তারই একটা এসে হঠাৎ আছড়ে পড়ল আমাদের পিঠে। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামা ও দি'মা সজোরে জড়িয়ে ধরল আমাকে।

মাল্লা মজা দেখছে আর আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। কোনমতে বলি, "ছেড়ে দিন, নইলে পড়ে যাব যে। সবাই একসঙ্গে ডুবে মরব।"

অনেক কষ্টে ওদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিই নিজেকে। তারপরে বলি, "আমি ধরে আছি, ভয় নেই—আস্তে আস্তে এগিয়ে চলুন।"

"তাই তো চলছি বাবা।" দি'মা আশ্বাস দেন। তারপরে শ্যামাকে সাবধান করেন, "সাবধানে চল্ মা, নইলে যা ঢেউ, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।"

"তাহলে তো বেঁচে যাই দি'মা। কিন্তু মা-গঙ্গা কি অতখানি কৃপা করবেন!"।

হাসি পায় আমার। মনে মনে বলি, তাই যদি চাইবে, তাহলে তখন ওভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলে কেন? এ সংসারে কেউ স্বেচ্ছায় ভেসে যেতে চায় না। প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর বস্তু নেই জগতে।

ওঁদের, কেবল ওঁদের কেন, সব মেয়েদেরই লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে এই জল ঠেলে এগোতে হচ্ছে। আমাদেরও কষ্ট হচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ওঁদের কষ্ট তীব্রতর। অনেককে আবার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাঁধে নিতে হয়েছে। তার ওপরে রয়েছে মালপত্রের বোঝা।

অথচ কর্তৃপক্ষ একটু উদ্যোগী হলে, যাত্রীদের এই কষ্টের উপশম হতে পারে। কাঠের কয়েকটি অস্থায়ী জেটি নির্মাণ করলে লক্ষ লক্ষ যাত্রী এই অযথা হয়রানি থেকে নিস্তার পেতে পারেন। এজন্য সরকারী তহবিল থেকে অর্থব্যয়ের কোন প্রয়োজন নেই। বরং সরকার কিছু আয় করতে পারেন। কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে মাথাপিছু দুটি করে পয়সা জেটিভাড়া নেবার অনুমতি দিলে, তাঁরা এখানে এসে সানন্দে অস্থায়ী জেটি নির্মাণ করবেন।

আমরা তীরে এলাম। মাল্লা মাল মাথায় এগিয়ে চলল, আমরা তাকে অনুসরণ করি। দীঘার মতই মসৃণ সাগরসৈকত। সংখ্যাতীত পুণ্যার্থীর পদভারে মসৃণ হয়ে গেছে। এ অংশটি স্নানের জন্য নির্দিষ্ট। তাই এদিকটায় কোন ঘর তোলা হয় নি। অস্থায়ী আবাস নির্মাণ করা হয়েছে আরও খানিকটা ওপরে। সেখান থেকেই মেলা শুরু। এটি মেলার উপকণ্ঠ।

পরন্তু শেষরাতে স্নান—মকর সংক্রান্তির সাগরস্নান। তবু বহু পুণ্যার্থী এখন

স্নান করছেন। পৌষের সন্ধ্যায় এই শীতল জলে অবগাহন, কারো কাছেই আরামদায়ক হতে পারে না। তবু ওঁরা স্নান করছেন, কারণ এটুকু বাড়তি পুণ্য। পুণ্যের জন্যই তো এখানে আসা।

বালির চর পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গাতে উঠে এলাম। এখান থেকেই শুরু হয়েছে মেলা। বাঁশ ও কাঠের খুঁটি পুঁতে ইলেক্‌ট্রিকের তার নিয়ে আসা হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক খুঁটির সঙ্গেই আলো জ্বলছে। শুধু পথে নয়, আলো জ্বলছে দোকানে ও মন্দিরে, আখড়া ও আশ্রমে, অফিসে ও আদালতে।

হ্যাঁ, সবই হয়েছে এখানে। মেলা মানেই মানুষ, আর মানুষ মানেই পাপ ও পুণ্যের পাশাপাশি অবস্থান। তাই থানা ও আদালতের দরকার হয়েছে। আধুনিক সভ্যতা যে পুলিস ও হাকিম ছাড়া এক পা-ও এগোতে পারে না।

লাইট-পোস্ট এখানকার পথের পরিচয়। হাত দশেক প্রশস্ত সুদীর্ঘ ভূমি-খণ্ডের দুদিকে খুঁটি পোঁতা হয়েছে। তারই দুপাশে বসেছে দোকানপাট ও ভিক্ষুকদের প্রদর্শনী। ভিক্ষুকদের এমন বিচিত্র সমাবেশ এর আগে আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। সন্ন্যাসী ও সংসারী, সুস্থ ও রোগী, সবল ও বিকলাঙ্গ, বাঙালী ও অবাঙালী। যে যেখানেই জায়গা পেয়েছে, সামনে একটুকরো কাপড় পেতে বসে গেছে। তারা করুণকণ্ঠে কৃপাভিক্ষা করছে—ভগবানের নয়, মানুষের। ওরা যে জানে না, মানুষের পাপেই ওদের আজ এই দুরবস্থা।

মানুষ দয়াময়। বিশেষ করে পুণ্যকামী মানুষ। তারা ওদের চাল দিচ্ছে, পয়সা দিচ্ছে, জামাকাপড় ও কম্বল দিচ্ছে। ওরা ধন্য হচ্ছে। পুণ্যক্ষেত্র গঙ্গাসাগরের স্থানমাহাত্ম্যে মোহিত হচ্ছে।

আমার কিন্তু মনে পড়ছে হের হিটলারের কথা। ভদ্রলোক সত্যি দয়ালু ছিলেন। শুনেছি তিনি নাকি তাঁর দেশের সমস্ত বিকলাঙ্গ ভিক্ষুক ও নেড়ী কুত্তাকে একই সঙ্গে গুলি করে মেরে ফেলতে বলেছিলেন। যাদের দুবেলা পেটভরা খাবার দেবার সাধ্য নেই, তাদের মেরে ফেলার মধ্যে আর যা-ই থাক্ নির্দয়তা থাকতে পারে না। তিল তিল করে মানুষকে মরণের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেয়ে একেবারে মেরে ফেলা নিশ্চয়ই দয়াধর্ম। গঙ্গাসাগরে এসে আজ তাই আমার হের হিটলারের কথা মনে পড়ছে। তিনি বড় দয়ালু ছিলেন।

কাদা-মাটি মেশানো এই সংকীর্ণ ভূখণ্ডই সাগরমেলার জনবহুল পথ। সেই

পথ দিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলেছি আমরা।

ফুলের দোকান, ফলের দোকান আর চায়ের দোকান। খেলনা মুদি ও মিঠাইয়ের দোকান। বাসন-বসন ও তরি-তরকারির দোকান। জগতের যাবতীয় বস্তু বেসাতি হয়ে এসেছে সাগরে। মনে হচ্ছে আলাদীনের সেই দৈত্য রাতারাতি কালীঘাটের বাজারটিকে এসে বসিয়ে দিয়েছে এখানে।

আমরা সেই আলো-ঝলমল শব্দময় মেলার মধ্য দিয়ে চলেছি এগিয়ে। আর কতদূর? তা কেবল মাল্লাই জানে।

শ্যামা আর নিঃশব্দে পথ চলতে পারে না। সে জিজ্ঞেস করে, "আমরা কোথায় চলেছি?"

"ঘরের খোঁজে। তুটো রাত কাটাতে হবে, একটা আশ্রয় না হলে চলবে কেন?"

"সে তো বুঝলাম, কিন্তু এদিকে যে শীতে জমে যাচ্ছি। এই ঠাণ্ডায় ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ থাকা যায়!"

"একটু কষ্ট কর মা।" দি'মা স্নেহমধুর স্বরে শ্যামাকে বলেন। যেন তাঁর নিজের কোন কষ্টই হচ্ছে না। আশ্চর্য স্নেহশীলা রমণী। একা রওনা হয়েছিলেন, প্রথমে সংগ্রহ করলেন আমাকে, তারপরে শ্যামাকে। এখন আমাদের সুখের চেয়ে অধিকতর কাম্য তাঁর কাছে কিছু নেই। অথচ আমরা তাঁর কেউ নই। তিনদিন আগেও পরিচয় ছিল না। আবার তিনদিন পরে হয়তো চিরদিনের মত ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। কেবল রয়ে যাবে আজকের এই স্নেহমধুর ব্যবহার। কিন্তু তাই বা কম কিসের? কাউকেই তো চিরকাল কাছে রাখা যায় না। কেবল বেঁচে থাকে তার ভালোবাসা।

ইতিমধ্যে অনেকখানি এগিয়ে এসেছি। বড় রাস্তা থেকে একটি সংকীর্ণ গলিতে ঢুকেছি। গলির তুদিকে ঘর—চাটাই ও হোগলার ঘর। কিন্তু একে ঘর বলা যায় কি! তাও তো মাত্র হাজার বিশেক ঘর তৈরি হয়েছে। বড়জোর লাখখানেক মানুষ কোনমতে মাথা গুঁজতে পারবেন। লোক আসবেন চার-পাঁচ লক্ষ। বাকিদের বালুকাবেলায় আকাশতলে রাত্রিবাস করতে হবে। ধুনি জ্বালিয়ে আর মাইকে গঙ্গাস্তোত্র শুনে শীতের সঙ্গে সহাবস্থান করতে হবে।

খবরের কাগজে দেখেছিলাম, সরকার যাত্রীদের জন্য গঙ্গাসাগরে ঘর তৈরি করেছেন। ভেবেছিলাম তার একটিতে আশ্রয় পেলে আরামে থাকা যাবে।

কিন্তু হায়, এই কি সেই ঘর ?

চাটাই ও হোগলা দিয়ে তৈরি গলা-সমান উঁচু একচালা ঝুপরি। বেড়ায় ও চালে প্রচুর ফাঁক। বাঁশের খুঁটি ও আড়ার সঙ্গে কোনরকমে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে হোগলার বেড়া দিয়েই 'পার্টিশান্'। এক-একটি খুপরি সাত-আট ফুট লম্বা ও ফুট-পাঁচেক চওড়া। ঝাঁপহীন একটি দরজা। নিচে স্যাঁতসেঁতে বালির চর। এই ঘরে থাকব কেমন করে ?

"থাকতে হবে। মেলায় কে তোমাকে এর চেয়ে ভাল ঘর দেবে ?" শ্যামা বলে।

মাল্লারও একই কথা। বলে, আজ এসেছি বলে নাকি এই ঘর পেলাম। কাল এলে উন্মুক্ত বালুকাবেলায় পৌষালী রাত কাটাতে হত।

চুপ মেরে যাই। কিন্তু শ্যামা আবার বলে, "আমরা জয়দেবের মেলায় তো আকাশতলেই রাত কাটাই। তবে সেখানে শীত এখানকার চাইতে কম। আর সারারাত ধরে গান ও গাঁজা চলে, কোন কষ্ট হয় না।"

"আপনিও গাঁজা খান ?"

"খাব না কেন, আমি যে বোষ্টমী গো !"

ভুলে গিয়েছিলাম কথাটা। শ্যামার কথাবার্তা ও ব্যবহারে তাকে মনে মনে আমাদের শহুরে সমাজের সাধারণ মেয়ে বলেই ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু সে তা নয়, সে বৈষ্ণবী—গাঁজা না হলে গাজন হয় না ওদের।

একটি ঘরের সামনে মালপত্র নামায় মাল্লা। বলে, "দুটো টাকা দিন। ঘরভাড়া দিয়ে খড় কিনে নিয়ে আসি।"

"এ ঘরের জন্য আবার ভাড়া দিতে হয় নাকি ?"

"হ্যাঁ। দৈনিক পঞ্চাশ পয়সা।"

"বেশ নাও।" দুটি টাকা দিই তার হাতে। তারপরে বলি, "দেড় টাকার খড়ে হবে ? যা স্যাঁতসেঁতে, বেশি করে খড় না বিছালে, শোয়া যাবে না মাটিতে।"

"নিয়ে তো আসি। না হলে আবার এনে দেব।"

মাল্লা চলে যায়। আমি পিঠ থেকে রুকস্যাক নামিয়ে টর্চ বের করি। শ্যামা ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে নেয়। বলে, "তুমি একটু বাইরে দাঁড়াও, আমরা ভেতরে গিয়ে জামাকাপড় বদলে নিই।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।" কথাটা মনে ছিল না আমার। লজ্জা পাই।

ওরা ভেতরে যায়। কয়েক মিনিট বাদে শ্যামা ডাকে, "এসো।"

মালপত্রগুলো ভেতরে আনি। নিচু হয়ে ঘরে ঢুকতে হয়। নত মস্তকেই চলাফেরা করতে হচ্ছে। নইলে চাল মাথায় ঠেকবে।

মোমবাতি জ্বালাই। শ্যামা বাতিটা একপাশে বালিতে পুঁতে দেয়। কম্পমানা শিখাটি স্থির হয়। মৃদু আলো মুহূর্তে একটি রোমাঞ্চকর পরিবেশ রচনা করে।

হঠাৎ দি'মা তাঁর ঝোলা থেকে দুটি টাকা বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, "এই নে, টাকাটা ধর্।"

"কিসের টাকা?" বুঝতে পারি না।

"বা রে! তুই যে তখন মাল্লাকে দিলি?"

"সে টাকা দুটো বুঝি তোমাকেই দিতে হবে, আমি দিতে পারি না!"

দি'মা আমার প্রশ্নের ধরন দেখে একটু বিচলিতা হয়ে পড়েন। একটা ঢোক গিলে বলেন, "পারবি না কেন, তবে আমার কাছে রয়েছে বলেই দিতে চাচ্ছিলাম আর কি।"

"রয়েছে তো আমার কাছেও। আর···"

"হয়েছে, বাবা ঘাট হয়েছে। তোর ইচ্ছে হয়েছে দিয়েছিস।" দি'মা আমাকে শেষ করতে দেন না। একটু থেমে আবার বলেন, "তা তুই একটু ঘরে বোস, আমি আর শ্যামা হাত-মুখ ধুয়ে সন্ধ্যে করে খাবার জল নিয়ে আসি গে। টর্চটা দে, গলিটা বড্ড অন্ধকার।"

"কোথায় জল আনতে যাবে?"

"কেন গলির মোড়ে, টিপকল দেখে এলাম যে!"

"সেখানে তো ভীষণ ভিড়।"

"হলে কি করব বাবা, ভিড় ঠেলেই কাজ সেরে আসতে হবে। এখানে আর জল পাব কোথায়?"

ছোট বালতিটা হাতে করে শ্যামা দি'মার সঙ্গে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

দি'মা ঠিকই বলেছেন। এখন তবু কয়েকটা টিউবওয়েল হয়েছে। আগে তাও ছিল না। মেলার উত্তরপ্রান্তের দুটি পুকুরই যাত্রীদের তৃষ্ণা-নিবারণের একমাত্র সম্বল ছিল। প্রতিবারই সেই জল ফুরিয়ে যেত, তখন তাদের সমুদ্রতীরে বালি খুঁড়ে নোনাজল খেয়ে প্রাণরক্ষা করতে হত। এখানে কুয়ো খোঁড়া যায় না। পুকুরগুলিতে বর্ষাকালে সাগরের নোনাজল এসে ঢোকে।

আর সরকারী টিউবওয়েল সাধারণত মাস-ছয়েকের মধ্যে খারাপ হয়ে যায়। তাই আজও পানীয়জলের অভাব সাগরদ্বীপের একটি প্রধান সমস্যা। হয়তো চারদিকে জল বলেই জলের অভাব মিটছে না।

আমি ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াই। খুব শীত পড়েছে, তবু ভাল লাগে। ঘরের ভেতরে সোজা হয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই।

প্রতি ঘরেই খানিকটা জায়গায় বেড়া দেওয়া হয় নি, ফাঁকা রেখে দেওয়া হয়েছে। নির্মাতাদের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট—এই ফাঁকটুকুকে দরজা হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু নির্মাণকালে তাঁরা বোধ করি গঙ্গাসাগরের প্রবল বাতাস আর প্রচণ্ড শীতের কথা স্মরণে রাখেন নি। ভেবে দেখেন নি, দরজায় ঝাঁপ না থাকলে এই ঘরে রাত্রিবাস অসম্ভব। যাক গে, আমার কাছে একখানি 'অ্যালকাথিন শীট' রয়েছে, তাই টাঙিয়ে নিতে হবে।

শ্যামার কথা ভাবতে থাকি। শ্যামা যেন ইতিমধ্যেই অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সত্যই তার ধৈর্য ও সংযমের প্রশংসা করতে হয়। অবশ্য বাবাজীর মৃত্যু তার কাছে হয়তো খুব আকস্মিক ছিল না। বহুদিন থেকেই ভুগছিলেন তিনি। এর আগে আরও তিনবার মৃতপ্রায় হয়েছিলেন। ফলে আজকের এই নিদারুণ দিনটিকে ধৈর্য ও সংযমের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারার মতো একটা মানসিকতা তার মাঝে গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু শ্যামা কি তার ভবিষ্যতের কথা ভাবছে না? যে ভাবনা বাবাজীকে শান্তিতে মৃত্যুবরণ করতে দেয় নি! শ্যামা সুন্দরী। সে এখনও যুবতী। তাদের সমাজে তার মতো মেয়ে মোটেই সুলভ নয়। কাজেই দুর্লভ শ্যামার জন্য যদি আবার আশ্রমে কোন সঙ্কট দেখা দেয়?

তাছাড়া যতদূর জেনেছি, আশ্রমের আয় মন্দ নয়। অধ্যক্ষের দেহরক্ষার পরে শিষ্য-শিষ্যাদের মাঝে সম্পত্তি নিয়ে সংঘাত কিছু নতুন নয় এদেশে। শ্যামা কি পারবে বাবাজীর আশ্রমকে রক্ষা করতে?

কিন্তু আমিই বা কেবল শ্যামার কথা ভাবছি কেন! তার মস্ত একটা বিপদ হয়ে গেছে স্বীকার করি। তবু তো সে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশে সৃষ্ট এই মহামেলার একটিমাত্র মানুষ।

আর বিপদ! বিপদ মাথায় করে তো সবাই সাগরে আসে। আজ নয়, সেই অনাদি অতীত থেকেই। কত বিপদ ঘটেছে এই গঙ্গাসাগরের পথে, এই সাগরসঙ্গমে। তাতে তো মানুষের আসা বন্ধ হয় নি। সকল বিপদ ও

ভয়কে তুচ্ছ করে মানুষ এসেছে ও আসছে। আসবে চিরকাল।

তাহলেও আমি শ্যামার কথাই ভাবছি। ভাবছি কারণ সহস্র সহস্র শ্যামার মিলনেই যে সৃষ্ট হয়েছে এই মেলা—সাগরমেলা। বিন্দু দিয়েই তো সিন্ধু, জনকে নিয়েই যে জনতা। এক কৃষ্ণকে নিয়েই তো লক্ষ গোপীর রাসলীলা। শ্যামাকে বাদ দিয়ে আমি সাগরমেলার কথা ভাবব কেমন করে? বরং এক শ্যামার মাঝেই লক্ষ শ্যামার মেলাকে খুঁজে পাবো।

মাল্লা ফিরে আসে। সে একগাদা খড় ও নম্বর লেখা একখানি টিনের চাকতি নিয়ে এসেছে। চাকতিখানি ঘরের বাইরে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিয়ে বলে, "এবারে খালি থাকলেও কেউ আর এ ঘরে ঢুকবে না। আজকের ভাড়া দিয়ে এসেছি, কাল থেকে ওরা নিজেরাই এসে ভাড়া নিয়ে যাবে।"

এবারে ঘরে খড় বিছানোর পালা। আমাকে কিছুই করতে হয় না। মাল্লাই সব করে। লোকটি বেশ কাজের। একপাশের খানিকটা অংশ ফাঁকা রেখে ঘরের বাকি সবটা জুড়ে খড় বিছিয়ে তার ওপরে দি'মা ও শ্যামার কম্বল পেতে দেয়। আমরা ঘরে ঢুকে সেই তৃণশয্যায় বসি। না, বেশ আরামই লাগছে।

শ্যামা ও দি'মা ফিরে আসেন একটু বাদে। ঘরে ঢুকেই দি'মা আমাকে বলেন, "তুই একবার বাজার থেকে ঘুরে আয়।"

"কেন?"

"চা খেয়ে নিয়ে একটু বাজার করে আয়।"

"কি আনতে হবে?"

"তোর জন্য কিছু খাবার আর আমাদের জন্য কিছু ফল। ঠিক কথা, কয়েকটা মালসা আনতে হবে।"

"মালসা!" আমি বিস্মিত, "মালসা দিয়ে কি হবে?"

"আমার শ্রাদ্ধ।" দি'মা প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন।

শ্যামা ও মাল্লা হেসে ওঠে। আমি চুপ করে থাকি।

দি'মা-ই আবার কথা বলেন একটু বাদে। শ্যামাকে দেখিয়ে বলেন, "ওকে কাল হবিষ্যি করতে হবে না?"

"কিন্তু উনি তো বৈষ্ণব!"

"শোন, আমার বোকা নাতির কথা শোন। বৈষ্ণব বলে কি বামুন নয়, হবিষ্যি করবে না? যাক্ গে, ওসব তোর মাথায় ঢুকবে না। তুই যা, বাজার

করে আয় ?”

থলি হাতে নিয়ে হেসে বলি, “সত্যি মাথায় ঢুকছে না দি'মা। যাক্ গে, আমি যাচ্ছি।” বেরিয়ে আসি ঘর থেকে।

আর তখনই কথাটা মনে পড়ে তাঁর। চেঁচিয়ে ওঠেন দি'মা, “বাজারে যাচ্ছিস, টাকা নিবি নে ?”

“না।”

“কেন ?”

“আমার কাছে টাকা আছে।” তাঁকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আমি গলি দিয়ে এগিয়ে চলি। মাল্লা আমার সঙ্গে রয়েছে।

বড় রাস্তায় এসেই দু-চোখ জুড়িয়ে যায়। ঘরে যাবার সময় সামান্য দিনের আলো অবশিষ্ট ছিল। তাই তখন এমন আলোর বাহার চোখে পড়ে নি। এখন মনে হচ্ছে সুবিশাল প্রান্তর জুড়ে দেওয়ালী শুরু হয়েছে। মানুষগুলিও উৎসবমুখর। মহোৎসবের মাঝে এসেছি আমি।, চারিদিকে কেবল হাসি গান আর আনন্দ। এমন আনন্দঘন পরিবেশ সত্যই বিরল।

কিন্তু সবাই কি আনন্দময় ? এই ভিক্ষুকের দল ? খঞ্জ অন্ধ অথবা বিকলাঙ্গ কুষ্ঠরোগী হয়েও যাদের আজ আসতে হয়েছে এখানে, এই শীতে বসে থাকতে হচ্ছে পথের ধারে ?

হ্যাঁ, তারাও আনন্দিত। ভিক্ষা দিতে কোন কার্পণ্য করছেন না পুণ্যার্থীরা। ভিক্ষার ঝুলি ভরে উঠছে তাঁদের দানে। তাই মুখে যতই আর্ত চীৎকার করুক, মনে মনে ওরাও আনন্দিত। এখানে যে সবাইকেই আনন্দে থাকতে হয়। এ মেলা সাগরমেলা—আনন্দমেলা।

পুণ্যার্থীদের সমাবেশ হলেও এ মেলা প্রকৃতপক্ষে পুণ্যলাভের মেলা নয়। ভারত-ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন—গঙ্গাসাগর মেলা জনচিত্তের একটি আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান, পুণ্যলাভের সংস্কার এক্ষেত্রে একটি গৌণ প্রেরণা। তীর্থযাত্রীরা এই মহামেলায় সমবেত হয়ে সাগরস্নান করে একটি প্রত্যক্ষ আত্মিক পরিতৃপ্তি লাভ করেন, তাঁরা আনন্দময় হয়ে ওঠেন।

তাহলে শ্যামা ? সে কি কেবলই একা ? কিন্তু কোথায় ? শ্যামাও তো তার দুঃখের পাষাণভারে নুয়ে পড়ে নি ? সে সহজ ভাবেই আমাদের সঙ্গে চলাফেরা করছে, কথাবার্তা বলছে। সে-ও এই আনন্দমেলায় নিরানন্দ হয়ে থাকতে চায় না। তাই শ্যামা বোধ হয় শোককে জয় করেছে।

কিন্তু থাক্, শ্যামার কথা পরে ভাবা যাবে। আগে চারিপাশের মানুষগুলোকে একটু দেখে নিই। যাঁরা পথের দুপাশে বালুকাবেলায় আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁদের সম্বল ছেঁড়া কম্বল, আর চাল ডাল আটা ও নুনের কয়েকটি পুঁটুলি। পরনে ধুলি-ধূসরিত ধুতি কিম্বা শাড়ী। কারও একখানি সুতোর চাদর কিম্বা সোয়েটার, কারও বা শুধুই ফতুয়া।

আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই বোধ হয় বৃদ্ধাটি কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসে কাছে। সকরুণ কণ্ঠে হিন্দীতে বলেন, "আমি সীতাদেবী সুলতানপুর জেলা থেকে এসেছি। সকালে জ্বর হয়েছে। আপনার কাছে ওষুধ আছে বাবুজি! জ্বরটা না কমলে যে কাল স্নান করতে প্যরব না। ষাট বছর ধরে দুটি-চারটি করে পয়সা জমিয়েছি এই স্নানের জন্য।" তাঁর চোখে জল।

শুনেছি এখানে একটি অস্থায়ী হাসপাতাল ও হেলথ্ সেণ্টার খোলা হয়েছে। তাঁকে সেখানে যাবার পরামর্শ দিয়ে এগিয়ে চলি।

চলতে চলতে আলাপ হয় মধ্যপ্রদেশের রূপ সিং-য়ের সঙ্গে। বয়স ষাটের কোঠায়। জীবনে প্রথম বাইরে বেরিয়েছেন। একা নয়, সস্ত্রীক। গাঁয়ের মানুষদের সঙ্গে বাসে এসেছেন। বাসনপত্র ও চাল, ডাল, আটা, নুন সবই সঙ্গে এনেছেন। নিজেরাই রান্না করেন। দুজনের সাড়ে চারশ টাকা বাসভাড়া দিতে হয়েছে। দেড় মাসের সফর। এখান থেকে পুরী রামেশ্বরম দ্বারকা পুষ্কর ও বৃন্দাবন দর্শন করে ঘরে ফিরবেন।

চায়ের দোকানে বসে পরিচয় হল রতনলাল পাঁড়ের সঙ্গে। তিনি এসেছেন বারানসীর উপকণ্ঠ থেকে। বয়স সাতের ঘরে। পেশায় পুজারী। যজমানরা চাঁদা তুলে তাঁকে সস্ত্রীক সাগরে পাঠিয়েছেন। তাঁদের বিশ্বাস —তিনি স্নান করলে তাঁদের সবার পাপও ধুয়ে যাবে।

দোকান ও বাজার সেরে ফিরে আসার পথে অভিনব দৃশ্যটির মুখোমুখি হলাম। নাগা সন্ন্যাসীদের মাঝে বেশ জমিয়ে বসে গাঁজায় দম দিচ্ছিল সে। মালপত্রগুলো একটা দোকানে রেখে আমি তার পাশটিতে এসে বসে পড়লাম। ফরাসী হলেও ছেলেটা মোটামুটি ইংরেজী জানে। জানালো—তার নাম পল, বয়স বিশ। সে দর্শনের ছাত্র। বলল, "আমি পায়ে হেঁটে কলকাতা থেকে এখানে এসেছি।"

জিজ্ঞেস করি, "যাঁর খোঁজে এসেছো, তাঁকে পেয়েছো কি?"

"হ্যাঁ।" তৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দেয় পল। আমি অবাক হয়ে তার দিকে

তাকাই।

সে বলে, "আমি আমার আমিকে খুঁজে পেয়েছি।"

ফিরে এসেই দি'মার মধুর সম্ভাষণ শুনতে পেলাম, "মুখপোড়ার এতক্ষণে ফিরে আসার সময় হল। আমরা বলে এদিকে চিন্তায় মরে যাই, আর উনি বাজারের নাম করে দিব্যি হাওয়া খেয়ে এলেন।"

হেসে বলি, "চিন্তা করছিলে কেন? আমার কি এখনও হারিয়ে যাবার বয়স আছে নাকি?"

"শোন কথা," দি'মা শ্যামার দিকে তাকান, "সাগরমেলায় হারিয়ে যেতে নাকি আবার বয়স লাগে? যাক্ গে, মালসাগুলো ঘরের কোণে রেখে দে, আর বাজারের থলিটা এখানে দে।"

ফল দেখে খুশি হন তিনি। ধুয়ে নিয়ে নিজেই কাটতে শুরু করেন।

আমি রুকস্যাক থেকে এয়ার-ম্যাট্রেস, স্লীপিং-ব্যাগ ও অ্যালকাথিন-শীট্‌টা নামাই। শীট্‌টা দরজায় ঝুলিয়ে দিয়ে এয়ার-ম্যাট্রেস ফুলোতে লেগে যাই। শ্যামা নিঃশব্দে আমার কাজ দেখছে আর দি'মা নীরবে ফল কাটছেন।

সহসা কথাটা মনে পড়ে তাঁর। আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "তোর জন্য যে খাবার আনিস নি বড়?"

"আমি আর খাব না কিছু।"

"কেন?" তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন।

শ্যামাও তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

আমি গম্ভীর স্বরে উত্তর দিই, "আমার খিদে নেই।"

"খিদে নেই মানে?" দি'মার কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়ছে।

আর খেপানো উচিত হবে না। তাই হেসে বলি, "আমি খেয়ে এসেছি।"

"তাই বল্।" দি'মার স্বর খাদে নেমে আসে। খুশীকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, "কি খেয়েছিস?"

"গরম গরম ডাল-পরোটা ও আলুর দম।"

"খুব ভালো করেছিস। যাক, এবারে শুয়ে পড়্।" বলতে বলতে তাঁর নজর পড়ে আমার এয়ার-ম্যাট্রেসের দিকে। বলেন, "না, দেখে তোর বিছানাটা বেশ ভালই মনে হচ্ছে রে!"

"শুয়ে দেখবে নাকি?"

"রক্ষে কর্ বাপু। ওতে আমি ঘুমোতে পারব না।"

"খুব পারবে, ভারী আরাম।"

"তোর আরাম তোরই থাক্ বাবা, আমার ঐ কাঁথা-কম্বলই ভাল।"

স্লীপিং-ব্যাগ খুলে শুয়ে পড়ি আমি। সত্যিই আরাম লাগছে। এতক্ষণ একটু শীত-শীত লাগছিল। বেশ শীত পড়েছে আজ। তাই পড়ে। প্রতিবারেই মেলার সময় যাত্রীরা শীতে কষ্ট পান।

সাগরদ্বীপ বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত। কাজেই এখানে শীত বেশি। বৈশাখ মাসে কলকাতার স্বাভাবিক সর্বোচ্চ উত্তাপ যখন ৯৪·৬° ফারেনহিট, সাগরদ্বীপে তখন ৯০·৮° ফারেনহিট। আর এই পৌষ মাসে কলকাতায় যখন ৮৯·৩° ফারেনহিট, এখানে চলছে ৭৫·৮° ফারেনহিট। তার ওপর গঙ্গাসাগরে দিনরাত প্রবল বাতাস বয়। তাতে শীতকষ্ট আরও বাড়ে। তবে আমাদের কুঁড়েগুলি নিচু হওয়ায়, তেমন একটা হাওয়া ঢুকছে না ভেতরে—ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। অবশ্য আনন্দিত হবার কারণ নেই, যে কোন সময়ে সাগরের মত্ত-পবন আমাদের আশ্রয়টুকুকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে।

খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেন দি'মা। তিনি শুলেন বেড়ার ধারে, আমি শুয়েছি দরজার কাছে। শ্যামা শোবে মাঝখানে। পাছে সে ভয় পায়, তাই দি'মা নিজেই এ ব্যবস্থা করেছেন।

শ্যামা কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে। ফুঁ দিয়ে মোমটা নিবিয়ে দেয়। মুহূর্তের মাঝে গহন অন্ধকারে ডুবে যাই আমরা।

আঁধার—নিকষ কালো আঁধার। শ্যামা আলোটা নিবিয়ে দিল কেন? এক সময় মোমটা তো নিজেই নিঃশেষ হয়ে যেত। তবে কি এই অন্তহীন আঁধারকে আহ্বান করার জন্যই সে অমন তাড়াহুড়া করে আলোটা নিবিয়ে দিল? সে নিজেকে এই আঁধারে নিমজ্জিত করতে চাইছে, কিম্বা এই আঁধার ভুবনে আলো হয়ে বেঁচে থাকতে চাইছে?

এলোমেলো চিন্তায় কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না। তবে মেলা এখন শান্ত। মানুষের কোলাহল এবং মাইকের গর্জন আর কানে আসছে না। রাত্রি কিন্তু শব্দহীন নয়। ভেসে আসছে সমুদ্রের গম্ভীর গর্জন আর বাতাসের একটানা তর্জন। মানুষকে নীরব দেখে ওরা যেন আরও জোর পেয়েছে।

দি'মা ও শ্যামার সাড়া পাচ্ছি না। ওরা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ভালই করেছে। কাল থেকে তো দেহ আর মনের ওপর দিয়ে কম ধকল যায় নি!

কতক্ষণ বাদে বলতে পারি না, একটা কান্নার শব্দে আমার তন্দ্রা টুটে যায়। কে কাঁদছে? কোথায় কাঁদছে? আমাদের ঘরে কি?

তাড়াতাড়ি মাথার ওপর থেকে স্লীপিং-ব্যাগের 'হুড্'টা সরিয়ে দিই। হ্যাঁ, কেউ কাঁদছে—শব্দহীন কান্না। আমাদের ঘরে—আমার পাশে।

স্লীপিং-ব্যাগের 'জীপ' খুলি। হাত বের করে টর্চ জ্বালাই। হ্যাঁ, শ্যামাই কাঁদছে।

উঠে বসি। বলি, "ছি, কাঁদছেন কেন? কাঁদলে যে বাবাজীর আত্মার অকল্যাণ হবে। তিনি পুণ্যবান, সাগরে দেহরক্ষা করেছেন।"

"কিন্তু তাঁর যে বড় আশা ছিল, মকর সংক্রান্তিতে সাগরে স্নান করবেন। পারলাম না গোসাঁই। আমি তাঁকে গঙ্গাসাগরে স্নান করাতে পারলাম না।" শ্যামা একেবারেই ভেঙে পড়ে। সে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে।

নীরব কিছুক্ষণ। কেউ ঘণ্টা বাজিয়ে জানিয়ে দিল রাত একটা।

শ্যামার সম্বিৎ ফিরে আসে। আঁচলে চোখ মুছে অনেকটা স্বাভাবিক স্বরে বলে, "নিজেও ঘুমোতে পারলাম না, তোমাকেও ঘুমুতে দিলাম না। এবারে শুয়ে পড়। আজ রাতে আমার আর ঘুম আসবে না।"

"আপনাকে ঘুমোতেই হবে।" গম্ভীর স্বরে বলি।

"আমার যে ঘুম আসছে না গোসাঁই।" শ্যামা অসহায় কণ্ঠে বলে।

"বেশ, ওষুধ দিচ্ছি। কিন্তু ঘুমুতে আপনাকে হবেই।" আমি একটি বড়ি বের করে শ্যামার হাতে দিই। জলের বোতলটা এগিয়ে ধরি।

শ্যামা উঠে বসে। ওষুধটা হাতে নেয়। খুলতে গিয়ে থেমে যায়। বড়িটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ে। 'কাঁদতে শুরু করে। কারণ বুঝতে পারছি না। ভয় হচ্ছে, এখুনি হয়তো দি'মার ঘুম ভেঙে যাবে।

কেটে যায় কিছুক্ষণ। আমি শ্যামার একখানি হাত ধরে বলি, "উঠুন, ওষুধটা খেয়ে নিন।"

"আমি পারব না গোসাঁই, আমি পারব না এ ওষুধ খেতে।"

"কেন?"

"কাল রাতে তুমি ওনাকে এই ওষুধ দিয়েছিলে।"

চমকে উঠি, তাই তো! কাল ঘুমোতে পারছিলেন না বাবাজী, তাঁকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলাম। আজ বাবাজী চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর তিনি মহানিদ্রার কোলে আশ্রয় নিয়েছেন বলেই শ্যামা আজ নিদ্রাহীনা।

তবু কথা বলতে হয় আমাকে। আস্তে আস্তে বলি, "তাঁর জন্যই যে বেঁচে থাকতে হবে আপনাকে। তিনি নেই, কিন্তু রয়েছে তাঁর আশ্রম—বাবাজীর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। স্রষ্টার জন্যই সেই সৃষ্টিকে রক্ষা করতে হবে আপনার। আপনার তো এমন ভেঙে পড়লে চলবে না। উঠুন। ওষুধটা খেয়ে নিন।" আমি দু-হাত দিয়ে ধরে তাকে উঠিয়ে বসাই।

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে যায়। শ্যামা চোখ মোছে। আমার হাত থেকে ওষুধ আর জলের বোতল নেয়। ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়ে।

একটু বাদে শ্যামা বলে, "যাও, এবারে টর্চ নিবিয়ে শুয়ে পড়।"

"আগে আপনি ঘুমোন। আমি তারপরে শোব।" টর্চ নিবিয়ে দিই। আস্তে আস্তে শ্যামার খোলা চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিতে থাকি।

শ্যামা চুপ করে আছে। সে ঘুমোবার চেষ্টা করছে কি?

শ্যামা পাশ ফেরে। সে দু-হাতে আমার একখানি হাত আঁকড়ে ধরে—অনেকটা নিমজ্জমান মানুষের মতো।

আরও কাছে এগিয়ে আসে শ্যামা—আমার কোলে মুখ লুকিয়ে সে আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে।

কাঁদুক শ্যামা। ওর অশ্রুধারায় সিক্ত হচ্ছে আমার শরীর। তবু ওকে বাধা দেব না আমি। কাঁদতে কাঁদতেই সে একসময় ঘুমিয়ে পড়বে।

আমি স্থির হয়ে বসে অস্থির শ্যামার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকি। উন্মত্ত পবনের তর্জন, উচ্ছলিত সাগরের গর্জন, আর উন্নিদ্র সতীর ক্রন্দন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই সাগরমেলায়—মানুষের এই মহামেলায়।

॥ এগারো ॥

"ওরে ও মুখপোড়া, আর কতক্ষণ ঘুমোবি? তীথ্যে এসে এত বেলা অবধি ঘুমোলে যে অকল্যাণ হয়!"

দি'মার ডাকে ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে দেখি ভিজে কাপড় শুকোতে দিচ্ছে শ্যামা।

"আপনারা কি স্নান করে এলেন নাকি?"

"হ্যা।" শ্যামা উত্তর দেয়। আমার চোখে চোখ পড়তেই সে চোখ

ফিরিয়ে নেয়।

শ্যামা তো এমন বড় একটা করে না। তবে কি সে লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিল? কিন্তু কেন, কিসের লজ্জা? কাল রাতে সে যা করেছে, তার জন্য তো লজ্জিত হবার কিছু নেই।

তবে কাল রাতের কথা এখন থাক্, আজ সকালের কথাই বলা যাক্। তাই বলি, "আজ এত সকালে স্নান করার কি দরকার ছিল?"

শ্যামা চুপ করে থাকে।

দি'মা বলেন, "দরকার ছিল বলেই তো যাওয়া।"

"কি দরকার?"

"ওকে তর্পণ করতে হবে না?" তিনি শ্যামাকে দেখিয়ে দেন। "তাছাড়া স্নান করার জন্যই তো সাগরে আসা।...ওসব তুই বুঝবি নে। যা, টিপকল থেকে মুখ ধুয়ে নিয়ে দোকান থেকে চা খেয়ে আয়।"

"তোমরা?"

"আমি চা খাই নে। আর শ্যামা চা খাবে না।"

"কেন?"

"কেন কেন করিস না তো! যা বললাম তাই কর গে, যা।"

আর কথা বাড়ানো ঠিক নয়। দি'মা রেগে গেছেন। তাড়াতাড়ি উঠে বসি। ম্যাট্রেসের তলা থেকে ঘড়িটা নিই। আটটা বেজে গেছে। সত্যি এত বেলা অবধি ঘুমনো উচিত হয় নি।

ঘুমের কি দোষ? কাল শ্যামা ঘুমিয়ে পড়ার পরে, ওকে বালিশে শুইয়ে দিয়ে আমি নিজের বিছানায় এসেছি। রাত তখন দুটোর কম হবে না। আজ সকালে কখন যে দি'মা ঘুম থেকে উঠেছেন, শ্যামাকে ডেকে তুলেছেন, আর কখনই বা দুজনে সাগরস্নানে বেরিয়ে গেছেন, কিছুই টের পাই নি।

বাইরে রোদ উঠে গেছে। হোগলার বেড়ার ফাঁক দিয়ে তার অনেকখানি ঘরে এসে পড়েছে। গামছা ও টুথব্রাশ নিয়ে বেরিয়ে আসি বাইরে।

আসি কলতলায়। দি'মার ভাষায় টিপকলে। কিন্তু এখানে যে লোকে লোকারণ্য। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসী এবং বহু অভারতীয় স্ত্রী-পুরুষ হাঁড়ি কলসি গামলা বালতি ও ঘটি ইত্যাদি যাবতীয় পাত্রসহ জড়ো হয়ে নিজ নিজ মাতৃভাষায় ঝগড়া করছে। সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকলেও যে মুখ

ধোবার সুযোগ পাব, সে ভরসা নেই। কয়েক লক্ষ লোকের জন্য যেখানে গুটিকয়েক টিউবওয়েল, সেখানে এ অবস্থা খুবই স্বাভাবিক। জল নেই, পায়খানা নেই, নর্দমা নেই। নোংরা পরিষ্কারের ব্যবস্থা নেই। কালই দেখেছি সাগরপাড়ে পা ফেলা যায় না। আজ তো আরও কত মানুষ আসবে। আগামী কাল স্নানের সময় সাগরসঙ্গমের কি হাল হবে, বাবা কপিলমুনিই জানেন।

অনেকের ধারণা এই মেলা-প্রাঙ্গন স্থায়ী স্থল নয়, বর্ষাকালে এর প্রায় সবটাই সাগরে চলে যায়, তাই এখানে কোন স্থায়ী ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। মূল মেলা-প্রাঙ্গণ এখন সমুদ্রগর্ভে। তাই এ বছর মাইল তিনেক জঙ্গল কেটে নতুন মেলাক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে। এটি মোটামুটি স্থায়ী স্থল। এখানে কিছু কিছু স্থায়ী ব্যবস্থা করা সম্ভব।

কাজেই ভূখণ্ডের স্থায়িত্ব কোন সমস্যা নয়, আসল সমস্যা হচ্ছে সদিচ্ছা—সাগরমেলার উন্নতিবিধানের আগ্রহ। এই আগ্রহ নেই বলেই বিগত পঞ্চাশ বছরে এ মেলার কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নি।

অথচ প্রতি বছর মেলার সময় ও মেলার পরে কয়েকদিন ধরে কাগজে ও বক্তৃতায় প্রচুর পরিমাণে এই আগ্রহ দেখানো হয়। তারপরে পরবর্তী বছরের মেলা পর্যন্ত একটা অখণ্ড নীরবতা পালন করেন তাঁরা। ফলে আজও এখানে বহু প্রস্তাবিত 'ফ্লোটিং বার্জ' কিম্বা 'পনটুন ব্রিজ' নির্মিত হয় নি।

পাবলিক হেল্‌থ ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা এই মেলার পরিচালক। মেলার জন্য প্রতি বছর তাঁদের প্রায় দশ লক্ষ টাকা খরচ করতে হয়। তারপরে রয়েছে শান্তিরক্ষার জন্য পুলিস বিভাগের ব্যয়। দুর্ভাগ্যের কথা সাগরমেলা একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার কোন সাহায্য করেন না। একা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেই সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে হয়।

অথচ মেলা থেকে রাজ্য সরকারের কোন আয় নেই। দর্শকদের প্রণামী লক্ষ লক্ষ টাকা অযোধ্যায় চলে যায়। কেন যে এই মন্দিরকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হচ্ছে না বুঝতে পারছি না।

আগে জেলা বোর্ড যাত্রীদের কাছ থেকে জনপ্রতি এক টাকা করে তীর্থকর আদায় করতেন। এখন তাও নেওয়া হয় না। তাই রাজ্যসরকার মাথাপিছু দু-টাকা ফি আদায়ের কথা ভাবছেন। পনেরো বছরের বেশি বয়সের তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকেই কেবল এই ফি নেওয়া হবে। সাধুদের

ফি লাগবে না। এতে ছ-সাত লক্ষ টাকা আয় হবে। এবং সরকার সে টাকা সাগরদ্বীপের উন্নয়নে ব্যায় করবেন।

জনৈক সরকারী মুখপাত্রের কাছে শুনেছি তাঁরা আগামী বছর আরও ওপরে, ঐ বনবিভাগের জমিতে মেলা সরিয়ে নিতে চাইছেন। মন্দিরের মোহান্তও নিজব্যয়ে সেখানে মন্দির নির্মাণ করতে সম্মত হয়েছেন। জানি না কবে এই প্রস্তাব কার্যকরী হবে। হলে কিন্তু সাগরমেলার দুরবস্থার অবসান ঘটবে। কারণ স্থায়ী মন্দির ও স্থায়ী মেলাক্ষেত্র তৈরি হলে প্রচুর বে-সরকারী সাহায্য আসতে শুরু করবে। ভারতের প্রত্যেক তীর্থ ই ধর্মপ্রাণ মানুষদের ব্যক্তিগত বদান্যতায় গড়ে উঠেছে।

অবশেষে মুখ ধোবার সুযোগ পাওয়া গেল। ঘরে ফিরে দেখি, দি'মা জনতা স্টোভ জ্বালিয়েছেন—জল ফুটছে।

আমাকে দেখেই দি'মা বললেন, "যাক্, তোকে আর চা খেতে বাইরে যেতে হবে না, শ্যামার সঙ্গে চায়ের সরঞ্জাম সবই আছে, এখানেই চা বানাচ্ছি।"

"উনিও কি তোমার মুড়ি আনার মতো আমার জন্য চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এসেছেন নাকি?" সহাস্যে বলি।

"না।" শ্যামা ভারী স্বরে উত্তর দেয়, "যাঁর জন্য এনেছিলাম, তিনি কাল চায়ের মায়া কাটিয়ে চিরদিনের জন্য চলে গেছেন।"

এমন উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তাই একটুকাল চুপ করে থেকে সংযত স্বরে প্রশ্ন করি, "তিনি কি একাই চা খেতেন?"

"না। আমিও খেতাম।"

"তাহলে আজ খাচ্ছেন না যে?"

"দি'মা না করেছেন।"

"নেশার জিনিস না হলে যে শরীর খারাপ করবে। আমি তো অনেককেই এ অবস্থায় শুদ্ধমত বানিয়ে চা খেতে দেখেছি।"

দি'মা কিছু বলার আগেই শ্যামা বলে, "আপনার নাতির কথা শুনেছেন?"

"কি?" দি'মা প্রশ্ন করেন।

"সে আমাকে চা খেতে বলছে। বলছে, না খেলে নাকি শরীর খারাপ করতে পারে।"

"খাবি?"

"দোষ কি, আপনি তো নিজের হাতে বানাচ্ছেন।"

"তাহলে খা একটু।" দি'মা ফুটন্ত জলে আর এক কাপ ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেন। সঙ্গে সঙ্গে জলের টগবগানি বন্ধ হয়ে যায়।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে শ্যামা বলে, "আমরা কিন্তু চা খেয়েই মেলা দেখতে বের হব। কাল অনেক হাঙ্গামা। তাছাড়া কাল আরও ভিড় বাড়বে, মেলায় পা ফেলাই দায় হবে।"

"কিন্তু তুই হবিষ্যি করবি কখন?"

"মেলা দেখে ফিরে এসে।"

"সে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে।"

"হোক গে।"

"না, না। তা হয় না। তার চেয়ে বরং একটা কাজ কর্।"

"কি?"

"তুই চাল ধুয়ে একটা মালসায় করে চড়িয়ে দিয়ে যা, আমি নাবিয়ে রাখব'খন।"

"তাতে কোন দোষ হবে না তো?"

"না, দোষ কিসের, আমি বামুনের বালবিধবা, আমার সে অধিকার আছে।"

শ্যামা তাই করে। মালসা চাপিয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে। বলে, "চল।"

"চলুন।" আমি হাঁটতে শুরু করি।

দি'মা ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলেন, "দেখিস, বেশি দেরি করিস নে যেন। শীতের বেলা—সব জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে।"

"না, না। দেরি করব কেন, এই যাব আর আসব।" দি'মাকে আশ্বস্ত করে এগিয়ে চলি।

শ্যামা হাসে। কেন বুঝতে পারি না। আমি নিঃশব্দে পথ চলি।

কাল যখন এসেছিলাম, তখন অনেক ঘর খালি ছিল। আজ দেখছি প্রায় সব ঘরই যাত্রীবোঝাই। তার মানে সারারাত ধরেই যাত্রী এসেছেন।

একটা ঘরের সামনে দেখছি খুব ভিড়। আজকাল আবার আমার ভিড় দেখলেই ভয় হয়।

না, জনসমাবেশ হলেও জনগণের ব্যাপার নয়। জনৈক মাড়োয়ারী মহিলা তুলোর কম্বল, ভুটীয়া সোয়েটার ও গেঞ্জি বিতরণ করছেন—দরিদ্র-

নারায়ণের সেবা করছেন, তাই এই ভিড়।

দান ছাড়া সাগরস্নান অর্থহীন। প্রত্যেক পুণ্যার্থীকেই তাই কিছু-না-কিছু দান করতে হয়। স্নানের সময়েও সমুদ্রে পঞ্চরত্ন নিক্ষেপ করতে হয়। তার সঙ্গে অন্তত একটি পয়সা থাকে। সমুদ্র কখনও মানুষের দান গ্রহণ করে না। সে তরঙ্গবাহু দিয়ে সব ফিরিয়ে দেয় তারে, একদিনে নয় সারা বছর ধরে। আর স্থানীয় দরিদ্র জনসাধারণ পরম যত্নে সমুদ্রের সেই দান গ্রহণ করে। মেলার সময় তো বটেই, মেলার পরেও প্রতিদিন সকালে তারা একখানি কাঠের হাতা নিয়ে সাগরতীরে আসে। পয়সা খোঁজে। পায় বৈকি, নইলে তাদের সংসার চলে কেমন করে? মেলার সময় মাস-খানেক মেলার কাজ ও চাষের সময় সব মিলিয়ে মাস-চারেক ক্ষেতের কাজ করা ছাড়া, গঙ্গাসাগরে ভূমিহীন কৃষকদের যে আর কোন কাজ নেই। সমুদ্রতীরে পয়সা কুড়িয়ে বাকি মাস-ছয়েক প্রাণধারণ করতে হয় ওদের। সাগরই সারদ্বীপ-বাসীদের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়।

ছোট গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় আসি। শ্যামা ঠিকই বলেছে। কাল রাতের চেয়ে আজ সকালের মেলা অনেক বেশি জনবহুল। ইতিমধ্যেই দোকানপাট সব খুলে গেছে। ক্রেতা-দর্শকরা ভিড় জমিয়েছে দোকানের সামনে। রীতিমত ভিড় ঠেলে এগোতে হচ্ছে। মাঝে মাঝেই কর্দমাক্ত পথ। শ্যামা তো একবার প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। ভাগ্যিস ওকে সময়মতো ধরে ফেলেছিলাম!

শ্যামা কিন্তু বড়ই অন্যমনস্ক। সে একমনে কেবলই সাধুদের দেখছে। হয়তো নিজে সাধ্বী বলেই।

তাছাড়া একসঙ্গে এত সাধুকে দর্শন করতে পারার সৌভাগ্য যে সবার জীবনে হয় না। অসংখ্য সাধু বসে রয়েছেন পথের দুধারে। রয়েছেন বিভূতি-ভূষিত জটাজুটধারী দিগম্বর নাগাসাধু, মুণ্ডিত-মস্তক গৈরিকধারী পরমহংস সন্ন্যাসী, রক্তবসন-পরিহিত কাপালিক ও অবধূত। রয়েছেন বৈদান্তিক ও মায়াবাদী, শাক্ত ও বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও জৈন সন্ন্যাসীগণ। ধর্মমত ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই এসে সমবেত হয়েছেন এখানে—এই মহামানবের সাগরতীরে।

শ্যামা বোধ করি বৈচিত্র্যের মাঝে মিলনের সন্ধান পেয়েই এমন অনুসন্ধিৎসু। ওরা যে প্রতিযোগী হলেও ওদের আচরণে প্রচুর মিল রয়েছে।

দানধর্মের প্রতি যাত্রীদের প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্য ওদের কারও চেষ্টার বিরাম নেই। সাকরেদেরা আপন আপন মহাত্মার মহত্ত্ব প্রচার করে সমানে বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। তবে একে বক্তৃতা না বলে পাবলিসিটি বললেই বোধ করি উচিত হবে। একেবারে আধুনিক পাবলিসিটি।

কেবল লেকচার নয়, ক্যারিকেচারও আছে। যেমন জনৈক সাধুকে তাঁর শিষ্য কিম্বা গুরুদেব মাটিতে পুঁতে রেখেছেন। কেবল তাঁর মাথাটি মাটির ওপরে রয়েছে। একজন সাধু তাঁর জিহ্বার ভেতর একটি লৌহফলক ঢুকিয়ে হাঁ করে বসে আছেন। আরেকজনকে তিনখানি খড়্গের ওপরে শুইয়ে রাখা হয়েছে। কেউ শীর্ষাসনে অথবা যোগাসনে বসে উদাস দৃষ্টি মেলে চেয়ে রয়েছেন পথচারীদের দিকে। কেউ খালিগায়ে কাঁটার ওপরে শুয়ে আছেন। কেউ বা গর্তের ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে পা-দুটি উঁচু করে রয়েছেন। এমনি আরও অনেক। চমৎকৃত পুণ্যার্থীগণ তাঁদের প্রত্যেককেই পয়সা দিচ্ছেন। শ্যামাও শাড়ির আঁচলে একগাদা পয়সা নিয়ে ছড়াতে ছড়াতে পথ চলেছে।

চারিদিকে মাইক বাজছে। সবই সিনেমার গান আর অধিকাংশই হিন্দী সিনেমা। বসেছে পুতুল-নাচ, পুতুল-প্রদর্শনী, মরণ-কূঁয়া, মোটর-সাইকেলের কসরৎ, ছোট সার্কাস, ম্যাজিক আর ম্যাজিকলণ্ঠন। সবাই মাইক বাজাচ্ছে।

কিন্তু যে মাইকের আওয়াজ অন্য সব মাইকের শব্দকে ছাপিয়ে কানে এসে বাজছে, সেটি মেলা-কর্তৃপক্ষের। পথের ধারে বড় বড় লাউড স্পীকার লাগানো রয়েছে। তাতেই ভেসে আসছে তাঁদের ঘোষণা—কোন্ স্টীমার এইমাত্র এসে পৌছল, কোথায় গেলে আশ্রয়ের ব্যবস্থা হবে? অনুসন্ধান-কেন্দ্র হাসপাতাল আদালত ও থানা কোথায়? আর নিরুদ্দেশ-প্রাপ্তির সংবাদ। প্রতি মিনিটে বোধ হয় একজন করে মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে। 'ইনফরমেশান টাওয়ারে' গেলে যে সেই হারানিধির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে, সেই কথাই বার বার ঘোষণা করা হচ্ছে। ঢালাও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, 'কেউ হারিয়ে গেলেই ইনফরমেশান টাওয়ারে চলে আসুন। যে হারিয়েছেন এবং যাঁরা হারিয়েছেন, সবাই চলে আসুন। টাওয়ার কোথায় না জানলে, কর্মরত পুলিসের সাহায্য নিন।'

হ্যাঁ, পুলিস কর্মচারীরা সাহায্য করছেন বৈকি। হাজার দশেক পুলিস-কর্মী সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা অস্বীকার করে অম্লান বদনে সবাইকে সাহায্য করে চলেছেন। ভি. আই. পি.-দের সেবা ও সাধারণ মানুষদের সাহায্য করার জন্যই যে ওঁদের জন্ম। অবশ্য সাহায্য করতে গিয়ে মার খাওয়াও

ওঁদের ধর্ম। ওঁরা ধার্মিক, তাই অবস্থাটাকে মেনে নিয়েছেন। সেই সঙ্গে আমরাও জেনেছি—যাগ-যজ্ঞ, বিয়ে-শ্রাদ্ধ, পুজা-জলসা, সভা ও খেলা কোনটাই যেমন পুলিস ছাড়া সম্ভব নয়, তেমনি পুলিসের গায়ে ইট-পাটকেল, এ্যাসিড-বাল্ব ও পটকা নিক্ষেপের অধিকারও আমাদের সহজাত। কারণ ওরা পুলিস, ওরা মানুষ নয়।

অথচ মানুষের মঙ্গল করতে গিয়েই ওঁদের এমন অমানুষ হতে হয়েছে। রাস্তার পাগলা-ষাঁড় থেকে হাওড়া-পুলে আরোহণকারী পাগলকে বশ করতে হচ্ছে যাঁদের, বেওয়ারিশ শবদাহ করা থেকে বেপাত্তা ওয়াগন-ব্রেকারকে খুঁজে বের করতে হচ্ছে যাঁদের, তাঁদের প্রতি কেন এই অশ্রদ্ধা পোষণ করছি আমরা? এজন্য কে বা কারা দায়ী, সে বিচার করবার যোগ্যতা নেই আমার। কারণ আমি একজন নগণ্য লেখক, আমার কোন দল নেই। আমি কেবল শ্রীধাম গঙ্গাসাগরে দাঁড়িয়ে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে পারি—মা-গঙ্গা, তুমি পুলিসদের পরমায়ু প্রদান কর।

দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। কি দেখব, কত দেখব! এর যে আর শেষ নেই। দোকান আর দোকান—তিন হাজারের বেশি দোকান বসেছে এবারে।

কেবল কেনা-বেচার দোকান নয়, আরও এক রকমের দোকান বসেছে। অ-সাধুরাও সাধুদের সরিক হয়েছে। কদম গাছের বেশ বড় একটা ডাল পুঁতে তার তলে দুটি কিশোর-কিশোরী রাধাকৃষ্ণের রূপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কৃষ্ণ মাঝে মাঝে বাঁশি বাজাচ্ছে। এক জায়গায় দেখতে পেলাম রাম লক্ষ্মণ ও হনুমানকে। আরও অনেক অবতারকে দর্শন করবার সৌভাগ্য হল আজ।

তাঁদের সবাইকে দর্শনী দিয়ে শ্যামার সঙ্গে চললাম এগিয়ে। সহজ ও সুগম পথে নয়, মানুষের ভিড়ে রীতিমত জটিল ও দুর্গম পথে।

মানুষ আর মানুষ—লাখ পাঁচেক মানুষ এসে গেছে ইতিমধ্যে, আরও কত আসবে কে জানে! সেই মূক অতীত থেকে এই মুখর বর্তমান পর্যন্ত প্রতি মকর সংক্রান্তিতে সংখ্যাতীত মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা আর পাওয়া না-পাওয়ার পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত এই পরম পবিত্র সঙ্গম।

জনসমাজে গঙ্গাসাগর তীর্থমাহাত্ম্য কতকালের প্রাচীন এবং কবে থেকে এই দ্বীপে মেলা বসতে আরম্ভ করলো তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মতে ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়নের বহু পূর্ব থেকেই সাগরতীর্থ

বর্তমান ছিল। কথিত আছে শ্বেতদ্বীপের অধিপতি রাজা মাধব বঙ্গোপসাগরের তীরে এক বিশাল বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই বিষ্ণুমন্দির ঠিক কোথায় ছিল এবং সমুদ্র তাকে কবে গ্রাস করেছে সেকথাও ঐতিহাসিকগণ সঠিকভাবে বলতে পারেন না। ১৮৩৭ সালে "হরকরা" পত্রিকায় পরিবেশিত হয়—

"ঐ স্থানে (গঙ্গাসাগরে) যে এক মন্দির আছে তাহা লোকে কহে যে ১৪০০ বৎসর হইল গ্রথিত হইয়াছে।…ইঙ্গরেজী ৪৩৭ সালে ঐ মন্দির গ্রথিত হইলে জয়পুর রাজ্যস্থ গুরুসম্প্রদায় কর্তৃক উক্ত সিদ্ধর্ষি (কপিল মুনি) প্রতিষ্ঠিত হন।"*

আবার শ্রীনন্দলাল দে রচিত 'The Geographical Dictionary of Ancient & Mediaeval India' বইতে পড়েছি 'Sagar-Sangama… said to have been the hermitage of Rishi Kapila. The temple in honour of Kapil Muni in Sagar Island was erected in 430 A. D., but it was washed away by the sea in 1842. It once contained a population of 200,000.'

কেবল সেকালে নয়, একালের সাহিত্যেও গঙ্গাসাগরের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস গড়ে উঠেছে গঙ্গাসাগরের পটভূমিকায়। ১৮৬০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুর জেলার নেওয়া মহকুমার ডেপুটি কলেক্টর পদে যোগদান করেন। এই সময়েই তিনি সমুদ্র দর্শন করেন এবং একদিন তাঁর সঙ্গে একজন কাপালিকের সাক্ষাৎলাভ ঘটে। আর তারই ফলে রচিত হয় 'কপালকুণ্ডলা'।

রবীন্দ্রসাহিত্যেও গঙ্গাসাগরের স্থান সুপরিচিত। সেকালের সমাজজীবনে গঙ্গাসাগরের কি সীমাহীন প্রভাব ছিল, তা আমরা কবিগুরুর 'দেবতার গ্রাস' কবিতার মধ্যে দেখতে পাই। এই কবিতাটি রচিত হয়েছিল ১৮৯৩ সালে অর্থাৎ কপালকুণ্ডলা রচিত হবার একত্রিশ বছর পরে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দ্বিতীয় বাংলা উপন্যাস কপালকুণ্ডলা রচনা করেন ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে।

ভারতের সমাজজীবনে যেমন বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত গঙ্গাসাগরের প্রভাব কমে নি, তেমনি রবীন্দ্রনাথের পরেও সে প্রভাব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি।

কিন্তু সাগরদ্বীপের মানুষ আর সাগরসঙ্গম যাত্রীদের বহু অভিযোগ জমে

---

* 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা'।

আছে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ১৮০৮ সালে সাগরদ্বীপ উন্নয়নের জন্য যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, আজ পর্যন্ত তার রূপায়ণ হয় নি।

সেকালে প্রাণ হাতে করে মানুষকে গঙ্গাসাগর আসতে হত। দুঃসহ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে পুণ্যার্জনের জন্য তাঁরা সাগরসঙ্গমে আসতেন। তাঁদের অনেকেই ঘরে ফিরতে পারতেন না। তীর্থ কিংবা তীর্থপথের ধূলিতে তাঁরা শেষ শয্যা পাততেন—অক্ষয় স্বর্গলাভ করতেন। কেউ বা সঙ্গমে সন্তান বিসর্জন পর্যন্ত দিয়ে পুণ্যার্জন করতে চাইতেন।

একালের মানুষের পুণ্যের চেয়ে পাপের প্রতি আকর্ষণ প্রবলতর। জীবনের চেয়ে বড়, আরামের চেয়ে আপনার ও সুখের চেয়ে বরণীয় বস্তু নেই আজকের মানুষের। তাই গঙ্গাসাগর মেলার অব্যবস্থার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ তাদের।

অভিযোগ আমারও। যে যুগে মানুষ চাঁদে যাচ্ছে, সে যুগে একাশি মাইল পথ আসতে কেন এত দুঃখ-কষ্ট সইতে হবে? ভারতের বৃহত্তম নগরীর এত নিকটে অবস্থিত হয়েও কেন সেখানে এসে মানুষ প্রতি বছর দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রাণ হারাবে?

সাগরমেলা ভারতের বৃহত্তম বাৎসরিক মেলার অন্যতম। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী প্রতি বছর এখানে সমবেত হন। কোটি কোটি টাকা তাঁরা এখানে ব্যয় করেন। কিন্তু সাগরমেলার অব্যবস্থা কল্পনাতীত। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যাঁরা সাগরমেলায় এসেছেন, তাঁদের কেউ যদি আজ এখানে এসে থাকেন, তাহলে তিনি দেখবেন—সাগরমেলা ঠিক একই রকম রয়েছে। সেই হোগলার ঘর, যাতে রোদ ও জল কোনোটাই আটকায় না। আজও এখানে তেমনি স্থানাভাব, তেমনি জলাভাব, তেমনি নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। তিনি আশ্চর্য হবেন যে, জগতের এত পরিবর্তন হল কিন্তু সাগরমেলা অপরিবর্তিত। সেকালে যেমন দুর্ঘটনা ঘটত, একালেও তেমনি ঘটছে। বরং তিনি ভেবে বিস্মিত হবেন যে, আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটছে না কেন?

অথচ এমনটি হওয়া উচিত নয়। পশ্চিমবঙ্গের দুটি মাত্র সর্বভারতীয় তীর্থের একটি গঙ্গাসাগর। নৈতিক দায়িত্বের কথা বাদ দিয়েও, যাত্রীদের সুখ-সুবিধা ও নিরাপত্তার দিকে নজর দেবার প্রয়োজন আছে। সাগরমেলা থেকে রাজ্য সরকার বহু টাকা আয় করতে পারেন। সাগরমেলার অব্যবস্থার কথা ভারতে বহুল প্রচারিত। কাজেই অনেক পুণ্যার্থী ভয়ে এখানে আসেন না। সুব্যবস্থা হলে আরও বহু যাত্রী মেলায় যোগদান করবেন।

মন্দিরকে ডানদিকে রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি উত্তরে। চারিদিকেই মেলা—কোথাও দোকানপাট, কোথাও যাত্রীনিবাস। সবই হোগলা কিম্বা ত্রিপল দিয়ে ছাওয়া অস্থায়ী আস্তানা। তারই ভেতর দিয়ে চলেছি আমরা।

স্থায়ী আস্তানাও অবশ্য আছে এখানে। একটি কপিলমুনি মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্বে—সাগরতীরে। বড় একটা টিনের ঘর—সরকারী গুদাম। আর একটি উত্তর-পশ্চিমে—সাধুদের কলোনী। সব মিলিয়ে খানছয়েক খড়ের ঘর। খড় আর মাটি দিয়েই ঘর তৈরি হয় সাগরদ্বীপে। আট-দশ জন সাধু স্থায়ীভাবে বাস করেন এই কলোনীতে। সাধন-ভজন নিয়ে থাকেন। তাঁদের কলোনীর চারিদিকে খেজুরপাতা ও হোগলার বেড়া। বেড়ার ধারে মাঝে মাঝে ফণি-মনসার ঝোপ। ভেতরে কয়েকটি খেজুর ও নারকেল গাছ আর ছোট একটি পুকুর। বেশ আছেন এঁরা। মেলার কদিন কেবল অশান্তি। নইলে সারা বছর পরম প্রশান্তিতে দিনাতিপাত করেন এই নির্জন সৈকতে।

সাধুবাবাদের কলোনীর পরেই ছোট একটি খাল। দক্ষিণ-পুর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিমে প্রসারিত। সঙ্কীর্ণ খাল, জোয়ারের সময় বেশ খানিকটা ভরে ওঠে, কিন্তু ভাঁটায় একেবারেই জলহীন হয়ে পড়ে। তখন কেবলই কাদা। একে অবশ্য খাল না বলে খাঁড়ি বলা উচিত হবে। ইংরেজরা বলতেন **Creek.** আগে এমনি অসংখ্য খাঁড়ি ছিল সাগরদ্বীপে। সেগুলি গঙ্গা ও মুড়িগঙ্গার মধ্যে সমান্তরালভাবে প্রবহমান ছিল। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টি ছিল সাগরদ্বীপ। পরবর্তীকালে সেই খাঁড়িগুলি ভরে যায় অথবা ভরিয়ে ফেলা হয়। এখন সাগর দ্বীপ একটি অবিভক্ত ভূখণ্ড। এতে যাতায়াতের সুবিধা হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু জমির উর্বরতা গেছে কমে। আর সে হয়েছে বন্যার শিকার। ঐ খাঁড়িগুলি ছিল জল নিষ্কাশনের নর্দমা। বর্ষা ও প্লাবনের জল সেগুলি দিয়ে নদীতে নেমে যেত।

সাগরদ্বীপে সামান্য যে-কটি খাঁড়ি এখনও অবশিষ্ট আছে, এটি তার অন্যতম। এই খাঁড়িকে 'ড্রেজ' করার একটি প্রস্তাব কিছুকাল থেকে বিবেচনাধীন রয়েছে। এই প্রস্তাব কার্যকরী হলে 'ফ্লোটিং বার্জ' কিম্বা 'পনটুনন ব্রিজ'-য়ের অভাব অনেকাংশে মিটে যাবে। বাসস্থানের সমস্যারও আংশিক সমাধান হবে। কারণ এই খালের দু-তীরে তখন কয়েক হাজার নৌকো নোঙ্গর করতে পারবে। যাত্রীরা যেমন জল না পেরিয়ে মেলায় আসতে পারবেন, তেমনি মেলা দেখে নিজেদের নৌকোতেই রাত কাটাতে পারবেন।

যাক গে যে কথা বলছিলাম, এই খাঁড়ি পর্যন্তই মূল-মেলার সীমানা। মেলা বসেছে মুড়িগঙ্গা ও সাগরসঙ্গমে অর্থাৎ দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে। এখানটায় দ্বীপ প্রায় মাইল চারেক চওড়া। তার প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে মেলা বসেছে। বাকি অর্ধেকটায় রয়েছে গেঁয়ো কেওড়া বাইন ও বেতবন। তারপরে হুগলী নদী। ঐদিকেই কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের বাতিঘর, বেতার-যোগাযোগ ও জলপরিমাপ কেন্দ্র। কিন্তু সে-সব পরে ভাবা যাবে, এখন এক দিকটা দেখে নেওয়া যাক।

খাঁড়ির পাড় অনেকটা উঁচুতে। সাধুদের কলোনীর সামনে দিয়ে একটি মাটির পথ আস্তে আস্তে উঠে গিয়েছে পাড়ে। আর সেখানেই একটা কাঠের পুল—ফুট-ছয়েক চওড়া, দুদিকে রেলিং। আমরা রেলিং ধরে দাঁড়াই।

এখানে জল নেই। জল রয়েছে কেবল সাগরের মুখে খানিকটা জায়গায়। তাই সেখানে দু-তীরেই নৌকো বাঁধা। হয়তো ঐ জায়গাটুকু পাবার জন্য ওরা সবার আগে মেলায় এসেছেন। কলকাতার পথে গাড়ি 'পার্কিং'-য়ের মতো সাগরমেলায় নৌকো নোঙ্গর করাও একটি মস্ত সমস্যা।

খালপাড়ের নৌকোগুলি দেখে ভাল লাগে শ্যামার। সে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপরে বলে, "দেখছ, কেমন সুন্দর ঘর-কন্না পেতেছে! নৌকোতে বসেই রান্না করছে, স্নান করছে। খাচ্ছে আর ঘুমোচ্ছে।"

"হ্যাঁ, সুখেই আছে ওরা।" আমি বলি, "কিন্তু সবাই তো সুখের জন্য মেলায় আসে নি?"

শ্যামা নিরুত্তর। আমি অপ্রস্তুত। কি বলে ফেললাম! দুঃখীকে দুঃখের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া নির্দয়তা। অনুতপ্ত স্বরে বলি, "কিছু মনে করবেন না। আমি ঠিক ভেবে বলি নি কথাটা।"

শ্যামা একটু ম্লান হাসে। তারপরে বলে, "মনে করবার কি আছে? কথাটা যে মিথ্যে নয়। সুখ আর দুঃখকে নিয়েই তো জীবন। কেউ এসেছে সুখ আর হাসির জন্য, কেউ এসেছে কেবলই দুঃখ পেতে—কাঁদতে। যার যেমন ভাগ্য।" একটু থামে শ্যামা। তারপরে চোখ দুটি আঁচলে মুছে নিয়ে বলে, "থাক্ গে ও-কথা। চল এগিয়ে যাওয়া যাক্।"

আমি কোনমতে বলি, "চলুন।"

পুল পেরিয়ে আসি। পুলের পরেই পাকা রাস্তা। সাগরদ্বীপের বুক চিরে এই পথ চলে গেছে কচুবেড়িয়া পর্যন্ত।

মেলার সীমানা পুলের ওপার পর্যন্ত। কিন্তু তার ঢেউ লেগেছে এপারে। পথের দুপাশে দোকান বসেছে মাঝে মাঝে। যাঁরা মোটরে আসছেন, তাঁদের এই পথটুকু হেঁটে মেলায় পৌছতে হচ্ছে। অসংখ্য যাত্রী যাওয়া-আসা করছেন। কাজেই দোকানদাররা বসে নেই।

যাঁরা ওপার থেকে এপারে এসেছেন, তাঁরা সবাই আমাদের মতো। সময় হাতে পেয়ে একটু ঘুরে-ফিরে দেখে নিচ্ছেন। কেউ আজ চলে যাচ্ছেন না। যাবেন কেন, এখন তো শুধুই আসার পালা। যাবার সময় শুরু হবে আগামী-কাল দুপুর থেকে। এই উত্তেজনা আর উচ্ছ্বাসের, এই আকুলতার, এই ভাব ও ভক্তির জোয়ারে ভাঁটা পড়বে কাল স্নান ও দর্শনের পরে। আজ আসার জন্য যেমন আগ্রহ, কাল যাবার জন্যও তেমনি উৎকণ্ঠা দেবে দেখা।

কিন্তু কালকের কথা কাল হবে। এখন আজকের কথা ভাবা যাক। এই উত্তেজিত উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বসিত যাত্রীদলকে দেখা যাক্—প্রাণ ভরে দেখি।

আজ এই লক্ষ লক্ষ যাত্রীর মনে জেগে রয়েছে কেবল একটি কথা—স্নান, পুণ্যস্নান। ডুব...একটিমাত্র ডুব। পাপীর সব পাপ ধুয়ে যাবে, যোগীর যোগসাধনা সার্থক হবে, ভোগীর ভোগবাসনা পূর্ণ হবে। সন্তানহারা সন্তানকে খুঁজে পাবে, ব্যর্থপ্রেমিক তার প্রাণপ্রিয়াকে কাছে পাবে, চরিত্রহীন স্বামীর সুমতি হবে। কেউ মামলায় জিতবে, কেউ নির্বাচনে জিতবে, কেউ খেলায় জিতবে। সবার সব কামনা সফল হবে, সব বাসনার বিকাশ হবে, সকল প্রার্থনা পূর্ণ হবে সেই পুণ্যস্নানে।

দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি আমরা। কয়েক পা এগিয়েই পথের বাঁদিকে ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের মন্দির ও আশ্রম। ঠাকুরজীর পুরো নাম সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ঠাকুর—বাঙালী সাধু। স্থানীয় জনসাধারণ তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন। তাঁদের মতে তিনি অদ্বিতীয় মহাপুরুষ। অথচ তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী নন। ঠাকুরজী সংসারী ও বিবাহিত। সংসার থেকেই তিনি জগৎ-সংসারের স্রষ্টার সাধন-ভজন করছেন আর তাঁর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব মানবের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করে আমরা এগিয়ে চলি।

একটু এগিয়েই, পথের ডানদিকে সেচ বিভাগের ডাকবাংলো। পথের ধারে তারের বেড়া। পথ থেকে নিচুতে একটি পাকা বাড়ি ও দুটি কাঁচা ঘর। সারা বছর প্রায়ই খালি পড়ে থাকে। কদাচিৎ বিভাগীয় অফিসাররা পরিদর্শনে

আসেন। কিন্তু এখন লোকে-লোকারণ্য। কয়েকজন কর্মচারী সপরিবারে পুণ্য করতে এসেছেন। আশ্রয় না পেলেও পানীয় জল পাচ্ছেন সকলেই। এখানে একটি টিউবওয়েল আছে। যাত্রীরা অনেকে ভিড় জমিয়েছেন ওখানে।

সহসা শ্যামা বলে বসে, "বড্ড পিপাসা পেয়েছে।"

আমরা পথ থেকে নেমে আসি ডাকবাংলার উঠানে। এসে দাঁড়াই জল-প্রার্থীদের পেছনে। একজন ভদ্রলোক টিউবওয়েল পাম্প করছিলেন। তাঁর নজর পড়ে আমার দিকে। বলেন, "জল খাবেন ?"

বলি, "হ্যাঁ।"

"তাহলে এগিয়ে আসুন। এরা জল নেবে, দেরি হবে।" তারপরেই সমবেত জলপ্রার্থীদের বলেন, "ওঁদের একটু ছেড়ে দিন, ওঁরা জল খেয়ে চলে যান।"

এমন অযাচিত বদান্যতা প্রত্যাশা করি নি। কাজেই সকৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁর নির্দেশ পালন করি। আলাপও হয় ভদ্রলোকের সঙ্গে। নাম শ্রীনিখিলচন্দ্র মাইতি। বর্তমান নিবাস কাকদ্বীপ। স্ত্রী-পুত্র ও পরিবার-পরিজন সেখানেই আছেন। চাকরির জন্য তাঁকে পড়ে থাকতে হচ্ছে এখানে। এই পথের ধারেই নাকি সেচবিভাগ থেকে একটি গভীর নলকূপ বসানো হচ্ছে। তারই তদারকি করতে শ্রীমাইতি এখানে রয়েছেন। ডাকবাংলোর একটি ঘরে তিনি থাকেন। একজন পিওন আছে, সে তাঁকে রান্না করে দেয়।

বলি, "কেন, বাড়ির লোকেদের এখানে নিয়ে এলেই পারেন তো ?"

"পারি না তা নয়। তবে তার অসুবিধাও আছে। মেলার সময় গঙ্গা-সাগরকে দেখে, অন্য সময়ের গঙ্গাসাগরকে কল্পনাই করতে পারবেন না। কয়েকজন সাধু, এই কয়েক ঘর গৃহস্থ ছাড়া আর জনপ্রাণী থাকে না এখানে। বাজারহাটের বড়ই অসুবিধে। সপ্তাহে চার দিন হাট বসে তিন-চার মাইল দূরে। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায় না। সব কিছুই আনতে হয় সেই কাকদ্বীপ থেকে। বর্ষাকালের কথা বাদই দিলাম। অন্য সময়েও কাকদ্বীপ যেতে-আসতে সারাদিন কেটে যায়। তার ওপর বাস খারাপ হয়ে গেলে তো কথাই নেই। আর সব চেয়ে বড় কথা কি জানেন ?"

"কি ?" প্রশ্ন করি।

"এখানে এসোসিয়েশানের বড়ই অভাব।"

শ্রীমাইতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ডাকবাংলোর বাইরে বেরিয়ে আসি।

রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলি।

কয়েক পা এগিয়েই পথের দুদিকে দুটি পুকুর। বাঁদিকেরটি বেশ বড় আর ডানদিকেরটি খুব ছোট। দুটিই তার-কাঁটা দিয়ে ঘেরা। তাতেও কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হন নি। দুজন করে বন্দুকধারী পুলিস দাঁড়িয়ে রয়েছে পুকুরপাড়ে। বহু পুণ্যার্থীর তৃষ্ণাবারি এই জল। আর তাই এই পুলিসী ব্যবস্থা।

তারপরেই পথের ডানদিকে অর্থাৎ ছোট পুকুরটির পূব পাড়ে পাশাপাশি দুখানি ঘর—খড় ও মাটির ঘর। প্রথমটিতে থাকেন মাসী, গঙ্গাসাগরের বারোয়ারী মাসী। বছর বিশেক আগে এসেছেন। সেই থেকে এখানেই আছেন। শুনেছি এখানকার অনেক গল্প তাঁর কণ্ঠস্থ। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, অনেক ডাকাডাকি করেও সাড়া পেলাম না।

শ্যামা হেসে বলে, "তোমার মাসী এখন মেলায় গিয়ে গল্পের আসর বসিয়েছেন। মেলা না ভাঙলে আর তাঁর দেখা পাচ্ছ না।"

কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়। তাই আর সময় নষ্ট না করে এগিয়ে চলি।

একটু এগিয়েই কালীর দোকান—খাবারের দোকান। শ্রীধাম গঙ্গা-সাগরের একমাত্র স্থায়ী হোটেল। অগ্রিম অর্ডার দিলে ভাত ডাল ও মাছের ঝোল পাওয়া যায়। বাড়ি ছিল মনসা দ্বীপে—রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের কাছে।

কালীর বাবা নৌকো চালাতো। তার সঙ্গে একবার মেলার সময় সে গঙ্গাসাগরে এলো, দোকান দিল। তখন তার বয়স তেরো-চোদ্দ বছর। বেশ লাভ হল। তারপর থেকে প্রতিবারই সে মেলার সময় দোকান দিত এখানে। বাস চলাচল শুরু হবার পরে স্থায়ী দোকান দিয়েছে। মোটামুটি চলে যায়। বাসের ড্রাইভার-কণ্ডাকটার আর সরকারী বাবুরা সবাই তার খদ্দের।

অন্য সময় এই পর্যন্ত বাস আসে। এখন মেলার জন্য পথ জনবহুল। তাই বাস থামছে প্রায় মাইল আধেক আগে গঙ্গাসাগর গ্রামে। গঙ্গাসাগর বলতে সেখানকেই বোঝায়। এখানকার নাম শ্রীধাম গঙ্গাসাগর।

কালীর হোটেল কিন্তু কেবল হোটেল নয়, এটি হোটেল-কাম-রেস্তোঁরা। চা, বিস্কুট, মুড়ি এবং দুধও পাওয়া যায়। আর তাই আমাদের এখানে বসা। আমি নিয়েছি চা আর শ্যামা এক গ্লাস দুধ। সে খুবই আপত্তি করছিল, কিন্তু আমি শুনি নি। চায়ে চুমুক দিতে দিতে দোকানীর গল্প শুনছি।

কালী বলে চলেছে মেলার কথা। বলছে—ইতিমধ্যেই পুলিস নাকি

শতাধিক পকেটমার পাকড়াও করেছে, তাদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও আছে। আর ধরেছে একজন ডাকাতকে।

"ডাকাত!" শ্যামা বিস্মিত।

কালী উত্তর দেয়, "ডাকাত ছাড়া কি বলব দিদি? সে ১২৫ টাকায় আসা-যাওয়া ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে বলে ১৬০০ যাত্রী নিয়ে এসেছিল। যাত্রীদের কাকদ্বীপে নামিয়ে দিয়ে বাস নিয়ে উধাও। পুলিস তাকে ধরে ফেলেছে।"

কালী অনেক খবর দেয়। বলে, "এখন পর্যন্ত ১৬ জন হাসপাতালে এসেছে, তার মধ্যে ৮ জনের কলেরা... ..." হঠাৎ থেমে যায় সে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে আপন মনে বলে ওঠে, "হাজরা মশাই এবারেও এসেছেন।"

"হাজরামশাই কে?"

"আজ্ঞে শ্রীশশধর হাজরা। ঐ তো একটু আগে মেলার দিকে গেলেন। বয়স প্রায় সত্তর। জেলা বোর্ডের ট্যাক্স কালেক্টর ছিলেন। যখন তীর্থকর দু-আনা ছিল তখন কাজ নিয়েছিলেন আর জনপ্রতি এক টাকা কর তোলার পরে অবসর নিয়েছেন। হাজরামশাই বলেছেন, তিনি প্রথম যখন মেলায় আসেন, তখন বিজলিবাতি আসত না, দেড়শ ডে-লাইট জ্বলত মেলায়। ঘাটে একখানি মাচায় বসে তার একটি ডে-লাইটের আলোয় তিনি থালায় করে তীর্থকর আদায় করতেন। এই নিয়ে পর পর চুয়াল্লিশ বছর ধরে তিনি সাগরমেলায় আসছেন।"

"চুয়াল্লিশ বছর!" শ্যামা আবার বিস্মিত।

কালী মাথা নাড়ে।

আমি বলি, "আচ্ছা, আমরা যে ঘরগুলোয় রয়েছি, মেলার পরে ওগুলোর কি হবে।"

"আজ্ঞে নীলামে বেচে দেওয়া হবে।" আবার থেমে যায় কালী। রাস্তার দিকে ইসারা করে জনৈক প্রৌঢ় সন্ন্যাসীকে দেখিয়ে বলে, "ঐ দেখুন, ভারত সেবাশ্রমের কানাইয়া মহারাজ। ব্যস্ত রয়েছেন বলে আমার খোঁজ নিলেন না। গত বিশ বছর ধরে তিনি প্রতিবার শ'পাঁচেক স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে মেলায় আসেন যাত্রীদের সেবা করতে। মহারাজ বলেছেন, কয়েক বছরের মধ্যে এখানে একটি স্থায়ী সেবাকেন্দ্র করবেন।"

আরও খবর দেয় কালী। বলে, "আমার দোকানের উল্টোদিকেই

নির্বাণ কাপালিক বাবার আশ্রম। সেখানে মা থাকেন। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে তাঁর স্বামীর সঙ্গে সাগরমেলায় এসেছিলেন। তাঁরা খড়দহের লোক। রেলে ডায়মণ্ডহারবার এসে, সেখান থেকে চার দিন হেঁটে কাকদ্বীপ। তখন তো রাস্তা বলতে কিছু ছিল না। নৌকোয় নদী পেরিয়ে আরও তিন দিন হেঁটে তাঁরা এখানে এসেছেন। তখন চারদিকে শুধুই জঙ্গল। তবে কচুবেড়িয়া থেকে একটা কাঁচা রাস্তা ছিল। এখন সেটাই এই পাকা রাস্তা হয়েছে। মা কিন্তু আর ফিরে যান নি দেশে।"

"কেন?" শ্যামা প্রশ্ন করে।

"যাবেন কেমন করে? নির্বাণবাবা যে মা ডাকলেন তাঁকে। আর তিনি এখন আমাদের সকলের মা।"

"ঐ যে পথের বাঁদিকে যে বড় আশ্রমটা দেখা যাচ্ছে, তার কি নাম?"

"নাগাবাবার আশ্রম। বাবা দেহত্যাগ করেছেন অনেক কাল। এখন তাঁর শিষ্য পঞ্চমগিরিজী আশ্রমের মালিক। তিনি সংসারী, বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ। খুবই পরোপকারী এবং ভালোমানুষ।"

চায়ের দাম মিটিয়ে উঠে দাঁড়াই। এগিয়ে চলি উত্তরে। একটু এগিয়েই পথের বাঁদিকে পঞ্চমগিরিজীর আশ্রম। বেশ বড় আশ্রম ও মন্দির। সামনে সাইনবোর্ড—'নাগাবাবা প্রতিষ্ঠিত শঙ্করাচার্য আশ্রম'। ভেতরে খুব ভিড়।

রাস্তা থেকেই প্রণাম করে আমরা এগিয়ে চলি। একটু বাদেই পথের ডানদিকে—সাংখ্য যোগাশ্রম। একে লালবাবা অথবা কপিলানন্দ আশ্রমও বলা হয়। কপিলবাবা দেহরক্ষা করেছেন।

এটি শাখা-আশ্রম। মূল-আশ্রম হল নবদ্বীপের কাছে ভাণ্ডারটিকুরিতে। মধ্য-চব্বিশ পরগণার ওপরে গবেষণারত দক্ষিণ রামনগর নিবাসী শ্রীঅমরকৃষ্ণ চক্রবর্তীর কাছে শুনেছি, কপিলবাবার মহীয়সী শিষ্যা মুনিমাতা প্রতি বছর মেলার সময় এখানে আসতেন। তিনি ছিলেন উচ্চকোটি সাধিকা। তাঁর চুল এবং গায়ের রঙ ছিল কাঁচা সোনার মত। যোগশাস্ত্রমতে এটি সিদ্ধ-সাধিকার লক্ষণ। তাঁর আপাদলম্বিত হিরণ্যবর্ণ জটার কিছু অংশ ভাণ্ডারটিকুরি আশ্রমে রক্ষিত আছে। দুর্ভাগ্যের কথা তিনিও দেহত্যাগ করেছেন।

বাবার সুযোগ্য শিষ্য পূর্ণানন্দ এখন গঙ্গাসাগর আশ্রমের অধ্যক্ষ। এটি গঙ্গাসাগরের বৃহত্তম আশ্রম। ধর্মশালা মন্দির ও নাটমন্দির নিয়ে অনেকখানি এলাকা জুড়ে আশ্রম। তারপর রয়েছে পুকুর বাগান ক্ষেত ও গোয়ালঘর।

বাংলায় কয়েকখানি ধর্মগ্রন্থ এঁরা প্রকাশ করেছেন। জনৈক ব্রহ্মচারী গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সেগুলি বিক্রি করছেন।

লোহার গেট পেরিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকি। নাটমন্দিরের সামনে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। ভক্তবৃন্দ বিশ্রাম করছেন। মন্দিরের পাশে ত্রিপলের নিচে বড় বড় উনুনে রান্না চড়েছে। আজ এখানকার সব আশ্রমেই মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা হয়েছে। কেবল দর্শন ও পূজা নয়, সেই সঙ্গে প্রসাদ। প্রসাদ ছাড়া পূজা হয় না, মহোৎসব ছাড়া মেলা হয় না। তবে যুগের জন্য এখন সে উৎসবকে আপনজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়।

আগে কিন্তু এমনটি হত না। সেকালের মেলাতে রান্নার বড় একটা প্রয়োজন হত না। অপরিচিত হলেও অভুক্ত থাকত না কেউ। মহোৎসবের মাঝে বসে পড়লেই মহাপ্রসাদ পাওয়া যেত—অন্ন ডাল রসা, পেটভরা ভাত ডাল ও তরকারি। এখন অপরিচিতকে পঙক্তি-ভোজনে পাতা দেওয়া হয় না। দেওয়া সম্ভবও নয়। তাই সাগরমেলায় এসে দি'মাকে রান্না করতে হচ্ছে।

দি'মার কথা মনে পড়তেই চমকে উঠি। বুড়ো মানুষ, একা সব করতে হচ্ছে। শ্যামাকে বলি কথাটা। শ্যামা বলে, "এখান থেকে চল, কিন্তু লাইট-হাউস না দেখে ঘরে ফিরছি না, সেকথা আগেই বলে দিলাম।"

"লাইটহাউস! সে তো বহুদূর! অনেক দেরি হয়ে যাবে যে?"

"হোক না। দিদিমার একা থাকার অভ্যেস আছে। তিনি তো একাই এসেছেন।"

কথাটা ভাল লাগে না আমার। তাই চুপ করে থাকি। শ্যামা আবার বলে, "দিদিমাকে ছাড়া যদি দুদণ্ড থাকতে না পারবে, তাহলে আমাকে নিয়ে বেরিয়েছিলে কেন···," আরও কিছু যেন বলার ছিল, কিন্তু সহসা থেমে যায় সে।

সর্বনাশ, আবার কেঁদে-টেদে ফেলবে নাকি! কাঁদার ব্যাপারে মেয়েদের বিশ্বাস নেই। তাই ভয়ে-ভয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠি, "ঠিকই বলেছেন, দি'মার একা থাকতে কোন কষ্টই হবে না। তাছাড়া আমরা তো লাইটহাউস দেখেই ফিরে আসব। কতক্ষণ আর লাগবে? চলুন তাড়াতাড়ি পা চালানো যাক।"

শ্যামা নীরব। আমিও আর কথা বাড়াতে সাহস পাই না। আমরা যোগাশ্রমের লোহার ফটক পেরিয়ে রাস্তায় আসি।

শ্যামা তবু নীরব। বাধ্য হয়ে কথা বলতে হয় আমাকে। বলি, "লাইট-হাউস-য়ে তো যাব বলছি, কিন্তু যাবার রাস্তা যে জানি নে!"

"রাস্তা জানার কি আছে? ঐ তো দেখা যাচ্ছে।" শ্যামা হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

দেখেছি আমিও। যোগাশ্রমের সোজা পশ্চিমে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে লাল ও সাদা লাইটহাউস-এর চূড়া। কিন্তু অনেকটা দূরে। সামনে মাঠ। মাঠের ওপর দিয়ে সোজাসুজি যাওয়া সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। নিশ্চয়ই অন্য কোন পথ আছে। কিন্তু কোথায় পথ? কে বলে দেবে? পথচারীরা তো সবাই যাত্রী!

শ্যামা তাগিদ দেয়, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন, চল?"

"হ্যাঁ, চলুন।"

কি আর করব? মাঠ দিয়েই চেষ্টা করা যাক্। আমি পথ থেকে মাঠে নেমে আসি। শ্যামাও সঙ্গী হয় আমার।

"বাবু কোথায় যাচ্ছেন?"

কে যেন কাকে জিজ্ঞেস করছে! আমাদের কি? পেছন ফিরি। হ্যাঁ, আমাদেরই জিজ্ঞেস করছে একজন লোক। খালি পা, পরনে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি। গায়ে একখানি তুলোর কম্বল। মনে হচ্ছে স্থানীয় লোক। উত্তর দিই, "লাইটহাউস-এ যাব।"

"এদিক দিয়ে যেতে পারবেন না বাবু। সামনে খাঁড়ি। এখন জোয়ার, জলে ভরে গেছে। যেতে হবে সেই গঙ্গাসাগর হয়ে, বাঁধের ওপর দিয়ে।"

শ্যামাকে বলি, "শুনেছেন কি বলল?"

সে মাথা নাড়ে।

আমি বলি, "অনেকটা ঘুরে পথ!"

"চল, সেই পথেই যাওয়া যাক্।"

হায় মা-গঙ্গা! কাকে কি বলা? হঠাৎ আজই লাইটহাউস দেখার নেশা ওকে এমন করে পেয়ে বসল কেন, বুঝতে পারছি না।

অগত্যা আবার রাস্তায় উঠে আসতে হয়। লোকটি এগিয়ে আসে কাছে। বলে, "আমি সঙ্গে আসব বাবু, আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব?"

না, মা-গঙ্গা করুণাময়ী। সানন্দে বলি, "বেশ তো, চল।"

"অমনি তো এক কথায় রাজী হয়ে গেল! কত দিতে হবে ঠিক করে নিয়েছ? নইলে পরে ঝগড়া বাধবে, তা আগেই বলে রাখছি।"

আমি কিছু বলতে পারার আগেই লোকটি জিভে কামড় দিয়ে প্রতিবাদ করে ওঠে, "না মা-ঠান, ঝগড়া করব কেন? আমরা শ্রীধাম গঙ্গাসাগরের গরীব মানুষ। বাবার দয়ায় আপনারা এখানে আসেন। আপনারা যাত্রী, আমাদের লক্ষ্মী। আপনারা খুশি হয়ে যা দেবেন, তাই নেব।"

"না বাপু, ওসব খুশি-টুশির মধ্যে আমরা নেই। আমাদের সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে, কত নেবে বল?" শ্যামা সোজাসুজি দর জিজ্ঞেস করে।

লোকটি একটুকাল কি যেন ভাবে, তারপরে বলে, "দুটো টাকা দেবেন মা।"

"শুনলে?" শ্যামা চেঁচিয়ে ওঠে। আমাকে বলে, "এই জন্যই বলছিলাম আগে ঠিক করে নাও!" তারপরে লোকটিকে বলে, "শোন বাপু, একটা টাকা পাবে, রাজী থাক তো চল।"

"চলুন।" লোকটি রাজী হয়।

শ্যামা একটু হেসে চলতে শুরু করে। আমি তার সঙ্গে হাঁটতে থাকি।

যোগাশ্রমের পরে পথের দুদিকেই ক্ষেত আর গাছপালা। বাড়ি-ঘর নেই বললেই চলে। এদিকটায় মাটিতে বালির ভাগ কম।

লোকটি চলেছে আগে, আমরা তার পেছনে পাশাপাশি পথ চলেছি। একটু বাদে শ্যামাকে জিজ্ঞেস করি, "যোগাশ্রমে আসবেন বলে এত আগ্রহ দেখালেন, কিন্তু কোথাও কারও সঙ্গে তো দেখা করলেন না?"

সহসা শ্যামার মুখখানি যেন কালো হয়ে যায়। বলে, "দেখা করলেই তো পরিচয় দিতে হত।"

"আপনি কি এদের কাউকে চেনেন?"

"হ্যাঁ।"

"কাকে?"

"পূর্ণানন্দ মহারাজকে। তিনি একবার গিয়ে আমাদের আশ্রমে ছিলেন কয়েক দিন। বলে এসেছিলেন, সাগরমেলায় এলে আমরা যেন এখানে উঠি।"

"আর আজ তাঁর সঙ্গে একবার দেখাও করলেন না?"

"তাতে তো কেবল ঝামেলা বাড়ত গোসাঁই!"

"কেন ?"

"যাঁর পরিচয়ে আমার পরিচয়, তিনি যে আর ইহজগতে নেই। ওঁরা নানা প্রশ্নে জর্জরিত করে তুলতেন আমাকে।"

আমি নিঃশব্দে পথ চলি। একটু বাদে শ্যামাই আবার বলে, "তাঁর বড্ড ইচ্ছে ছিল, আমরা এই আশ্রমে আসব। তিনি তো আর আসতে পারলেন না, তাই আমি এসে ঘুরে গেলাম একবার। জানি না এতে তাঁর ইচ্ছে পূর্ণ হল কিনা।" শ্যামা থামে। সে নীরবে পথ চলতে থাকে।

এ নীরবতাকে স্থায়ী হতে দেওয়া উচিত নয়। তাছাড়া প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা দরকার। তাই তাড়াতাড়ি বলি, "আচ্ছা, এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা কপিলানন্দ স্বামীজী কে ছিলেন ?"

"তিনি ছিলেন ভগবান কপিলমুনি রচিত দ্বাবিংশতি সূত্র সম্বলিত তত্ত্বসমাস তথা আদি সাংখ্যদর্শন বিশারদ সাংখ্যযোগাচার্য।"

"এঁদের এই কপিলানন্দ মহামিলন সমিতির কাজ কি ?"

"এঁরা শ্রীধাম গঙ্গাসাগর ও ভগবান কপিলমুনির মাহাত্ম্য প্রচার করেন। কাল বিকেলে মেলায় যে ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছে, এই সমিতি তার প্রধান উদ্যোক্তা।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তখন মেলার মাইকে বলতে শুনেছি।" মনে পড়ে আমার, "কি হবে সে সভায় ?"

"সাংখ্যদর্শনের সম্যক আলোচনা। তারকেশ্বর পীঠাধীশ, জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য এবং শ্রীমৎ হৃষীকেশাশ্রম মহাশ্রম মহারাজ সভায় সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন। তারকেশ্বর মঠের অধ্যাপক শ্রীউমাপদ কাব্যব্যাকরণবেদতীর্থ সভায় বৈদিকমন্ত্রে শান্তিবাণী পাঠ করবেন।" একবার থামে শ্যামা। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে করুণকণ্ঠে বলে, "তোমার বাবাজীর বড় ইচ্ছে ছিল, সেই সভায় উপস্থিত থাকবেন।"

শ্যামা আবার সেই একই প্রসঙ্গে ফিরে এল। তাড়াতাড়ি আমাদের পথ-প্রদর্শকের উদ্দেশে বলি, "ওহে শুনছ ?"

"আমাকে বলছেন বাবু ?" সে পেছন ফেরে।

"হ্যাঁ, তুমি এত আগে আগে হাঁটছ কেন ?"

লোকটি লজ্জা পায় বোধ করি। সে চলা বন্ধ করে। আমরা তার কাছে আসি। সে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি,

"তোমার নাম কি ?"

উত্তর দেয় না সে। বিস্মিত হই। আবার বলি, "নাম বলছ না কেন ?"

তবু সে কথা বলে না, কেবল একবার করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে তেমনি নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে।

"ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না।" শ্যামা আমার কানে কানে বলে।

আমারও তাই মনে হচ্ছে। সত্যই তো, লোকটা নাম বলছে না কেন ?

এগিয়ে গিয়ে লোকটার একখানি হাত ধরি। কর্কশ স্বরে বলি, "তুমি কে ?"

"বাবু!" লোকটি কেঁপে ওঠে। কম্পিত কণ্ঠে বলে, "বাবু, আমি মুসলমান। আমার নাম আলতাব, আলতাব হোসেন।"

আমি ওঁর হাত ছেড়ে দিই। মুসলমান বলে সে এতক্ষণ পরিচয় দিতে শঙ্কা বোধ করছিল। হয়তো ভেবেছে আমরা হিন্দু তীর্থযাত্রী, কাজেই সে মুসলমান শুনলে আমরা তাকে সঙ্গে নেব না। হেসে বলি, "তাতে কি হয়েছে ?"

লোকটি আশ্বস্ত হয়। একটু ম্লান হেসে বলে, "অনেকে ভিন্ন জাত শুনলে কোন কাজ দেয় না।"

অথচ এই অঞ্চল থেকেই অবিভক্ত বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির বহু নৈতিক কাহিনী গড়ে উঠেছে। সে-সব কাহিনী আজও মুছে যায় নি মানুষের মন থেকে। আজও দক্ষিণরায়, গাজী, পীরগাজী, বনবিবি এবং ওলাবিবি প্রভৃতি লৌকিক দেব-দেবীর পূজা-পার্বণ সেই হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির সাক্ষী দিচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বন্ধুবর ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়ের একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধের কথা মনে পড়ছে। তিনি লিখেছেন, 'যুগসন্ধির কালে বিভিন্ন ধর্ম-সংস্কৃতি যখন ঘটনাচক্রে পরস্পরের সম্মুখীন হয়, তখন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমে চলে সমন্বয়ের চেষ্টা এবং এইভাবেই আদিম আচার বিশ্বাস ও লৌকিক দেবদেবী শাস্ত্রীয় স্তরে উন্নীত হন।

ভাবতে লজ্জা পাই, পঁচিশ বছর হল আমরা স্বাধীন হয়েছি, অথচ আজও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মান্ধতা দূর হল না। আলতাব কপিলমুনিকে 'বাবা' ও গঙ্গাকে 'মা' বলে ডাকে, তবু সে মুসলমান। তার সঙ্গে পদচারণা করা নিষেধ—আমরা যে হিন্দু! জানি না, এই ক্ষুদ্রতামুক্ত হতে আর কতকাল লাগবে ?

আমরা ছোট একটি গ্রামে উপস্থিত হয়েছি—গঙ্গাসাগর গ্রাম। পথের দুদিকে দোকান। ডানদিকে দোকানগুলির পেছনে একটা টিউবওয়েল। সেখানে বেশ ভিড়। দুখানা বাস দাঁড়িয়ে আছে। একখানা ছাড়ছে। যাচ্ছে কচুবেড়িয়া। জায়গাটা বেশ জমজমাট। টিউবওয়েলের পাশ দিয়ে একটি মাটির পথ চলে গেছে গ্রামের ভেতরে। ছোট্ট গ্রাম। কয়েকটি বাড়ি। প্রকৃতপক্ষে সাগরদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের শেষ গ্রাম। মেলাক্ষেত্র বা শ্রীধাম গঙ্গাসাগরে ঐ কয়েকজন সাধু, সেই মাসী, কালী, শ্রীমাইতি ও কপিলমুনির আশ্রম।

আমাদের পথ গ্রামের উল্টোদিকে অর্থাৎ উত্তর-পূবে। পথ মানে মাটির বাঁধ। সুন্দরবনে প্রায় বাইশ হাজার মাইল দীর্ঘ এমনি মাটির বাঁধ রয়েছে। কোনটি সরকার, কোনটি বা গ্রামবাসীরা নিজেরা নির্মাণ করেছেন।

এই বাঁধগুলোর দুটি উপকারিতা। একটি নোনাজলের কবল থেকে চাষের জমিকে রক্ষা করা। আর একটি, পথহীন প্রান্তরে এই সব বাঁধের ওপর দিয়েই গ্রামবাসীরা যাতায়াত করে থাকেন।

আমাদেরও বাঁধের ওপর দিয়েই যেতে হবে বাতিঘরে অর্থাৎ বেগুয়াখালি গ্রামে। হুগলী নদী যেখানে সাগরে মিশেছে, সেখানেই 'লাইট-হাউস', 'হাই-ফিক্স স্টেশন' এবং 'সাগর-সীমাফোর'।

সামান্য উঁচু বাঁধ। জমির আলের চেয়ে দু-তিন হাত উঁচু। এতে বর্ষাকালে বাঁধের কাজ কতটা হয় জানি না, তবে পথের কাজটা ভালই চলে। আমরা বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতেই এগিয়ে চলেছি।

আলতাব চলেছে আগে আগে। আমরা তার পেছনে পাশাপাশি চলেছি। কিন্তু কেন, কেন সে আমাদের পাশে পথ চলছে না! আমরা তো তাকে ঘৃণা করি নি? তবু কেন তার এই শঙ্কা? কে তাকে শিখিয়েছে, হিন্দুরা ঘৃণা করে মুসলমানকে? সে কি জানে না যে ভারতের হিন্দুরা সানন্দে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চপদে মুসলমানকে নির্বাচিত করেছিল? হয়ত কোনদিন কোন ধর্মান্ধ হিন্দু আলতাবকে ঘৃণা করে থাকবে। কিন্তু সে কি সেই সঙ্গে দেখে নি যে অধিকাংশ হিন্দু তাকে ভালবাসে? সে কি জানে না, এ দেশ হিন্দু-মুসলমানের মিলিত দেশ?

জানে না। কারণ তার নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থপর মানুষগুলি তাকে কোনদিন বলে নি সেকথা। বরং উল্টোটাই বলেছে। আর অপর সম্প্রদায়ের

মানুষরা কোনদিন তার সেই ভুল ভেঙে দেবার চেষ্টা করে নি। তারই ফলে গড়ে উঠেছে এই কৃত্রিম বিভেদ আর অহেতুক আশঙ্কা।

ভাবনা থেমে যায়, বাস্তবে ফিরে আসি। চলা বন্ধ করে আলতাব দাঁড়িয়ে রয়েছে পথের ওপরে। তাকিয়ে দেখি সামনে একটা জলভরা খাঁড়ি।

"পার হব কেমন করে ?" শ্যামা জিজ্ঞেস করে।

উত্তর জানা নেই আমার। আমি চুপ করে থাকি।

উত্তর দেয় আলতাব। বলে, "জল বেশি নেই, কোমর-সমান। কিন্তু আপনাদের জামাকাপড় ভিজে যাবে। আমি কাঁধে করে আপনাদের পার করে দিচ্ছি।"

"না না, তার কি দরকার ! আমরা বেশ পার হতে পারব।"

"আমি পারব না।" আমার কথা শেষ হওয়া মাত্র শ্যামা বলে ওঠে।

হেসে বলি, "তাহলে আপনি আলতাবের কাঁধে চাপুন।"

শেষ পর্যন্ত তাই করে শ্যামা। আলতাব তাকে কাঁধে করে এপারে নিয়ে আসে। আর আমি জামাকাপড় ভিজিয়ে খাঁড়ি পার হয়ে আসি। এপারে এসে আবার সেই বাঁধ। আমরা বাঁধের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলি।

চলতে শুরু করে আস্তে আস্তে শ্যামাকে বলি, "আলতাব মুসলমান শুনে আঁতকে উঠেছিলেন। ভেবেছিলেন তার সঙ্গে পথ চললে জাত যাবে। কিন্তু কোথায়, ওর কাঁধে চড়ে খাল পার হয়েও তো জাত রয়ে গেল দেখছি !"

শ্যামার কিন্তু মোটেই রাগ হয় না আমার কথায়। বরং হেসে বলে, "তুমি বুঝি ঝগড়া বাধাতে চাইছ ?"

"না, না। তা চাইব কেন ?"

"তাহলে ওকথা বলছ কেন ? আমি তখন মোটেই আঁতকে উঠি নি। আর কেনই বা উঠব ? আমি যে বৈষ্ণব।"

আমরা গঙ্গার পাড়ে আসি। অনেক নিচে নদীর বালুকা-বেলা। বহু দূরে জল—কম করেও আধ মাইল হবে। ওপারে শুনেছি বেলাভূমি আরও বেশি প্রশস্ত—প্রায় চার মাইল চর পেরিয়ে স্থায়ী পাড়। এপার থেকে ওপারের দূরত্ব ষোল মাইল কিন্তু জল রয়েছে মাত্র এগারো-বারো মাইল জুড়ে।

আমরা সাগরদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে এসেছি। সামনেই সঙ্গম—গঙ্গার সঙ্গম। গোমুখী থেকে যে ধারা শুরু হয়েছিল, তা শেষ হল এখানে এসে।

একই বছরে গঙ্গার উৎস আর সঙ্গম দর্শনের সৌভাগ্য হল আমার। আমি ধন্য হলাম।

"দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চল বাঁদিকের রাস্তা দিয়ে নেমে যাই? ঐ তো বাতিঘর দেখা যাচ্ছে।"

"বাইরে থেকে দেখতে চাইলে, এগিয়ে যেতে পারেন। আর যদি ভেতরে গিয়ে দেখতে চান, তাহলে এখানে একটু দাঁড়াতে হবে।"

"মানে?" শ্যামা আমার কথা বুঝতে পারে না। পারা সম্ভবও নয়। আমি তাকে এ সম্পর্কে কিছুই বলি নি।

এবারে বলি, "বাতিঘরে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। কাজেই পরিচিত কাউকে সঙ্গে না নিয়ে গেলে ভেতরে যেতে পারবেন না।"

"পরিচিত কেউ আছেন নাকি এখানে?"

"হ্যাঁ, ঐ হাই-ফিক্স্ স্টেশনে। পকেট থেকে দীপকবাবুর চিঠিটা বের করে আলতাবের হাতে দিয়ে বলি, এটা নিয়ে ঐ হাই-ফিক্স স্টেশনে চলে যাও, বাবুদের বলো আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি।"

আলতাব চলে যায়। হাই-ফিক্স্ স্টেশনও দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। ছোট একটি দোতলা বাড়ি আর একটি শেড। ওরা সমুদ্র ও বন্দরের সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ রক্ষা করেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আলতাবের সঙ্গে দুজন ভদ্রলোক ছুটে আসেন। পরিচয় দেন, "আমার নাম সুশীলবরণ দাস আর এর নাম অসীমকুমার দত্ত। আমরা দুজনেই দীপকের বন্ধু। ভারী খুশি হলাম আপনাকে পেয়ে। খুবই আনন্দের কথা যে এতদিন বাদে আধুনিক যুগের লেখকদের দৃষ্টি পড়ল অবহেলিত গঙ্গাসাগরের দিকে। চলুন, লাইটহাউস দেখিয়ে দিচ্ছি।"

পায়ে-চলা-পথ দিয়ে আমরা নিচে নেমে এলাম। আর নেমে আসতেই সম্পূর্ণ বাতিঘরটি দৃশ্যমান হল—সামনে, সামান্য দূরে। গাছপালার জন্য এতক্ষণ দেখতে পাই নি।

বাতিঘরটি কিন্তু ভারী সুন্দর—লাল ও সাদা রঙের। অনেকটা শহীদ মিনারের মতো। প্রকাণ্ড জায়গা জুড়ে তার এলাকা। চারিদিক দেয়াল-ঘেরা। লোহার গেট পেরিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকলাম। পথের দুদিকে সবুজ তৃণভূমি। সামনে একটি দু'তলা বাড়ি। এখানকার কর্মচারীদের কোয়ার্টার্স। বাড়িটির পুবে বাঁধানো বেদির ওপরে বাতিঘর। এ জায়গাটির সরকারী নাম

মিড্‌লটন পয়েন্ট। এখান থেকে নদীর দূরত্ব প্রায় এক মাইল।

সুশীলবাবু অনুমতি নিয়ে এলেন। আমরা সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম বেদির ওপরে। লোহার দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। তেরখানি ঢালাই লোহার পাত দিয়ে এই সাড়ে চুরাশি ফুট উঁচু গোল টাওয়ারটি তৈরি হয়েছে। ঠিক কেন্দ্রস্থলে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি—ওপরে উঠে গেছে। আটাত্তর ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম ওপরে।

এলাম একটা লোহার পাটাতনের ওপরে। মাথার ওপরে আচ্ছাদন—টাওয়ার শেষ। তিন দিক কাচ দিয়ে ঘেরা। সমুদ্র, গঙ্গা ও সাগরদ্বীপকে চমৎকার দেখাচ্ছে।

আমরা যে পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে, তারই ঠিক কেন্দ্রস্থলে রয়েছে বাতিটি—বাতিঘরের বাতি। ইলেকট্রিক নয়, কেরোসিনের বাতি। যে নিয়মে পেট্রোম্যাক্স জ্বলে, মোটামুটি সেই নিয়মেরই একটি বাতি। তবে অনেক বড় এবং শক্তিশালী। এগারো হাজার মোমবাতির আলো দান করে এই বাতি। এর জন্য প্রতি রাত্রে মাত্র কয়েক গ্যালন কেরোসিন তেল খরচ হয়।

কেবল বাতির চিমনিটা একটু অসাধারণ। অনেকগুলি অবতল (Concave) ও উত্তল (Convex) দর্পণ দিয়ে তৈরি বেশ বড় একটি ঘূর্ণায়মান চিমনি। পৃথক পৃথক দর্পণের প্রতিফলন ও প্রতিসরণের ফলেই ঐ চমক-লাগানো সাদা আলোকরশ্মির সৃষ্টি হয়।

জনৈক অবাঙালী যন্ত্রবিদ্ বাতিটিকে আবিষ্কার করেছিলেন। অসীমবাবুর অনুরোধে তিনি আমাকে বলেন, "It is a flashing white light illuminating an arc of 25° N. W. through north and east to south and displays a single quick light in a period of 3 seconds. The duration of the flash is about 3/10 of a second visible in clear weather at a distance of 15 miles."

থামলেন ভদ্রলোক। সুশীলবাবু যোগ করেন, "গঙ্গাসাগর সঙ্গম থেকে দূরাগত জাহাজকে প্রথম আলো দেখানো হয় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু এই আলোটি বিলেত থেকে আসে ১৯০৯ সালে। বর্তমান বাতিঘরটি নির্মিত হয়েছে দু'বছর বাদে ১৯১১ সালে। ২১°৩৯'২৭" উত্তর অক্ষরেখা, ও ৮৮°২'৫৬" পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই বাতিঘর। অদ্ভুত অবস্থান। মাত্র কয়েক বছর আগে বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে হাই-ফিক্স স্টেশন প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে। কিন্তু বছর পাঁচেকের মধ্যে জায়গাটি সমুদ্রগর্ভে চলে যাবে। অথচ এখানে জল আসতে এখনও বছর বিশেক সময় লাগবে। কি আশ্চর্য নির্বাচন-ক্ষমতা ছিল নির্মাতাদের!

কেবল সেজন্য নয়, আশ্চর্য এই বাতিঘরের নির্মাণকৌশল, আশ্চর্য এই বাতিটি। এত কম খরচে এত বড় একটা প্রয়োজনীয় কাজ হতে পারে, তা আজকের ইঞ্জিনীয়ারদের কাছেও একটি পরম বিস্ময়। তাছাড়া এর পরিচালন ব্যবস্থা এত সহজ এবং সরল যে একটি শিশুও অনায়াসে শিখে নিতে পারে।

বাতিঘর থেকে নেমে এলাম। চললাম হাই-ফিক্‌স্ স্টেশনের দিকে। অল্প একটু পথ পেরিয়েই স্টেশন। অসীমবাবু ও সুশীলবাবু ভেতরে গিয়ে চা খেয়ে আসবার অনুরোধ করেন। কিন্তু সময়াভাবের জন্য সে অনুরোধ রক্ষা করতে পারি না। ধন্যবাদ জানিয়ে ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিই। বালিময় প্রান্তর পেরিয়ে এগিয়ে চলি দক্ষিণে। সামনে 'সাগর-সীমাফোর' অর্থাৎ বন্দর কর্তৃপক্ষের জল-পরিমাপ কেন্দ্র।

বাঁদিকে অর্থাৎ পূবে বন। হেতাল গেঁয়ো কেওড়া ও কাঁটাগাছের বন। এই বনের ওপারেই মেলা। আমাদের যেতে হবে সাগরতীর দিয়ে। সাগরের দিকেই চলেছি আমরা।

চলতে চলতে আলতাব বন আর বনবিবির গল্প বলছে। এই বনে নাকি হরিণ শেয়াল আর শুয়োর আছে অনেক। তারা কারও ক্ষতি করে না। কারণ ওরা সবাই বনবিবির অনুচর। বনবিবির একটি বাঘ আছে। তিনি সেই বাঘের পিঠে চড়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়ান।

হঠাৎ শ্যামা প্রশ্ন করে আমাকে, "আলতাব যা বলছে, তা সত্যি কি?"

"বলতে পারব না, তবে আমিও শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর 'বাংলার লৌকিক দেবতা' বইতে বনবিবির কথা পড়েছি।"

"কি পড়েছো?"

"চব্বিশ পরগণা ও খুলনা জেলার বহু বনময় গ্রামে আজও তিনি পরম সমাদরে পূজিতা। তিনি বনের অধিষ্ঠাত্রী এবং ব্যাঘ্রদেবী বলে পরিচিতা। সুন্দরবনের বহু হিন্দু-মুসলমান যাত্রী বিশ্বাস করেন, বনবিবি কৃপা করলে তাঁদের যাত্রা নির্বিঘ্ন হবে। তাঁদের মতে বনবিবি ভক্ত-বৎসলা ও দয়াবতী। তাঁর মূর্তিও পৌরাণিক দেবীদের মতই সুশ্রী।"

"তিনি তাহলে পৌরাণিক দেবী নন?" শ্যামা প্রশ্ন করে।

আমি উত্তর দিই, "না। তিনি লৌকিক দেবী।"

"তাঁর মূর্তি কেমন?"

"মুসলমান অঞ্চলে খানদানী পরিবারের কিশোরীর মত আর হিন্দু অঞ্চলে বাঘের ওপরে বনফুলের মালা গলায় মাতৃমূর্তি। হিন্দু-ভক্তরা তাঁকে বনদুর্গা, বনচণ্ডী, বনষষ্ঠী বা বিশালাক্ষী বলে থাকেন। মুসলমানদের তিনি শুধুই বনবিবি। গোপেন্দ্রবাবুর মতে বনবিবি 'হিন্দু-মুসলমান ধর্মচিন্তার সমন্বিত বা মিশ্রিত অরণ্যদেবী'। এখনও এ অঞ্চলে কয়েক দল গায়ক আছেন, যাঁরা বনবিবির পালা ও যাত্রাগান গেয়ে থাকেন।"

সাগর-সীমাফোরের উঁচু পাঁচিল পেরিয়ে আমরা সাগর সৈকতে এলাম।

এইখানে আমার দেশের মাটি শেষ হয়েছে। তাড়াতাড়ি খানিকটা মাটি তুলে মাথায় ঠেকাই।

সাগরতীর দিয়ে পূবে হেঁটে চলি। একটু বাদেই সেই বনের সীমা। সমুদ্র থেকে ছোট ছোট নালা গিয়ে বনভূমিকে জলায় পরিণত করেছে। সাগর ও বনের মাঝে শ'খানেক হাত বালুকাবেলা—আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে গেছে।

সহসা থমকে দাঁড়ায় আলতাব। ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছে সে। সাপ-টাপ নয় তো! তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসি।

না, সাপ নয়—দাগ। একটি নয়, একসারি দাগ। ফুটখানেক চওড়া বেশ গভীর দাগ। সাগর থেকে উঠে এসে বনের ভেতরে চলে গেছে। আলতাবও সেই দাগ দেখে দেখে বনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

"ও কোথায় যাচ্ছে?" শ্যামা বলে ওঠে। আমারও একই জিজ্ঞাসা।

না। বনের প্রান্তে পৌঁছে আলতাব আবার ফিরে আসছে। ঠিক যেখান দিয়ে গিয়েছিল সেখান দিয়ে নয়। আমারও নজর পড়ে। আর একসারি দাগ নেমে এসেছে ওপর থেকে—মিলিয়ে গেছে সাগরের জলে। আলতাব ফিরে আসে সেই দাগ ধরে।

এসেই বলে, "কপাল খারাপ বাবু। মালটা খুবই ভাল ছিল।"

"মাল? কি মাল?" আমি বুঝতে পারি না।

সে বলে, "কাঠা, যাকে আপনারা কচ্ছপ বলেন। সাগরের কচ্ছপ। দেড় মণ দু মণ ওজন হয়। এটা খুবই বড় ছিল। কিন্তু চলে গেছে।"

"কচ্ছপ দিয়ে কি করতে?"

"বেচতাম—মাংস বেচতাম। পঞ্চাশ-ষাট টাকা মণ বিক্রি হয়। ভাগা

দিলে এক ঘণ্টায় লুঠ হয়ে যায়। খেতে খুবই ভাল কিনা।"

"তা অত বড় কচ্ছপ ধরতে কেমন করে?" শ্যামা প্রশ্ন করে।

"খুবই সহজ কাজ মা। ছুটে পেছনে গিয়ে উল্টে দিতে হয়। তারপরে পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে গেলেই হল।"

"তা ওরা জল থেকে তীরে আসে কেন?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"ডিম পাড়তে। ডিম দেবার সময় হলে ওরা সাগর থেকে উঠে আসে। জঙ্গলে গিয়ে ডিম পেড়ে আবার সাগরে নেমে যায়। রোজ রাতে এসে ডিমের তদারকি করে। তারপরে বাচ্চা ফুটলে তাদের নিয়ে চলে যায় সাগরে।"

"ওদের ঠিক খেয়াল থাকে, কোথায় ডিম পেড়েছে?"

"তা না থাকলে চলে কেমন করে! তবে তদারকি করার জন্য ওরা সাধারণত রাতে তীরে আসে, আবার খুব ভোরে জলে নেমে যায়।"

"তাহলে তো রাতে এখানে এলে এই কচ্ছপটাকে পেতে পার?"

"পারি কিন্তু আমার যে টর্চ-বাতি নেই বাবু। যাদের আছে, তারা রোজ রাতে সাগরপারে কাঠা খুঁজে বেড়ায়। পায়ও মাঝে মাঝে।"

চুপ করে থাকি। ভাবি, সংসারে কত সমস্যা। একটা টর্চের অভাবে আলতাব খেতে পাচ্ছে না। একটু বাদে বলি, "চল, এগিয়ে যাওয়া যাক।"

"চলুন।" আলতাব এগিয়ে চলে। আমরাও তার পেছনে চলতে শুরু করি। ডাইনে বিক্ষুব্ধ সাগর—বঙ্গোপসাগর। প্রতি মুহূর্তে দলে দলে ঢেউ এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে তীরে। আমি বঙ্গভূমির শেষপ্রান্তে উপনীত।

চলতে চলতে খেয়াল হয় আমার, জলের ঠিক ওপরে মাটিতে অসংখ্য গর্ত। তারই আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট লাল কাঁকড়া। একেবারে টকটকে লাল—ভারী সুন্দর দেখতে। কিন্তু আমাদের সাড়া পাওয়া মাত্র মিলিয়ে যাচ্ছে—গর্তের ভেতরে। দেখতে বড়ই মজা লাগছে।

মজা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। সহসা শ্যামা জিজ্ঞেস করে আলতাবকে, "ওটা কিসের দাগ?"

লক্ষ্য পড়ে আমার। ফুট-দুয়েক চওড়া বেশ গভীর একটা দাগ—সাগর-তীরের নরম মাটিতে। আগের দাগের মত অবিন্যস্ত নয়।

আলতাব বলে, "ভাল মাল ছিল মা। যে পেয়েছে, তার কপাল ভাল।"

"কি মাল ?"

"মনে হচ্ছে বড় একখানা তক্তা।"

"কোথা থেকে এলো ?"

"ভেসে এসেছে। আসে তো, মাঝে-মাঝেই এমন বহু জিনিস ভেসে আসে। একবার তো একটা বড় জাহাজ চড়ায় ঠেকে গেল। জাহাজে ছিল গম। জাহাজ ছাড়বার জন্য সাহেবরা এমনি আমাদের গম নিয়ে আসতে বললেন। আমরা নৌকো করে গম নিয়ে এলাম। আমি পাঁচ বস্তা গম পেয়েছিলাম।"

"আচ্ছা তোমাদের রোজগার কি ?" জিজ্ঞেস করি আলতাবকে।

সে বলে, "মেলার সময় আর চাষের সময় ছাড়া আর কোন কাজ নেই এখানে। অন্য সময় আমরা সাগরে পয়সা কুড়োই।"

"রোজ পাও ?" শ্যামা প্রশ্ন করে।

"না মা। রোজ পেলে তো কথাই ছিল না। তবে মাঝে মাঝে পাই। কাল একটা আধুলি পেয়েছিলাম। চাল কিনে তিনজনে একবেলা খেয়েছি। আজ সকালে কিছুই পাই নি। তাই মনে মনে বড় রাগ হচ্ছিল কপিলবাবার উপর—মেলার দিনে মেয়েটাকে দুটি ভাত দিতে পারব না! কিন্তু বাবা দয়াময়।" মুসলমান আলতাব হিন্দুদের মতো হাতজোড় করে আকাশের দিকে চেয়ে কাকে যেন প্রণাম করে, বোধ হয় কপিলমুনিকে। তারপরে বলে, "বাবার দয়ায় দেখা হল আপনাদের সঙ্গে।"

থামে আলতাব, কিন্তু আমি কিছু বলতে পারার আগেই সে করুণস্বরে বলে, "মা-ঠান, আপনি তখন এক টাকা দেবেন বলেছেন, আমি তাতেই রাজী হয়েছি। কম বললেও আমাকে রাজী হতে হত। কিন্তু দয়া করে যদি আমাকে দেড়টা টাকা দেন, বড় উপকার হয়।"

"কি উপকার ?" শ্যামা জিজ্ঞেস করে।

"এক কিলো চাল কিনতে পারি।"

"বেশ, তাই পাবে।"

"বাবা আপনাদের ভাল করবেন।" আলতাব তার জীবনদেবতার কাছে আমাদের মঙ্গল কামনা করে।

আর আমি নীরবে ভাবতে থাকি আলতাবদের কথা—তাদের এই দেশের কথা, স্বাধীন দেশ—ভারত ও পাকিস্তান। আলতাবদের কি লাভ হল এই

স্বাধীনতায়? কি ফল তারা পেল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে? পরিকল্পনাহীন পরাধীন দেশে কি আলতাবরা এর চেয়ে সুখে ছিল না?

শ্যামাও কিন্তু নিঃশব্দে পথ চলেছে। সে-ও কি আমার মতো আলতাবের কথা ভাবছে? কেমন করে বলব? কেবল দেখছি সে মাঝে মাঝে সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকছে। সে কি ঊর্মিমুখর সাগরের ঢেউ গুনছে? না ভাবছে—'নারীর ঢেউ স্বামী বিনে অন্য কে ধরে ভূতলে!'

আরও অনেক কথা ভাবতে পারে শ্যামা। ঊর্মি তো কেবল ঢেউ নয়, সে যে শোক-মোহ-জরা-মৃত্যু ও ক্ষুৎপিপাসার প্রতীক্। কিন্তু শ্যামা কি ভাবছে? সাগরতনয়দের কথা, কি সংসার-সাগরের কথা?

কোন কথাই জিজ্ঞেস করি না তাকে। আমি কেবল তার পাশে পাশে নীরবে পথ চলি। এদিকটা বড়ই নির্জন। কেউ বড় একটা আসে না এদিকে। আসবে কেন, মেলা যে এখান থেকে কম করেও মাইলখানেক হবে।

সহসা শ্যামা বলে, "আর পারি না বাপু। সেই থেকে হাঁটছি। একটু বসা যাক, জায়গাটা বড় সুন্দর।" ঝুপ করে বালির ওপরে বসে পড়ে সে।

বাধ্য হয়ে আমাকেও বসতে হয় পাশে। বসে কিন্তু ভালই লাগছে। একে তো অনেকক্ষণ বাদে বসতে পেলাম, তার ওপরে জায়গাটা সত্যি সুন্দর। সামনে রামধনু রাঙা সীমাহীন সাগর, পেছনে সবুজ বনানী। মিঠে রোদ আর কড়া হাওয়া। বেশ লাগছে বসে থাকতে।

আমাদের বসতে দেখে আলতাব খানিকটা দূরে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল। ওকে আর দেখা যাচ্ছে না।

শ্যামা হাসে। বলে, "তোমার আলতাব ভেবেছে এ সময় তার আমাদের সামনে থাকা উচিত নয়। কেন জান?"

কথাটা আমার অজানা নয়, কিন্তু বলতে পারি না। চুপ করে থাকি।

শ্যামা কিন্তু নিরুত্তর থাকে না। বলে, "ও ভেবেছে আমরা এখন এই নির্জন সৈকতে বসে প্রেম করব!"

আমার কান দুটো লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। কোন যুবতী এই পরিবেশে এমন কথা বলতে পারে, জানা ছিল না আমার। আমি চুপ করে থাকি।

শ্যামা আবার বলে, "ওর কি দোষ বল! সংসারে সবাই যেমন, তুমি যে তার থেকে আলাদা, তা ও জানবে কেমন করে?"

কি বলব ? ব্যাপারটা ব্যক্তিগত এবং জটিল। নীরব থাকাই নিরাপদ।

কিন্তু শ্যামা আমার নীরবতা বরদাস্ত করে না। সে আমার আরও কাছে এগিয়ে আসে, আমার একখানি হাত ধরে হঠাৎ পাগলের মত চিৎকার করে ওঠে, "তুমি কথা বলছ না কেন ?"

"কি বলব ?" আমি শান্তস্বরে পাল্টা প্রশ্ন করি।

"কোন কথাই কি তোমার মনে আসছে না ?"

"না।"

"কেন ?"

"জানি না।"

"না না, আর না !" শ্যামার স্বরে সেই উত্তেজনা। " 'না' ছাড়া কি আর কোন কথা নেই তোমার ? তুমি না পুরুষ, তুমি না যুবক ? এই নির্জন সৈকতে একা একজন যুবতীকে পাশে পেয়েও তোমার 'হ্যাঁ' বলতে ইচ্ছে করছে না ?"

শ্যামা উত্তেজনায় কাঁপছে। সে কাঁদছে। কিন্তু আমি কি বলতে পারি ওকে ? আমি তাই নীরবে বসে থাকি।

সব কথা বলা হয় নি শ্যামার। সে কম্পিত স্বরে আবার শুরু করে, "তোমাদের কাছ থেকে, নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর পুরুষ জাতটার কাছ থেকে, আমার কত প্রত্যাশা ছিল ! কিন্তু তোমরা কি দিলে আমাকে ?" একবার থামে সে। তারপরে স্তিমিতস্বরে আবার বলতে থাকে, "তোমরা কিছুই দিলে না আমাকে—সুখ দিলে না, শান্তি দিলে না, সম্মান দিলে না। এমন কি একটা সন্তান পর্যন্ত দিলে না…"

আর কিছু বলতে পারে না শ্যামা। সে আমার কোলে মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। আর আমি উদ্বেলিতা শ্যামাকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত সাগরের বালুকাবেলায় বসে থাকি। নীরবে সময় চলে বয়ে। সীমাহীন সাগরের ঢেউ এসে বার বার আছাড় খেয়ে পড়ছে সাগরদ্বীপের বুকে।

কেটে যায় কিছুক্ষণ। শ্যামার মাথায় একখানি হাত রাখি। সে একটু নড়ে ওঠে। আমি বলি, "সংসারে সবাই তো সব কিছু পায় না। আর আপনিই তো বলেছেন, বাবাজীর কাছ থেকে আপনি যা পেয়েছেন, তার মূল্যও কম নয়। যে নিজেকে কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণ করেছে, তার তো পার্থিব বস্তুর জন্য এমন আকুল হওয়া উচিত নয় ?"

মুখ তোলে না শ্যামা। সে তেমনি আমার কোলে উপুড় হয়ে আছে। তবে তার কান্নার শব্দটা আর শুনতে পাচ্ছি না।

কেটে যায় কিছুক্ষণ। শ্যামা উঠে বসে। চোখ মোছে। একটু ম্লান হেসে বলে, "অনেক দেরি হয়ে গেল, এবারে চল ঘরে ফেরা যাক্। দি'মা পথ চেয়ে বসে আছেন।" অবিন্যস্ত শাড়িটাকে ঠিক করে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় শ্যামা।

আমরা আবার পথ-চলা শুরু করি। সাগর সৈকতের পথ। শান্ত সমুদ্র নয়, উর্মিমুখরিত মহাসাগর।

॥ বারো ॥

বিকেলে পথের ভিড় আরও বেড়েছে। বাড়বেই তো। প্রতি মুহূর্তে নতুন যাত্রী আসছেন। এ যেন জোয়ারের জল—আসার বিরাম নেই, আসছে তো আসছেই। এখনও গোটা রাত পড়ে আছে। যাত্রীরা আসবেন সারারাত ধরে। কলকাতা থেকে আজ সকালে যে সব স্টীমার ছেড়েছে তারা এসে পৌঁছবে দুপুররাতে। হাজার হাজার যাত্রী নিয়ে আসবে। তাছাড়া লঞ্চ নৌকো আর বাস তো রয়েছেই। কত এসেছে তা যেমন বলা শক্ত, তেমনি কত আসবে তা বলাও সম্ভব নয়। শুধু জানি অসংখ্য যাত্রী এসেছেন, আরও সংখ্যাতীত যাত্রী আসবেন এই মহামানবের সাগরতীরে—গঙ্গাসাগরে।

এই আসার স্রোতে ভাঁটা পড়বে কাল। না, কাল নয়। আমাদের নৌকো ছাড়বে পরশু সকালে। পরশু আমরা গঙ্গাসাগর থেকে বিদায় নেব।

চলে যাব? হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। থাকার জন্য তো আসি নি এখানে।

কিন্তু দি'মা আর শ্যামা?

হ্যাঁ, তারাও চলে যাবে। যাবে এই মেলা ছেড়ে, গঙ্গাসাগর ছেড়ে, আমাকে ছেড়ে। হয়তো আর কোনদিন দেখাই হবে না। না হওয়াই নিয়ম—জীবনের নিয়ম। মানুষ জীবনপথের পথিক। কিন্তু পথ মানুষের ঘর নয়।

দি'মাকে সাধু-দর্শন করিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম ঘরে। সন্ধ্যা হয়ে

গেছে, কিন্তু শ্যামা আলো জ্বালায় নি। সাড়া দেয় না সে। বোধ করি ঘুমিয়ে রয়েছে।

দি'মাও তাই ভাবেন। বলেন, "তুই ভিতরে ঢুকে আলো জ্বালা। শ্যামা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমোক বেচারী, কাল রাতে ভাল ঘুম হয় নি।"

আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকি। প্রায়ান্ধকার ঘর। হাতড়ে হাতড়ে দেশলাই বার করে মোমবাতি জ্বালাই। শ্যামা ঘুমিয়ে আছে।

"আলো জ্বালিয়েছিস বাবা?" দি'মা বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করেন।

"হ্যাঁ, ভেতরে এসো।" আমি উত্তর দিই।

দি'মা ঘরে আসেন। শ্যামার দিকে তাকিয়ে বলেন, "ওকে ডাকিস নে। আর একটু ঘুমোক। তুই বরং স্টোভটা জ্বালিয়ে দে। আমি চায়ের জলটা চাপিয়ে দিই। বড্ড শীত পড়েছে।"

স্টোভ জ্বালিয়ে দিয়ে আমি কলতলায় চলি।

হাত-মুখ ধুয়ে এক বালতি জল নিয়ে ফিরে আসি। ঘরে ঢুকে দেখি, শ্যামা চা খাচ্ছে। আমাকে দেখেই বলে, "অপরাধ নিও না। তোমার আগেই আমি চা নিয়ে বসে গেছি।"

"বেশ করেছেন।" গামছা রেখে আমি ওর পাশে বসি। দি'মাকে বলি, "দাও, আমার চা দাও। বড্ড শীত করছে।"

"হ্যাঁ, এই নে।"

কাপটা হাতে নিয়ে শ্যামাকে বলি, "অবেলায় ঘুমোচ্ছিলেন কেন?"

"ঘুম পেয়েছিল বলে।" সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়। তারপরেই ধমক লাগায় আমাকে। বলে, "উকিলের জেরা না করে, একবার যাও তো মেলা থেকে ঘুরে এসো!"

"কেন?"

"দি'মার জন্য কয়েকটা ফল ও একটু মিষ্টি, আর তোমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে এসো। রাতে রান্নার হাঙ্গামা হবে না। আগেই বলে নিলাম, পয়সা আমি দেব।"

দি'মা শ্যামাকে বলেন, "কিন্তু তোর জন্য কিছু আনতে দিবি না?"

"না। আমার একদম খিদে পায় নি।"

"পাগল নাকি, এত বড় রাত—না খেয়ে থাকবি! তার ওপর কাল কাজকর্ম সেরে কখন খাওয়া জোটে ঠিক নেই।" দি'মা প্রতিবাদ করেন।

আমাকে বলেন, "ফলটা একটু বেশি করে আনিস। ফল ছাড়া আজ রাতে শ্যামা আর কিই বা খাবে!" দি'মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

একটু বাদে টর্চ হাতে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। বড় রাস্তার মোড়ে একটা ভিড়। থমকে দাঁড়াই। কি ব্যাপার? সভা-টভা নয় তো? না, সভা নয়, সমাবেশ—সামাজিক সমাবেশ।

একটু কাছে এসে দেখতে পেলাম তাদের। ছেলেটির বয়স বছর বিশেক। পরনে প্যান্ট, গায়ে ফুলহাতা সোয়েটার। আর মেয়েটির শাড়ি ও কার্ডিগান। বয়স ষোল-সতেরোর বেশি নয়। মেয়েটি সুশ্রী। ছেলেটিও দেখতে ভালই।

সমাজ-সংস্কারকেরা জানায়—মাস তিনেক আগে ঐ ছেলেটা এই নাবালিকাকে ফুসলিয়ে নিয়ে পালিয়েছিল। পুলিসে খবর দিয়ে, কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে, বাপ মেয়ের খোঁজ পান নি। কয়েক মিনিট আগে অকস্মাৎ এখানে তিনি তাদের দেখতে পান। চীৎকার করে লোক জড়ো করে অবাধ্য মেয়ে সহ তার অবৈধ প্রণয়ীকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছেন বাবা।

পুলিস এলেন। এ অবস্থায় তাঁরা ছাড়া আর কারাই বা আসবেন? বাপ মেয়ে ও তার প্রণয়ীকে নিয়ে কোথায় চলে গেলেন তাঁরা। ভিড় ভেঙে গেল, কিন্তু মিলিয়ে গেল না। পুণ্যার্থীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে সুস্বাদু প্রসঙ্গকে রোমন্থন করতে থাকলেন। আমি এগিয়ে চলি আপন পথে।

কিন্তু ছেলে-মেয়ে দুটোর ভাবনা মিলিয়ে যায় না মন থেকে। অপমানে জর্জরিত হয়ে মৃতপ্রায় ওরা। নতমস্তকে দাঁড়িয়েছিল কোনমতে। তবু ওদের বড় ভাল লাগছিল আমার। দুটিকে ভারী চমৎকার মানাতো। দেখে মনে হল, মোটামুটি লেখাপড়া জানে ওরা। মনের মতো বাসা বাঁধার আশায় একদিন হাত-ধরাধরি করে ঘর ছেড়ে পথে নেমে এসেছিল। হয়তো সেই থেকেই পথে পথে কাটাচ্ছে। তবু ওরা ক্লান্ত হয় নি। আশায় বুক বেঁধে জীবনের পথে এগিয়ে চলেছিল। চলতে চলতে এই মহামেলায় এসে মিশেছিল। হয়তো ভেবেছিল, মকর সংক্রান্তিতে পুণ্যস্নান করে মহামুনি কপিলদেবের কাছে সুন্দর জীবন কামনা করবে।

সব আশা বিফল হল। থানা থেকে হাজত, সেখান থেকে আদালত। বিচার হবে ওদের। বিচারে প্রমাণিত হবে মেয়েটি নাবালিকা। বিচারক

ছেলেটাকে দণ্ডিত করবেন। বাপের মুখে হাসি ফুটবে। সমাজ সুখী হবে। কিন্তু মেয়েটা? সে কি সুযোগ পেলে আত্মহত্যা করবে?

নাও করতে পারে। এমন কি অসুবিধে বুঝে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বাপের উকিলের শেখানো বুলি আবৃত্তি করে ছেলেটার জেলে যাবার পথ সুগম করেও দিতে পারে।

তারপরে এক 'মাঘে শুক্লপক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ' পিতার পছন্দসই জনৈক যুবকের গলায় গোড়ের মালা পরিয়ে দিলে, সেই অপরিচিত ভদ্রলোক মেয়েটির পাণিপীড়ন করে বলবেন—'যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম।'

কিন্তু মেয়েটি সুখী হতে পারবে কি?

কেন পারবে না? সুখ তো স্বর্গের সামগ্রী নয়, মর্ত্যের মদিরা।মা সুখের জন্যই সুখ। তাকে মনের মত তৈরি করে নিতে হয়।

কিন্তু বিগত দিনগুলির কথা? বাড়ি থেকে পালিয়ে আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত? এই কদিন ওরা একসঙ্গে চলেছে, খেয়েছে, শুয়েছে। দেহ ও মনের কোন কামনাই ওরা অপূর্ণ রাখে নি। সে-সব কথাও কি ভুলতে পারবে সে?

না পারলে তার দুঃখ ঘুচবে না। আর সুখের প্রত্যাশী হলে তাকে এ-সব স্মৃতি বিস্মৃত হতে হবে। সেন্টিমেন্টের মোহমুক্ত না হতে পারলে সংসারে সুখী হওয়া যায় না।

আমার ভাবনায় ছেদ পড়ে। পথের পাশে নজর পড়তেই চমকে উঠি। কে? বিভূতি না? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সে। আমাদের বিভূতি—ডাঃ বি. সেন, এম. বি. বি. এস. (ক্যাল.)। কিন্তু বিভূতিভূষিত হয়ে সাগর মেলায় পথের পাশে চোখ বুজে বসে থাকবে কেন?

না না, এ কোন সন্ন্যাসী। কিন্তু সেই সন্ন্যাসীর সামনে ঐ কে দাঁড়িয়ে? সরোজ নয়? ডাঃ এস. রায় চৌধুরী—বিভূতির সহপাঠী ও সহকর্মী?

সরোজ দেখতে পায় আমাকে। ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে নীরব থাকার ইশারা করে। ত্রস্ত পদক্ষেপে এগিয়ে আসে কাছে। বলে, "কবে এলি?"

"কাল। তোরা?"

"পরশু। হেল্থ সারভিসের তরফ থেকে এসেছি। কাল সারাদিন হেল্থ সেণ্টারে বসে মাছি তাড়িয়েছি। রোগী আসে নি বললেই চলে। আসবেই

বা কেন? সবে তো আজ সকালে আসল মেলা বসল। লোকজন সব আসুক, দোকানে দোকানে খাওয়ার পাট শুরু হোক। তবে তো অসুখ-বিসুখ আরম্ভ হবে। বসে থাকতে থাকতে তাই কোমর ব্যথা হয়ে গেল। আজ সকালেও একই অবস্থা। দুরবস্থা নিরসনের জন্ম হঠাৎ বুদ্ধি মাথায় এসে গেল।"

"কি বুদ্ধি?" আমি প্রশ্ন করি।

"মানে বুদ্ধিটা ঠিক আমার মাথায় আসে নি। এসেছে শ্যামলের—আরে শ্যামল, ডাঃ এস. বাসুরায়। সেও এসেছে। এখন হেল্‌থ সেণ্টারে রয়েছে। রোগী আসুক আর নাই আসুক, একজনকে তো থাকতেই হবে।"

"তা তো বটেই।" আমি সমর্থন করি।—"কিন্তু বুদ্ধিটা কি?"

"বলছি ভাই বলছি। শ্যামলের বুদ্ধি অনুযায়ী বিভূতি মাথায় পাগড়ি বেঁধে, ল্যাঙট পরে, গায়ে ছাই মেখে বসে গেলে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে। আর আমি তার শিষ্য সেজে সামনে দাঁড়িয়ে ক্যানভাসিং শুরু করে দিলাম। আশাতীত ফল ফলেছে রে ভাই! টাকা আধুলি সিকি আর খুচরো পয়সা মিলে এক বেলাতেই সাতষট্টি টাকা সাতাশ পয়সা প্রণামী পড়েছে। এভাবে চললে রাত আটটার ভেতরেই একশ' টাকা উঠে যাবে। ওটাই আমাদের টারগেট। কলকাতায় ফিরে 'ফীস্ট' হবে এই টাকায়।" শেষ করে উচ্চস্বরে হাসতে থাকে সরোজ।

আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই সে আবার বলে, "সাধুগিরি ডাক্তারীর থেকে অনেক ভাল প্রফেশান রে! কিন্তু কি করব, কাল আর বিভূতি সাধু সাজতে পারবে না। কাল স্নান, কাল ডাক্তারী করতে হবে। তাছাড়া কাল বিপত্তিও বাধতে পারে। কোথা থেকে পরিচিত কেউ এসে হাঙ্গামা বাধিয়ে দেবে কে জানে! গোটা কলকাতাই যে উঠে এসেছে গঙ্গাসাগরে।" একটু থামে সরোজ, তারপরে বলে, "সাগরমেলায় সেবা করতে এসে বেশ একটা মজা করা গেল, কি বলিস!"

"হ্যাঁ, মজা তো বটেই।" উত্তর দিই, "এ তো শুধু সন্ন্যাসী সাজা নয়, সেই সঙ্গে প্রণামী-প্রাপ্তির মজা। যাক্ গে, চলি, তুই তোর গুরুদেবকে অ্যাটেণ্ড কর। তাকে আমার কথা বলিস। ভয় নেই, আমি কাউকে বলব না। তবে সাবধান, মজার মোহে আবার কোন বিপদে পড়ে যাস নে যেন।"

"না না, খেলা তো প্রায় খতম হয়ে এল, আর কি বিপদ হবে!"

"কাল কোন সহযোগী সন্ন্যাসী কিংবা প্রণামীদাতা যদি অসুস্থ হয়ে হেল্‌থ সেণ্টারে গিয়ে ডাক্তাররূপী প্রাক্তন সাধুবাবাকে আবিষ্কার করে ফেলে?"

"আরে না না, তুই কি পাগল হয়েছিস! ওদের ঘটে অত বুদ্ধি থাকলে তো ওরা সাগরমেলায় না এসে দিল্লীতে বসে পলিটিক্স করত।...আচ্ছা ভাই, আমি যাচ্ছি। বিভূতি একা রয়েছে।"

সরোজ চলে যায় বিভূতির কাছে। আমি এগিয়ে চলি। মনে করতে চেষ্টা করি, দি'মা কি সাধুদর্শনের সময়ে বিভূতিকে প্রণামী দিয়ছেন? সম্ভবতঃ দিয়েছেন, আমি খেয়াল করি নি। হয়তো তিনি সন্ন্যাসীরূপী সংসারী ডাক্তারকে ভক্তিভরে প্রণাম করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বলেছেন, 'বাবা আমার যেন ধম্মে মতি হয়'। আর বিভূতি বলেছে, 'তথাস্তু'।

না, দি'মার আর ধর্মে মতি না হয়ে যায় না। জয় গঙ্গা মাঈকি...জয়, জয় গঙ্গাসাগর কি...জয়, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত বিভূতিবাবাজীকি...জয়।

ফল মিষ্টি ও খাবার কিনে ফিরে চলেছি ঘরে। এ তো শুধু মানুষের মেলা নয়, আলো আর আনন্দের মেলা। কেবল তীরে নয়, জলে। সাগর আর মুড়িগঙ্গার জলেও এই আনন্দের ছোঁয়া লেগেছে, আলো জ্বলেছে—নৌকো লঞ্চ ও স্টীমারে। মনে হচ্ছে কালো মাটিতে মাণিক জ্বলছে। ঢেউয়ের তালে আলো দুলছে। যেন হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছে।

তবু সে ডাকে সাড়া দিতে পারি না। এখানে এসেও যে স্নেহ আর ভালবাসায় বাঁধা পড়েছি। আমাকে তাই ফিরতে হয় ঘরে।

ঘরে ঢুকতেই শ্যামা বলে, "মিষ্টি কিনতে গিয়ে মিষ্টিমুখের টানে পড়ে গিয়েছিলে নাকি!"

"না।"

বিভূতির ব্যাপারটা বলি ওদের। শুনে দুজনেই হাসল কিছুক্ষণ ধরে। তারপর দি'মা বলেন, "এইরকম সব দুষ্টদের সঙ্গে তোর বন্ধুত্ব আছে নাকি?"

"দি'মার যেমন কথা," আমি উত্তর দেবার আগেই শ্যামা বলে, "আপনার ধারণা নাতিটি একেবারে শান্তশিষ্ট ও গোবেচারী! আসলে যে সে একটি দুষ্টের শিরোমণি আর লম্পটের চূড়ামণি, তা বোধ হয় জানা নেই আপনার।"

"দেখুন, অযথা গালাগালি দেবেন না বলে দিচ্ছি।" আমি রেগে যাই।

শ্যামা বিস্মিত স্বরে বলে, "ওমা, তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? আমি আবার

কখন তোমাকে গালাগালি দিলাম?" একটু থামে সে। তার পরে গম্ভীর স্বরে বলে, "যাঁর প্রেমে পাগলিনী হয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলাম, আমার সেই রাধারমণও যে দুষ্টের শিরোমণি ও লম্পটের চূড়ামণি।"

লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকি। কি বলব, 'কলির কেষ্ট' কথাটা পছন্দসই না হলেও প্রতিবাদ করা যায় না।

কিন্তু শ্যামা চুপ করে না। সে বলে, "আপনার নাতির আর একটা গুণের কথা তো বলাই হয় নি!"

"কি গুণ আবার?" দি'মা প্রশ্ন করেন।

"আপনার নাতি বই লেখে। অনেকগুলি বই লিখেছে।"

"ও মা, তাই নাকি? তোর পেটে এত বিদ্যে?" দি'মা আমার দিকে তাকান। শ্যামা মুচকি হাসছে। দীপকবাবুর চিঠিতে আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ছিল। সুশীলবাবুদের কাছে কথাটা শুনেছে শ্যামা। আমি চুপ করে থাকি।

খেয়ে নিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘরের বাইরে আসি, রাত ন'টা বেজে গিয়েছে। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। শ্যামার খালি পা। তার নিশ্চয়ই চলতে কষ্ট হচ্ছে। তার ওপর যেমন দমকা হাওয়া, তেমনি কুয়াশা। দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছে না, কাছের জিনিস আবছা হয়ে উঠেছে। আমরা কলতলায় চলেছি।

পথ কিন্তু জনবিরল নয়। অসংখ্য পথচারী যাওয়া-আসা করছে। কেউ কারণে ছুটছে, কেউ অকারণে পায়চারি করছে। কারণ না থাকলেই ঘরে বসে থাকতে হবে, তার কি মানে আছে? ঘরের জন্য তো কেউ মেলায় আসে নি, মেলার জন্যই ঘর নিয়েছে। শীত? শীত তো লাগবেই, পৌষ-সংক্রান্তিতে কি শীত না লেগে গরম লাগবে?

সেই কথাই বলল শ্যামা। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "শীত করছে?"

"না, গরম লাগছে!"

"আপনার খালি পা কিনা, তাই বলছিলাম।"

"আলগা দরদ না দেখিয়ে পা চালিয়ে চল। আমরা বোষ্টমী, আমাদের খালি পায়ে থাকার অভ্যেস আছে।"

একটু আহত হই। নিঃশব্দে পথ চলতে থাকি। কিছুক্ষণ বাদে শ্যামা ডাক দেয়, "গোসাঁই!"

"কি?"

"রাগ করলে?"

"না

"তবে কি অনুরাগের জন্ম চুপ করে আছ ?"

"না।"

"তাহলে চলবে কেমন করে ? দূরেও সরিয়ে দেবে না, কাছেও টেনে নেবে না !"

আমি তবু চুপ করে থাকি।

একটু বাদে শ্যামা আবার বলে, "চুপ করে আছ কেন, কিছু একটা বল ?"

"কি বলব ?"

"কথার আবার কখনও অভাব হয় নাকি ?" শ্যামা একবার থামে, তারপরে বলে, "আচ্ছা বেশ, মেলার কথাই বল—বাংলার মেলা।"

"এখন নয়, ঘরে ফিরে গিয়ে বলব। এখন আস্থন মুখ ধুয়ে নিয়ে একটু বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়াই, রাতের সাগরমেলাকে দেখে নিই।"

আমরা বড় রাস্তার মোড়ে আসি। জনবিরল পথ। দোকানে তেমন খদ্দের নেই, তবে সব দোকানেই আলো জ্বলছে। দোকানীরা দিনের হিসেব মেলাচ্ছে, কিংবা আগামী কালের প্রস্তুতি-পর্ব শেষ করে রাখছে। প্রার্থীরা অনেকেই ডালপালা দিয়ে তৈরি ঝুপড়িতে ঢুকে পড়ছে। যারা ঐ সামান্য আশ্রয়টুকুও বানাতে পারে নি, তারা পথের পাশেই কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিয়ে মড়ার মতো পড়ে আছে। এই শীতে খোলা ময়দানে এভাবে রাত কাটানো—ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু এই যে এ-দেশের নিয়ম। এদের তো এমনি করেই জীবন কাটে ! ভারতের বৃহত্তম নগরীতে যদি হাজার হাজার মানুষের জীবনে এই জীবনযাত্রা সত্য হয়, তবে আমি এখানে এদের দেখে এমন বিচলিত হচ্ছি কেন !

আমরা ঘরে ফিরে চলেছি। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পথ চলার পরে শ্যামা প্রশ্ন করে, "আচ্ছা গোসাঁই, কাল এমন সময়ে আমরা কোথায় থাকব ?"

"কেন, এখানে ! কাল তো আমাদের নৌকো ছাড়ছে না !"

"পরশু ?" শ্যামা আবার প্রশ্ন করে।

"নৌকোয়।" আমি উত্তর দিই।

"তার পরদিন ?"

চুপ করে থাকি। পরশু সকালে নৌকো ছাড়লে, তার পরদিন এ সময় কলকাতায় থাকব। থাকব শ্যামার কাছ থেকে অনেক দূরে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে শ্যামা আবার বলে, "পরশু এমন সময় আমরা যে-যার ঘরে চলে গেছি, না গোসাঁই?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু ঘর যে আমার পর হয়ে গেল। যার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি, তাকে নিয়ে তো আর ঘরে ফিরতে পারব না।" শ্যামার কণ্ঠস্বর যেন স্তিমিত।

শ্যামাকে সান্ত্বনা দিই, "আপনার কষ্ট হচ্ছে জানি, কিন্তু তিনি তো ভালই গেছেন। এমন বরণীয় মৃত্যু কজনের ভাগ্যে ঘটে? আপনাকে ধৈর্যধারণ করতে হবে। নিজের কথা ভেবে কান্নাকাটি করলে যে তাঁর আত্মা কষ্ট পাবে।"

"আমি যে আর সইতে পারছি না।" শ্যামা কেঁদে ফেলে, "আমি তোমাদের সঙ্গে চলছি ফিরছি হাসছি, কিন্তু আমার বুকটা যে ফেটে যাচ্ছে গোসাঁই।"

শ্যামা টলতে টলতে পথ চলছে। সে থরথর করে কাঁপছে। সে কি পড়ে যাবে নাকি? তাড়াতাড়ি আমি তাকে ধরে ফেলি।

কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারপরে বলি, "এ সময় এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়, চলুন ঘরে যাই।"

ঘরের সামনে এসে শ্যামা ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে। সে ঘরে ঢোকে। দি'মা শুয়ে পড়েছেন। আমরাও শুয়ে পড়ি। শ্যামা আলো নিভিয়ে দেয়। আর আশ্চর্য, তারপরেই সেই কথাটা বলে। স্বাভাবিক স্বরেই বলে, "গোসাঁই, আমরা কিন্তু ঘরে ফিরে এসেছি। এবারে মেলার কথা বল।"

"হ্যাঁ বলছি।" আমি শুরু করি—

"য়ুরোপীয়রা ঐশ্বর্যশালী ভারতবর্ষের হারিয়ে-যাওয়া পথ খুঁজে পেলেন। কিন্তু সেখানেই শেষ হল না। বাণিজ্য-বিস্তারের জন্য তাঁরা ভারতে এসেছিলেন। তাই যখন ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূলে তাঁরা মনের মত বাজার পেলেন না, তখন আরব সাগর ও ভারত মহাসাগর পেরিয়ে এলেন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরে। হিংস্র শ্বাপদ পরিপূর্ণ সুন্দরবন অতিক্রম করে গিয়ে নোঙর করলেন ফলতা কলকাতা শ্রীরামপুর চন্দননগর সাতগাঁও হুগলী চুঁচড়া ব্যারাকপুর ব্যাণ্ডেল নদীয়া বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদের ঘাটে।

"রাজশক্তির দুর্বলতা ও রাজপুরুষদের বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ নিয়ে তাঁরা এদেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন—পাণিপথ থেকে পলাশী, একই

ইতিহাস।

"সুযোগসন্ধানী বণিকগোষ্ঠী কিন্তু পলাশীর পরে শুধু মসনদ নিয়েই সন্তুষ্ট রইলেন না। তাঁরা দেশের রাজা হলেন কিন্তু দেশটাকে নিজের করে নিলেন না। তাঁদের সাম্রাজ্য রইল এপারে, আর দেশ রইল সাতসমুদ্রের ওপারে। এপারের ঐশ্বর্যকে ওপারে নিয়ে যাবার জন্য তাঁরা এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে করতলগত করলেন। শাসনযন্ত্রকে এমনভাবে শাণিয়ে তুলতে থাকলেন যাতে বাংলার বিশ্ববন্দিত-কুটিরশিল্পকে হত্যা করা যায়।

"প্রথমেই তাঁরা দণ্ডবিধায়ক রপ্তানি নীতি ও অসংযত আমদানি-নীতি প্রবর্তন করলেন। তারপরেই আঘাত হানলেন মেলাগুলির ওপরে। কারণ তখন মেলা ছিল এদেশের সর্বপ্রধান বাণিজ্যিক ও সামাজিক সম্মেলন। ফলে এদেশের কুটিরশিল্প য়ুরোপীয় যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হল। দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণশক্তি গেল ফুরিয়ে। আমরা প্রকৃত পরাধীন হলাম। আর সে পরাধীনতা আজও ঘোচেনি।

"প্রাক-বৃটিশযুগে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল মেলাকেন্দ্রিক। মেলাগুলি মূলতঃ ধর্মভিত্তিক হলেও, জাতিধর্মনির্বিশেষে সবাই মেলায় যোগদান করতেন। কাছের ও দূরের শিল্পীদের শিল্পকর্মের প্রদর্শনী বসত। কেনা-বেচার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ভাব, সংস্কৃতি, শিল্পকৌশল ও যন্ত্রপাতির আদান-প্রদান হত।

"বৃটিশ শাসনের ফলে কিছুকালের মধ্যেই মেলাগুলির দুরবস্থা ঘনিয়ে এল। সাগরমেলার কথাই ধরা যাক্। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যেখানে এক থেকে দেড় লক্ষ যাত্রী আসতেন, সেখানে শেযার্ধে আসতেন মাত্র পাঁচ হাজার।

"বৃটিশ রাজত্বকালে জনস্বাস্থ্য ও পুলিস বিভাগ ছাড়া আর কোন দপ্তর মেলার দিকে নজর দেয় নি। ফলে মেলাগুলি বাণিজ্যিক সম্মেলনের মর্যাদা হারিয়ে শুধু জনসমাবেশে পরিণত হয়। সরকারও সেই সব সমাবেশে মহামারী রোধ এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করেই তাঁদের কর্তব্য শেষ করেছেন।

"তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এদেশে যে বিরাট রাজস্ব সমীক্ষা (Revenue Survey) হয়েছিল, তাতে মেলার কোন স্থান হয় নি। এই প্রসঙ্গে অবশ্য একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম

দিকে 'গভর্ণর জেনারেল-ইন্-কাউন্সেল'-এর নির্দেশে ডাঃ ফ্রান্সিস বুচানান হ্যামিল্টন নামে জনৈক রাজকর্মচারী তৎকালীন বাংলাদেশের মেলাগুলির এক বিস্তৃত বিবরণ তৈরি করেছিলেন। কিন্তু বাংলার কুটিরশিল্পকে হত্যা করার প্রয়োজনেই সেই বিবরণ সঙ্কলিত হয়েছিল, মেলাগুলির উন্নতিবিধানের জন্য নয়। নইলে ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত আর কোন সমীক্ষা হয় নি কেন? এবং ১৮৮০ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার' গুলিতে মেলার বিবরণ অত সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হবে কেন?

"সরকার তাঁর কর্তব্যে অবহেলা করলেও বে-সরকারী পর্যায়ে সেকালের মেলার হিসেব রাখার কিছু কিছু চেষ্টা হয়েছে। যাঁরা সেদিন বাঙালীর কাছে বাংলার মেলাকে বাঁচিয়ে রাখার এই চেষ্টা করেছেন, তাঁদের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে 'নবদ্বীপ পঞ্জিকা'র কথা। ঊনবিংশ শতকের এই পঞ্জিকায় প্রতি বছর বাংলার প্রধান প্রধান মেলার একটি ফর্দ থাকতো। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নবদ্বীপ পঞ্জিকার ৩০৯টি মেলার নাম প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সে কেবলই মূল মেলাগুলির সংখ্যা, বাংলার সমস্ত মেলার নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ডাবলু. ডাবলু. হাণ্টার নামে একজন রাজ-কর্মচারী তৎকালীন বাংলার সমস্ত মেলার একটি ফর্দ তৈরী করেন। কিন্তু মেলা তখন শুধুই সমাবেশ। ইতিমধ্যে কুটিরশিল্পের নাভিশ্বাস শুরু হয়ে গেছে।

"স্বার্থপর ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে বাংলার মেলা অর্থনৈতিক মূল্য হারিয়ে ফেললেও বাঙালী তার সামাজিক মূল্যটুকু নষ্ট হতে দেয় নি। আর তাই মেলার মৃত্যু ঘটেনি। ১৯২৯ সালে বাংলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের অধিকর্তা ডাঃ এ. বেণ্টলি 'Fairs and Festivals of Bengal' নামে ছোট একটি সংকলন প্রকাশ করেন। এতে চুরাশিটি মেলার নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সেই সব মেলায় দশ হাজারের চেয়ে বেশি লোকের সমাগম হত।

"বৃটিশ সরকার চেষ্টা করলে সেই সঙ্কলন এবং হাণ্টার ও হ্যামিল্টনের বিবরণ থেকে সেকালের উৎপাদন, শিল্পকলা ও বাণিজ্য সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানতে পারতেন। কিন্তু সে উদ্দেশ্যে হাণ্টার হ্যামিল্টন কিংবা বেণ্টলি মেলার ফর্দ তৈরি করেন নি। এই সব সঙ্কলনের সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী মেলার তথা এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতিসাধন

করেছেন।

"বাইরের জগতের কাছে কিন্তু তাঁরা সে উদ্দেশ্যকে গোপন রেখেছেন। বরং ১৮৪৩ সালের 'The Bengal Local Self Govt. Act', ১৯১৯ সালের 'The Bengal Self Govt. Act V', ১৯৩২ সালের 'The Bengal Municipal Act XV' এবং ১৯৪৩ সালের 'Police Regulation of Bengal' প্রভৃতি বিভিন্ন আইনের মধ্যে মেলা নিয়ন্ত্রণের নীতি-নির্ধারণ করে দেখাতে চেয়েছেন যে মেলার উন্নতিবিধানের জন্য তাঁদের আন্তরিকতার অভাব নেই। কিন্তু এই সব আইনগুলি পাঠ করলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, সেগুলির আসল উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব আদায়, পতিতাবৃত্তি নিরোধ এবং শান্তিরক্ষা।

"এবারে স্বাধীন ভারতের কথায় আসা যাক। স্বাধীনতা পাবার পরেও মেলাগুলির উন্নতিবিধানের জন্য আমরা প্রয়োজনীয় চেষ্টা করি নি। এখনও আমাদের দেশে মেলার পরিচালনার ভার মূলতঃ স্বাস্থ্য ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হাতে। জনসংযোগ এবং শিল্প-বাণিজ্য বিভাগের ভূমিকা নেহাতই নগণ্য।

"অথচ পশ্চিম বাংলায় এমনটি হওয়া উচিত ছিল না। কারণ ১৯৫১ সালের রাজ্য আদমশুমারের প্রধান অধিকর্তা শ্রদ্ধেয় শ্রীঅশোক মিত্র 'Fairs and Festivals of West Bengal' নামে একখানি অতি প্রামাণ্য সঙ্কলন প্রকাশ (১৯৫৩ সালে) করেছেন। এই সঙ্কলন থেকে আমরা জানতে পারি যে, তখনও সারা বছরে ছোট-বড় মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ১৫১৯টি মেলা বসত।* পশ্চিমবঙ্গ কৃষিপ্রধান রাজ্য। মেলা ভারতের লোকউৎসব। পৌষ মাস বাঙালীর ফসল ঘরে তোলার সময়। তাই এ রাজ্যে সব চেয়ে বেশি মেলা হয় পৌষ-সংক্রান্তি উপলক্ষে। এই তিথিতে ৩৩টি বড় বড় মেলা বসে পশ্চিমবাংলায়। আর এ সময়েই পশ্চিম-সীমান্তবঙ্গের 'টুসু' উৎসব ও দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণরায়—বারাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। এ দুটিই আমাদের জাতীয় উৎসব।

"সাগরমেলা ছাড়া পৌষ-সংক্রান্তির অন্যান্য মেলাগুলি হল—বর্ধমান জেলার উদ্ধারণপুর ও বাবনাবেরায়। মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম,

---

* শ্রীঅশোক মিত্রের সম্পাদনায় 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা' নামে কয়েকখানি খণ্ডে এক সুবৃহৎ বাংলা সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে।

আমদাবাদ, সিদ্ধিকুণ্ড, পাটনা, মালিঞ্চা, তুলসীচারা, জুনপট, উমাপতিবার, জুনপুর, কালিন্দী, জাহানাবাদ, নরদেউল এবং টেংরামারিতে। নদীয়ার থানাপাড়া ও মুর্শিদাবাদের চৌরিগাছায়। বাঁকুড়া জেলার গারাসোল, নপুকুর, বাল্লিতা, সাপুরা এবং শানপুরায়। চব্বিশ-পরগণার শাখর, জয়নগর, মন্দির-বাজার, দক্ষিণ বিষ্ণুপুর, পোলেরহাট এবং বিজয়গঞ্জে। আর বীরভূম জেলার যাত্রা, দেওলি, মুরলিদঙ্গল এবং কেঁদুলিতে।"*

"তুমি কেঁদুলিতে জয়দেবের মেলায় গিয়েছ গোসাঁই?" শ্যামা প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ।" আমি উত্তর দিই।

"ওনার সঙ্গে আমিও বহুবার গিয়েছি।" একটু থামে শ্যামা। তারপরে বলে, "যাক গে সে কথা, তুমি সেকালের সাগরমেলার কথা বল।"

"বেশ, বলছি।" একটু ভেবে নিয়ে বলতে থাকি, "সাগরমেলা পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত একমাত্র সর্বভারতীয় মেলা।"

"আচ্ছা গোসাঁই, কবে কে এই মেলা আরম্ভ করেছেন জানো কি?"

"না।" আমি উত্তর দিই, "তবে অনেকে অনুমান করেন, ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের আগের থেকেই সাগরতীর্থ ছিল। কথিত আছে, শ্বেতদ্বীপের রাজা মাধব বঙ্গোপসাগরের তীরে এক বিশাল বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সে মন্দিরটি সর্বভারতীয় খ্যাতিলাভ করেছিল। কিন্তু সেটি কোথায় অবস্থিত ছিল এবং কবে সমুদ্রগর্ভে বিলিন হয়ে গেছে, তা কেউ বলতে পারেন না।"

আমি থামতেই শ্যামা বলে ওঠে, "চুপ করলে কেন?"

"অনেক রাত হল যে।"

"হোক গে, তুমি বল।"

আমি শুরু করি, "১৮৩৭ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় সেকালের সাগরমেলা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

'প্রতি বৎসর প্রায় ডিসেম্বর মাসের মধ্যসময়ে অনেক নৌকো ও মাড় সাগর উপদ্বীপের এক টেঁকে একত্র হইতে আরম্ভ হয়।...

'বর্তমান বৎসরের গত ডিসেম্বর মাসের শেষে উক্ত তীর্থ মেলারম্ভ হইয়া ১৬ই জানুয়ারি পর্যন্ত ছিল। ঐ যাত্রাতে যত পিনিস ও ভাউলিয়া ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাড় ইত্যাদি একত্র হইয়াছিল, তৎসংখ্যা ৬০ হাজারের ন্যূন নহে এমত অনুমান

---

* লেখকের 'কেঁদুলীর মেলায়' দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে। এবং ভারতবর্ষের অতি দূর দেশ অর্থাৎ লাহোর দিল্লী অযোধ্যা ও শ্রীরামপটন ও বোম্বাই হইতে যে বহুতর যাত্রী সমাগত হইয়াছিল তৎসংখ্যা ৫ লক্ষের ন্যূন নহে এবং এই তীর্থযাত্রাতে ব্রহ্মদেশ হইতে অধিকতর লোক আসিয়াছিল। ভারতবর্ষের চতুর্দিক হইতে বাণিজ্যকারি সওদাগর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানদারেরা যে ভূরি ভূরি বিক্রয়দ্রব্য আনয়ন করিয়াছিল তা লক্ষ টাকারো অধিক হইবে।...'

"সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা ১৮৫৩ সালের ২১শে জানুয়ারী লিখেছেন,—

'সাগর হইতে কোন প্রত্যাগত ব্যক্তির দ্বারা অবগত হইলাম যে অন্যান্য বৎসর সকল সংক্রান্তির মেলায় তথায় যেরূপ সমারোহ হয় এবার তদ্রূপ হইয়াছিল, আমারদিগের টৌন মেজর সাহেব চারিটা তোপ ও একদল সৈন্য সহিত তথায় উপস্থিত থাকিয়া অবিশ্রান্তরূপে তোপ করাতে ব্যাঘ্রের ভয় বড় বৃদ্ধি হয় নাই, কেবল তিনজন নাবিক বনমধ্যে কাষ্ঠ কাটিতে গিয়া উক্ত জন্তুর দ্বারা হত হইয়াছে। এবারে সংক্রান্তি সময়ে গগনমণ্ডল নীরদজালে আবৃত থাকাতে শীত অধিক হয় নাই, দোকানদার বিস্তর গিয়াছিল, ডাবনারিকেল পয়সায় দুইটা করিয়া বিক্রয় হইয়াছে, সাগরেও দুই ব্যক্তি পরস্ব অপহরণাপরাধে ধৃত হইয়া মিলেটারি কারাগারে বদ্ধ হইয়াছে।'

॥ তেরো ॥

দি'মার ডাকে ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলি।

দি'মা বলেন, "উঠে তাড়াতাড়ি চল্। ভিড় হয়ে যাবে।"

তিনি জিনিসপত্র বাঁধাছাদা করছেন। শ্যামা তাঁকে সাহায্য করছে।

শ্যামা আমার দিকে তাকায়। বলে, "কি গো, আর কতক্ষণ শুয়ে থাকবে? সাগরে যেতে হবে না, স্নান করবে না, যেজন্য গঙ্গাসাগরে এসেছ?"

"হ্যাঁ।" উঠে বসি। ঘড়ি দেখি। সে কি, কেবল তো চারটে বেজেছে! এখনও যে রাত রয়েছে। কিন্তু উপায় নেই। শ্যামা আমার এয়ার-ম্যাট্রেসের হাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। বাধ্য হয়ে সরে বসতে হয়। ওরা বিছানা গোটাচ্ছে।

বাঁধাছাদা করতে প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে যায়। ঘরে দরজা নেই।

কাজেই সব জিনিস ঘাড়ে নিয়ে ঘাটে যেতে হবে মাল মাথায় নিয়েই ভিড় ঠেলে মেলা পেরিয়ে মন্দির দর্শন করতে হবে।

রুকস্যাকের ওপর ওদের বিছানা বেঁধে নিয়েছি। বেশ ভারী—বইতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু না নিয়েই বা উপায় কি? শ্যামা নিয়েছে টিনের স্যুটকেস ও ঝোলা, দি'মা থলে ও পুঁটলি। সেগুলি বইতেই ওদের প্রাণান্ত।

বড় রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছি। দমকা বাতাস বইছে, প্রচণ্ড শীত পড়েছে। কুয়াশায় দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু কেউ বোধ করি শুয়ে নেই। সবাই জেগে উঠেছে। কেউ বা বেরিয়ে পড়েছে পথে। কেউ বা বের হবার আয়োজনে ব্যস্ত। আজ এখানে দিন আর রাতের তফাৎ নেই।

আমরা বেলাভূমিতে নেমে এসেছি। একে কুয়াশা তার ওপরে এদিকটায় আলো কম। অথচ না দেখে পথ চলা খুবই বিপজ্জনক। যাত্রীনিবাস থেকে একটু দূরে এবং জনবিরল হওয়ায় স্নানের ঘাট মলত্যাগের স্থানে পরিণত। ভীষণ নোংরা হয়ে আছে। টর্চের আলোয় দেখে দেখে অতি কষ্টে পথ চলেছি—সাগরসঙ্গমে চলেছি। পৌষ-সংক্রান্তির পুণ্য-ঊষা সমাগত।

শীত, আঁধার ও বিষ্ঠা—কোনটাই পুণ্যার্থীদের বিন্দুমাত্র বিচলিত করে তুলতে পারছে না। তাঁরা অবিচলিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন—চলেছেন সাগরে। লক্ষ লক্ষ মানুষ কোটি কামনা নিয়ে আজ এসেছে এখানে। তাঁদের পদশব্দে, তাঁদের উল্লাসে, তাঁদের প্রার্থনায় পরিপূর্ণ আজ গঙ্গাসাগর।

"মুই আর এই ভিড় ঠেইলা হাঁটতে পারতেছি না রে বলাই। তুই মোরে কাঁন্দে কইয়া লইয়া চল্। মুই ছান করমু।"

"কাঁন্দে লইয়া এ্যাতো মানুর মইধ্যে মুই ক্যাম্নে লইয়া যামু খুড়া! হেয়ার থিকা তুমি এই হানে থাকো। মুই তোমার নামে এট্টা বেশি ডুব দিমু হনে।"

"আরে পোড়া কপাইলা, এইয়ার লইগ্যা তরে মুই খরচা দিয়া লইয়া আইছি! ক্যাম্নেই হউক, তুই মোরে লইয়া চল্, নইলে তোর ভাল হইবে না বলাই—মা-গঙ্গার কাছে মুই তোর নামে অভিশাপ দিমু।"

বলাই ভয় পেল কিনা বুঝতে পারলাম না। খুড়ো এতদূরে এসে সাগরে স্নান করতে পারবেন কিনা, তাও জানা নেই আমার। আমি এগিয়ে চলি। দি'মা ও শ্যামা এগিয়ে গেছে।

ওরা একটু ফাঁকা জায়গা পেয়ে মালপত্র নামিয়েছে। আমিও সেখানে

এসে ভারমুক্ত হই। ওরা গায়ের চাদর ও গরম জামা খুলে মালের ওপর রাখে। জোর হাওয়া বইছে—খুবই শীত করছে। কিন্তু স্নানের জন্যই তো সাগরে আসা—গঙ্গাসাগরে। এ স্নান পুণ্যস্নান। পুণ্যের জন্য মা একদিন এখানে সন্তান বিসর্জন দিতেন, পুণ্যার্থীরা প্রাণ বিসর্জন দিতেন। আর আজ সেই পুণ্যের জন্য একটু শীত সহ্য করতে পারব না! না, আমরা এখনও এত বড় অধার্মিক হয়ে উঠি নি।

এতক্ষণে দি'মার মনে পড়ে কথাটা। শরীরটাকে একবার দুলিয়ে তিনি বলেন, "মাগো কি ঘেন্না, মড়াখেগোরা কেবল খেয়েছে আর হেগেছে। কত যে মাড়িয়েছি তার ঠিক-ঠিকানা নেই।"

হেসে বলি, "দি'মা, এ সাগরসঙ্গম—গঙ্গাসাগর, এখানে ও-সবকে চন্দন জ্ঞান করতে হয়। যাক্ গে, আর সময় নষ্ট করো না। সবাই জলে নামছে, তোমরাও তাড়াতাড়ি নেমে পড়ো, ব্রাহ্মমুহূর্ত সমাগত।"

"তুই?" দি'মা জিজ্ঞেস করেন।

"তোমরা উঠে এলে, আমি জলে নামব।"

"কিন্তু ততক্ষণে যদি সময় চলে যায়?"

"যাবে।" আমি হেসে দিই। বলি, "দি'মা তখন স্নান করলে যা পুণ্য হবে, তার বেশি পুণ্যের প্রয়োজন নেই আমার। তোমরা তাড়াতাড়ি নেমে পড়ো। ভিড় বাড়ছে, এর পরে আর জলে নামার জায়গাই পাবে না।"

"হ্যাঁ, যাই বাবা। তুই মা আমার হাতখানা ধর্।"

শ্যামা দি'মার হাত ধরে। ওরা নামতে শুরু করে। দি'মা বলেন, "একে তো অন্ধকার, তার ওপর মানুষ আর মানুষ—কেবল মানুষ। আমি তো মানুষের মাথা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

তারই ভেতর ভিড় ঠেলে শ্যামা দি'মাকে নিয়ে চলে। আমি তাকিয়ে থাকি ওদের দিকে। একটু বাদেই ওরা অগণিত পুণ্যার্থীর মাঝে হারিয়ে যায়।

দি'মা ঠিকই বলেছেন, কেবল মানুষ আর মানুষ। বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ। তাদের শিক্ষা ভিন্ন, বৃত্তি ভিন্ন, বয়স ভিন্ন। কিন্তু সবাই একই সঙ্গে আজ এসে সমবেত হয়েছে এখানে—এসেছে একই উদ্দেশ্যে। জীবনের সকল পাপ ধুয়ে ফেলে পুণ্যসঞ্চয় করতে—প্রিয়তম কামনাকে পরিপূর্ণ করতে। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র—কোন পার্থক্য

নেই এখানে। আজ সবাই সমান। আমি নীরবে তাঁদের কথা শুনি। কানে আসে—

'গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
সততং নৈমিষারণ্যে বারাণস্যাং বিশেষতঃ॥'

মন্ত্রপাঠরত একজন সন্ন্যাসী জলে নামছেন।

"সাগরস্নানে পরমায়ু লাভ হয়…" জনৈক ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ একজন যুবককে বলছেন।

কিন্তু তাঁর সব কথা শুনতে পারার আগেই নারীকণ্ঠ কানে আসে, "হে মা-গঙ্গা, তার বড় আশা ছিল সে আসবে—দুজনে একসঙ্গে স্নান করব, পুজো দেব। কিন্তু রওনা হবার দুদিন আগে বাস থেকে পড়ে ঠ্যাং ভাঙল তার। তুমি রাগ করবে বলে, তাকে হাসপাতালে রেখে, আমি একাই চলে এসেছি। তুমি তাকে ক্ষমা করো মা, আমার স্নানেই যেন তার স্নান হয় আর আমি যেন ফিরে গিয়ে তাকে ভাল দেখতে পাই।"

পূর্বদিগন্তে আঁধার কেটে যাচ্ছে, আলোর পরশ লেগেছে সেখানে। একটু আগেও সাগরে স্নানরত পুণ্যার্থীদের ছায়া বলে মনে হচ্ছিল, এখন তাদের কায়া বলে চেনা যাচ্ছে।

আমি স্পষ্ট দেখতে পারছি আমার সামনে, ডাইনে ও বাঁয়ে, যতদূর দেখা যাচ্ছে, সাগরতীরে কোথাও এতটুকু ফাঁকা নেই। দুঃসহ শীতকে উপেক্ষা করে অসংখ্য মানুষ জলে নেমে পড়েছেন। সুখী-দুঃখী, রোগী-ভোগী, সন্ন্যাসী ও সংসারী—শত-সহস্র মানুষ।

এসেছেন কামরূপ থেকে, কচ্ছ আর কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর মানুষ। এসেছেন সিকিম ভুটান নেপাল সিংহল ব্রহ্মদেশ মালয় থাইল্যাণ্ড কম্বোডিয়া আরও কত দেশ থেকে। এসেছেন কয়েক জোড়া ইংরেজ ও আমেরিকান। তাঁরা অবশ্য স্নান করতে আসেন নি, এসেছেন স্নান দেখতে। তাঁদের কাঁধে ক্যামেরা, গলায় বাইনোকুলার, হাতে টেপ্-রেকর্ডার। সেগুলির যথেচ্ছ ব্যবহার করছেন ওঁরা।

কিন্তু ওঁদের কথা থাক্। ওঁরা যাঁদের জন্য এখানে এসেছেন, তাঁদের দিকেই তাকানো যাক। কেউ কোমর-সমান, কেউ বুক-সমান, কেউ বা গলা-সমান জলে দাঁড়িয়ে ঢেউয়ের আঘাত সইছেন। কেউ চোখ বুজে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ বা সরবে মন্ত্রপাঠ করছেন—

'ত্বমন্তো লোকনামাখিলদুরিতান্যেব দহসি,
প্রগন্ত্রী নিম্ননামপি নয়সি সর্বোপরি নতান্ ॥
স্বয়ং জাতা বিষ্ণোর্জনয়সি মুরারাতি-নিবহান্,
আহো মাতর্গঙ্গে কিমিহ চরিতং তে বিজয়তে ॥
যদি তু গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং,
তদিহ তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্ ॥'

সেই একই মন্ত্র—বারো বছর আগে গোমুখীতে দাঁড়িয়ে যে মন্ত্র শুনেছিলাম। সেই একই গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি। কিন্তু সেদিনের সহযাত্রীরা আজ কোথায়?*

নেই, তাদের কেউ নেই আজ আমার কাছে। আজ যারা সঙ্গে রয়েছে, তারাও যাবে হারিয়ে। এই লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর প্রত্যেকেই যাবে চলে। আমিও থাকব না চিরকাল।

কিন্তু গঙ্গা থাকবে। সেদিনও সে এমনি করেই গোমুখীর বাণী বহন করে আনবে গঙ্গাসাগরে। অনন্তকাল ধরেই সে চলবে বয়ে—জন্মের গোমুখী থেকে মৃত্যুর মহাসাগরে, জীবন থেকে মহাজীবনে।

'গঙ্গা মাঈকি···জয়।' একবার দুবার তিনবার। বার বার উচ্চারিত হচ্ছে মাতৃবন্দনা। সবার সব ভাবনার শেষ হল, সব কথা গেল হারিয়ে।

কেউ শঙ্খধ্বনি করছেন, কেউ উলুধ্বনি দিচ্ছেন আর কেউ বা গঙ্গার গানে ভরে তুলছেন চারিদিক। খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্তন করতে করতে একদল পুণ্যার্থী স্নান করতে আসছেন। আর মাঝে মাঝে সব শব্দকে ছাপিয়ে জেগে উঠছে মাইকের শব্দ—মেলা-কর্তৃপক্ষ স্নানার্থীদের নানা উপদেশ দিচ্ছেন। সম্ভাব্য দুর্ঘটনার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য এই সব ঘোষণা।

আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। আমার যে আলাদা সত্তা বলে কিছু আছে, তা বিস্মৃত হয়েছি। সমস্ত হৃদয় ও মন দিয়ে অনুভব করছি, আমিও এই সংখ্যাতীত স্নানার্থীদের একজন মাত্র। এছাড়া আমার আর অন্য কোন পরিচয় নেই। আমার শিক্ষা সংস্কার ও ধর্ম সব মিথ্যে, সত্য শুধু এই পুণ্যস্নান আর এই পুণ্যময় স্থান। আমি বহুর মাঝে বিলীন হয়ে গিয়েছি।

দি'মা ও শ্যামা স্নান সেরে উঠে এলো। শীতে ঠক্‌ঠক করে কাঁপছে।

---

*লেখকের 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা' দ্রষ্টব্য।

ওরা এসে একেবারে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। আর দাঁড়াবেই বা কোথায়? কোথাও জায়গা নেই, সব ভরে গেছে।

ওরা গা মোছে, কাপড় ছাড়ে, বেশ পরিবর্তন করে। আমি অন্যদিকে তাকাই। কিন্তু চারিদিকেই যে মেয়েরা। শত-সহস্র শ্যামা সাগরে স্নান করছে আজ।

আচ্ছা বিবসনা নারীদেহের দিকে দৃষ্টি দেওয়া কি পাপ? কিন্তু পাপ তো চোখে থাকে না, পাপ থাকে মনে—মানুষের মনে। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাময়ীকে মা মনে করতেন। এই মাতৃভাবই তাঁকে মোহমুক্ত করে পরমপুরুষে পরিণত করেছিল। সেই মন নিয়ে আজ এই সাগরতীরে দাঁড়ালে অনাবৃত নারীদেহকে পরমাপ্রকৃতি বলেই মনে হবে, যাঁর বিগলিত করুণাধারায় অবগাহন করে এই লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন আজ ধন্য হল, তিনিও তো নারী—জননী জাহ্নবী।

"এবারে যাও, তুমি স্নান করে এসো।"

শ্যামার কথায় আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে। বলি, "এই যাচ্ছি।"

"হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি যা বাবা। সময় বয়ে যাচ্ছে।"

হেসে দি'মাকে বলি, "আমার সময় বয়ে যাবে বলে তুমি বুঝি তাড়াহুড়ো করে কোনরকমে ডুব দিয়ে এসেছ?"

"না, না, তা করব কেন? আমি সূর্যস্তব ও গঙ্গাস্তব করে বেশ ভালভাবে স্নান করে এসেছি।"

হয়তো কথাটা মিথ্যে নয়, তিনি সবই করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে যে আমার চিন্তা করেছেন তাও সত্যি। কিন্তু সে প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে সোয়েটার ও জামা খুলে গামছা কাঁধে নিয়ে সাগরের দিকে এগিয়ে চলি।

"বেশি দূরে যেও না যেন, ভয়ানক ঢেউ।" শ্যামা সাবধান করে। আমার জন্য তার চিন্তাও কিছু কম নয়।

জলে পা দিতেই সারা শরীর শিউরে ওঠে। ভীষণ ঠাণ্ডা। গোমুখীর জলও ঠাণ্ডা। অনেক বেশি ঠাণ্ডা। হবেই তো, সে যে তুষারবিগলিত ধারা।

গঙ্গাসাগরের জল গোমুখীর জলের মতো ঠাণ্ডা নয়। কিন্তু আশ্চর্য, এ বছর মহালয়ার দিনে সেখানে স্নান করতে আমার যে অনুভূতি হয়েছিল, আজ এখানেও সেই একই অনুভূতি হচ্ছে। শরীরের যে অংশটা জলে ডুবছে, সেটি ঠিক তেমনি অবশ হয়ে পড়ছে। তবু সেদিন যে অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব

করেছিলাম, আজও তাই করছি। সেদিনের মতই আজ শান্তিবারি সিঞ্চন করছি সারাদেহে।*

সূর্যোদয় সমাগত। পূবদিকে মুখ করে দাঁড়াই। বন্দনা করি—

'ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥'

সাগরে সূর্যোদয় হচ্ছে—গঙ্গাসাগরে, যেখানে আমার দেশের মাটি হয়েছে শেষ। মা বসুন্ধরার শিয়রে দিবাকর উঠছে জেগে। তার সোনালী আলোর পরশ লেগেছে সাগরে আর আকাশে, কুয়াশা-ছাওয়া দিগন্তের বুকে।

অতল সমুদ্রের অন্তরলোক হতে একখানি সোনালী গোলক একটু একটু করে উঠে আসছে ওপরে। জয়ধ্বনি শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি সব গেছে থেমে। আশ্চর্য একটা নীরবতা এসেছে নেমে। লক্ষ লক্ষ মানুষ স্তব্ধবিস্ময়ে রয়েছে তাকিয়ে। সবাই সূর্যোদয় দেখছে—সাগরের সূর্যোদয়।

কিন্তু কেউ তো বলে নি এমন শব্দহীন হয়ে অপলক নয়নে ঐ সূর্যোদয় দেখতে! তাহলে কি সবার কথা নিজের থেকেই গেছে হারিয়ে?

তাই হবে। মকর সংক্রান্তির পুণ্য-প্রভাতে গঙ্গাসাগরে সূর্যোদয় দেখছি আমরা। এমন সৌভাগ্য হয় না সবার জীবনে। জীবনের জন্যই জীবনের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

সোনালী গোলকের সবখানি উঠে এলো ওপরে—জলের ওপরে। সোনার ছোঁয়া লাগল সাগরের বুকে। আকাশের এক কোণে কয়েক টুকরো মেঘ ছিল জমে। কে যেন তাদের মুখে আবীর দিল মেখে। আবীরে রাঙা হয়ে উঠল কপিলমুনি মন্দিরের শ্বেত-শীর্ষ।

জীবনের স্পন্দন আবার মূর্ত হয়ে ওঠে মর্ত্যের মানুষের মাঝে। মুহূর্তে বিস্ময়ের ঘোর যায় কেটে। যাত্রীদল ফিরে আসেন বাস্তব জগতে। তাঁরা সমবেত স্বরে ভগবতী গঙ্গার জয়গানে মুখরিত করে তোলেন চারিদিক—'গঙ্গা মাইকি···জয়।'

জেগে ওঠে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি, স্তোত্র আর মন্ত্রপাঠ—

'গঙ্গায়াস্তত্র রাজেন্দ্র সাগরস্য চ সঙ্গমে।
অশ্বমেধং দশগুণং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

---

* লেখকের 'চতুরঙ্গীর অঙ্গনে' দ্রষ্টব্য।

গঙ্গায়াস্ত্বপরং পারং প্রাপ্য যঃ স্নাতি মানবঃ।
ত্রিরাত্রমুষিতো রাজন্ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥'

পুণ্যস্নান। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সঙ্গে আমার জীবনও ধন্য হল।

স্নানশেষে প্রায় প্রত্যেকেই প্রার্থনা করছেন। দেবী সুরেশ্বরীর কাছে কেউ অর্থ, কেউ যশ, কেউ শান্তি কামনা করছেন। আমি কি প্রার্থনা করব?

আমি তো অর্থ কিম্বা যশের প্রত্যাশী হয়ে আসি নি এখানে? তাহলে আমার কি কোন কামনা নেই?

আছে। আমি ত্রিভুবনতারিণী গঙ্গার কাছে কায়মনোবাক্যে কামনা করি—মাগো, তোমার বুকে শুয়ে যেন আমি শেষ নিশ্বাস নিতে পারি আর তোমার তীরেই যেন আমার এই দেহটা একদিন পঞ্চভূতে মিশে যায়।

প্রণাম করে উঠে আসি তীরে। দি'মা ও শ্যামার কাছে আসি ফিরে।

দি'মা দেখছি ইতিমধ্যে পুরোহিত ঠিক করে ফেলেছেন। শ্যামা কাজে বসে গেছে। কি আশ্চর্য মানুষের জীবন। পরশু সকালেও যে মানুষটা ছিলেন আমাদের মধ্যে, আজ তাঁর শেষ কাজ সম্পন্ন হচ্ছে।

গঙ্গাসাগরে শ্রাদ্ধ করলে মৃতের অক্ষয় স্বর্গবাস। তাই বহু যাত্রী পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধ করতে বসে গেছেন এখানে। অনেকেরই ভিজে কাপড়। তাই নাকি নিয়ম। কিন্তু নিয়মরক্ষা করতে গিয়ে তাঁরা শীতে ঠকঠক করে কাঁপছেন। কাঁপতে কাঁপতেই মন্ত্রপাঠ করতে হচ্ছে তাঁদের।

শ্যামা কিন্তু জামা-কাপড় পালটে নিয়ে কাজে বসেছে। ভালই করেছে। নিয়মরক্ষার জন্য আসল কাজে ফাঁকি দেওয়া উচিত নয়।

যার যেমন সাধ্য, তেমনি ভাবেই কাজ করছেন। সব রকমের আয়োজনই রয়েছে এখানে। বৃষোৎসর্গ করতে চাইলেও অসুবিধে নেই কোন। কপালে পিটালির তিলক, গলায় জবাফুলের মালা আর গায়ে রঙীন কাপড় জড়িয়ে কয়েকটি গরু ঘুরে বেড়াচ্ছে। শ্রাদ্ধকালে পুরোহিতের নির্দেশে উত্তরপুরুষকে তাদের একটির পুচ্ছ ধারণ করতে হচ্ছে। তিনি বৈতরণী পার হচ্ছেন। বিনিময়ে গরুর রক্ষককে তাঁর কিছু দক্ষিণা দিতে হচ্ছে।

গো-রক্ষক কিন্তু গরুর মালিক নয়। পাশের গ্রাম থেকে গরু ভাড়া করে নিয়ে এসেছে। ওরা আরা কিংবা মুঙ্গের জেলার লোক। প্রতিবারই মেলায় আসে। ব্যবসা করতে নয়, মেলা দেখতে। ব্যবসাটা ফাউ, আসল হচ্ছে স্নান—সাগরস্নান।

দি'মা শ্যামার কাজের তদারকি করছেন। এখানে আমার কোন দরকার নেই। এই অবসরে চারদিকটা একটু ঘুরে দেখা যাক।

এখনও স্নান করছেন অনেকে। সারাদিন ধরেই স্নান চলবে। ঢেউবিক্ষুব্ধ হিমশীতল কর্দমাক্ত সাগরজলে দাঁড়িয়ে পুণ্যার্থীরা উৎফুল্ল চিত্তে গঙ্গা, সগর, ভগীরথ ও কপিলমুনির উদ্দেশে তাঁদের অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করছেন। কেউ নারকেল, কেউ ফুল-বেলপাতা, আর কেউ বা পঞ্চরত্ন দিয়ে এই অর্ঘ্য দিচ্ছেন। নামেই রত্ন, আসলে নারকেল সুপারি তামা পাথর ও কয়েকটি কড়ি। সর্বমোট মূল্য বড়জোর গোটা-দুয়েক টাকা। একটুকরো কাপড়ে বেঁধে সাগরে নিক্ষেপ করছেন। এ ছাড়া প্রায় প্রত্যেকেই দু-চারটি করে পয়সাও সাগরে ছুঁড়ে দিচ্ছেন। পঞ্চরত্নের কোন পার্থিব মূল্য নেই, কিন্তু এই পয়সা কটি অমূল্য। আলতাব ও তার প্রতিবেশীরা, অর্থাৎ পুণ্যতীর্থ গঙ্গাসাগরের আপনজনেরা এই পয়সা কুড়িয়ে জীবনধারণ করে।

তীর্থের নিয়মানুসারে এখানে তিনদিন থাকতে হয়। প্রথম দিন প্রত্যুষে সাগরস্নানের পুণ্যার্থীরা তীরে উঠে দাড়ি কামান কিংবা মাথা মুড়ান। পিতৃ-মাতৃহীন পুণ্যার্থীরা পূর্বপুরুষদের আত্মার কল্যাণকামনায় শ্রাদ্ধ করেন। তারপরে সবাই সাগরের কাছে জীবনের সকল কামনা ও বাসনা নিবেদন করে মন্দিরে যান—পুজো দেন। এইভাবে তিনদিন স্নান ও পুজোর পরে পুণ্যার্থীরা ঘরে ফিরে যান। সাগরমেলা মিলিয়ে যায়।

সুদূর অতীত থেকেই চলে আসছে এই নিয়ম। কিন্তু দূর অতীতের কথা থাক্, নিকট-অতীতের কথাই ভাবা যাক্। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল পর্যন্ত আত্মহত্যা ও সন্তানবিসর্জনের স্থান নির্দিষ্ট ছিল গঙ্গাসাগর। সেকালে মানুষ যেমন কেদারনাথ মন্দিরের মাইল চারেক দূরে অবস্থিত ভৈরোঁঝাপ থেকে লাফিয়ে পড়ে মহাপ্রস্থানে যেতেন অথবা পতির চিতায় সহমরণ বরণ করে সতী অক্ষয় স্বর্গলাভ করতেন, তেমনি পুণ্যলোভেই পুণ্যার্থীরা গঙ্গায় আত্মহত্যা করতেন কিংবা শিশুসন্তানকে বিসর্জন দিতেন। 'কথা ও কাহিনী'র 'বিসর্জন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই কুসংস্কারের একটি জীবন্ত চিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন।

বড়ু চণ্ডীদাস থেকে শুরু করে মধ্যযুগের বিভিন্ন বাঙালী কবিরা কিন্তু তাঁদের রচনায় গঙ্গাসাগরে প্রাণবিসর্জনের মাহাত্ম্যই বর্ণনা করেছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' আছে—

'সাগরসঙ্গম গিয়া গায়ের মাস কাটিয়া
আপনা মগর ভোজ দিয়া।
সাগরসঙ্গমজলে ত্যজিব মো কলেবরে'

কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' আছে—

'খণ্ডিয়া বিধির যাম্য সাগরে করিব কাম্য
পূজা করি সঙ্কেতমাধব।
ভুঞ্জিয়া সংসারসুখ দেখিব বাপের মুখ
পুনরপি হইয়া মানব॥'

ধর্মের নামে জগতে যেমন সব চেয়ে বড় অধর্ম সংঘটিত হয়েছে, তেমনি পুণ্যের নামে অনুষ্ঠিত হয়েছে নিকৃষ্টতম পাপ। একটি নিরপরাধ নারীকে সহমরণের নামে কেমন করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়, তাই দেখার জন্য যেমন শত শত মানুষ সেকালে গঙ্গাতীরে সমবেত হত, তেমনি সহস্র সহস্র পুণ্যার্থী এই গঙ্গাসাগরে কিংবা বাঁশবেড়িয়া বা চাকদার কাছে যশড়া* গ্রামের গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে বিমুগ্ধ নয়নে দর্শন করত—কেমন করে একজন অশক্ত বৃদ্ধকে কিংবা একটি অবুঝ শিশুকে কুমীর ও হাঙ্গরের সামনে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। তারা দেখত, নরখাদকরা কি রকম কাড়াকাড়ি করে সেই দেহটাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে আর ঘোলাজল মানুষের রক্তে লাল হয়ে উঠছে।

একসময় এই লাল জল আবার ঘোলা হত। একটি মানুষের রক্ত এই অসীম জলধিকে কতক্ষণ রাঙিয়ে রাখতে পারে! কুমীর আর হাঙ্গরদের দাপাদাপিও বন্ধ হত। নয়নমনতৃপ্ত দর্শনার্থীরা বৃদ্ধের আত্মীয়দের কিংবা শিশুর পিতামাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মেলায় মিশে যেত।

আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মানুষের মতো মায়াময় জীব যেমন জগতে

* "Chakdah, as well as Bansberia and Ganga Sagar, was once notorious for human sacrifices by drowning. In Hamilton's 'Descriptions of Hindostan', London 1820, it is stated that this town was formerly noted for voluntary drownings by the Hindoos···" —Census 1951—W. B. District Handbook, Nadia.

জন্মায় নি, তেমনি মানুষের চেয়ে হিংস্রতর প্রাণীও আর নেই পৃথিবীতে। গৌতম বুদ্ধ যেমন সত্যি, তেমনি মহম্মদী বেগও মিথ্যে নয়।

তাই আজ বার বার মার্কুইস ওয়েলেসলীর কথা মনে পড়ছে। তিনি যখন শুনলেন যে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র এক মাসে তেইশটি প্রাণ এখানে ধর্মের বলি হয়েছে, তখন তিনি আইন করে এই ভয়াবহ প্রথা রহিত করে দিয়েছিলেন।* সেদিনকার মানুষ কিন্তু আইনের সেই নির্দেশ মেনে নিয়েছিলেন। কারণ তাঁরা আমাদের মতো আইন অমান্য করে আনন্দ পেতেন না।

ফিরে আসি দি'মার কাছে। শ্যামা এখনও মন্ত্রপাঠ করছে। দি'মা কিন্তু আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন, "কোথায় গিয়েছিলি?"

ভয়ে ভয়ে জবাব দিই, "কোথাও না, এই একটু ঘুরে এলাম।"

"তুই ঘুরে বেড়াচ্ছিস, আর এদিকে যে সর্বনাশ হয়ে বসে আছে!"

"কি হল আবার?"

"তাড়াতাড়িতে মুড়ির টিনটা ফেলে এসেছি।"

যাক্, তেমন কিছু নয় তাহলে! আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। হেসে দি'মাকে জিজ্ঞেস করি, "কোথায়?"

"কোথায় আবার, ঘরে!"

চুপ করে থাকাই ভাল। কথা বলতে গেলে হেসে ফেলব, তাতে শ্যামার অসুবিধে হবে।

কিন্তু আমি চুপ করে থাকলে কি হবে, কার সাধ্যি দি'মাকে থামায়? তিনি আবার বলেন, "কেবল মুড়ি, ঐ টিনে যে বড়ির কৌটোটাও রয়েছে!"

হায় মা-গঙ্গা, এ তুমি কি করলে? একে মুড়ি তার ওপরে বড়ি! হেসে বলি, "তাতে হয়েছে কি?"

আগুনে ঘি পড়ল। দি'মা জ্বলে উঠলেন, "কি হয় নি?"

পুরোহিত আমাদের দিকে তাকান। তাঁকে ইশারায় মন্ত্রপাঠ করতে বলি।

দি'মা বলে চলেন, "খোলা ঘরে টিনটা রইল পড়ে, আর তুই বলছিস কি

* Census 1951—West Bengal District Handbook, 24-Parganas by Shri A. Mitra. I. C. S.

হয়েছে ? ফিরে গিয়ে কি সে টিন আর দেখতে পাব ?"

"খুব সম্ভব পাবে না।" গম্ভীর স্বরে জবাব দিই।

"তাহলে ?"

"তাহলেও জিজ্ঞেস করব, আজ এখানে এসে যা লাভ করলে, তার কাছে সে ক্ষতি কতটুকু ?"

দি'মা নিরুত্তর। আমি আবার বলি, "দি'মা, আজ মকর সংক্রান্তি, আর এ হচ্ছে শ্রীধাম গঙ্গাসাগর। আজ এখানে দাঁড়িয়ে মুড়ি আর বড়ির শোকে সময় নষ্ট না করে মা-গঙ্গার কাছে ভক্তি কামনা কর।"

কাজ হয়। দি'মা যেন মুহূর্তে বদলে যান। গদগদ কণ্ঠে বলেন, "তাই তো চাইছি বাবা, কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব, পার্থিব বস্তুকে ভুলতে পারছি না যে !"

"ভুলতে হবে দি'মা।"

দি'মা গিয়ে শ্যামার পাশে বসেন। শ্যামা একমনে মন্ত্রপাঠ করছে।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। মমে মনে মা-গঙ্গাকে প্রণাম করি। দি'মা অন্তত কিছুক্ষণ মুড়ির টিনের শোক ভুলে থাকবেন।

কাজ শেষ হয়। শ্যামা উঠে দাঁড়ায়। পুরোহিত দক্ষিণা নিয়ে চলে যান। আমরা মালপত্র কাঁধে নিয়ে মন্দিরে রওনা হই।

কাতারে কাতারে মানুষ চলেছে মন্দিরে—সমস্ত মেলাটাই মন্দিরমুখী। আমরা সেই মহামেলার অংশমাত্র। সবাই চলেছে বলে আমরাও চলেছি। আমাদের আলাদা কোন গতি নেই। হয়তো বা সত্তাও নেই। আমরা এই মহামেলার মন্দিরমুখী মহামিছিলের মাঝে মিশে গিয়েছি।

সুযোগ পেয়ে শ্যামা কানের কাছে মুখ এনে বলে, "ধন্যি তোমার বুদ্ধি !"

"কেন বলুন তো ?"

"বুড়ী মুড়ির শোকে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, ঘরে গিয়ে মুড়ির টিন নিয়ে তবে মন্দিরে আসবেন।"

"সেই আশঙ্কা করেই তো আমি তাঁকে ভক্তি কামনা করতে বললাম। মুড়ির টিনের জন্য মনে যত দুঃখই থাক্‌, মুখে আর শোকপ্রকাশ করবেন না।"

শ্যামা কিছু বলতে পারার আগেই কানে আসে, "ওরে ও খোকা, ও শ্যামা ! একটু আস্তে আস্তে চল্‌, আমি যে হারিয়ে যাব।"

আমরা হেসে চলা বন্ধ করি।

দি'মা কাছে আসেন। এসেই আমার চাদরের আঁচল ধরে বলেন, "আর

আমি তোকে ছাড়ছি নে বাবা।"

"কে তোমাকে ছাড়তে বলছে?" আমি ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করি। শ্যামা আমার সামনে চলেছে।

উঠে আসি মূল-পথে। এ পথেও মাঝে মাঝে কাদা। এখানে পথও যা, ঘরও তা। সবই সাগর সৈকত। যেখানে এঁটেল মাটি সেখানে মানুষের পায়ে পায়ে কাদা হয়েছে, যেখানে বেলেমাটি সেখানটা শুকনো রয়েছে।

মহালগ্ন সমাগত। যে মুহূর্তটির জন্য এই সংখ্যাতীত সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকের দল দূর-দূরান্তর থেকে এখানে ছুটে এসেছে এই সেই শুভ মুহূর্ত। যে দিনটির জন্য এই বিজন প্রান্তরে হাজার হাজার দোকান বসেছে আজ সেই দিন। যে পরম লগ্নের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ গঙ্গাসাগরে এসেছে, সেই মহালগ্ন সমাগত। সবাই সঙ্গমে স্নান সেরে কপিলমুনির মন্দির দর্শন করতে চলেছেন।

কিন্তু এই স্নানের সার্থকতা কি? এই দর্শনের কোন উপকারিতা আছে কি? আছে, নিশ্চয়ই আছে। নইলে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই দুঃসহ শীতকে উপেক্ষা করে তুষারশীতল সাগরজলে স্নান করবে কেন? মাথায় বোঝা নিয়ে এই ভিড় ঠেলে মন্দিরে চলেছে কেন?

শিশু থেকে বৃদ্ধ, রোগী থেকে ভোগী, যোগী থেকে সংসারী— সবাই যে অম্লান বদনে চলেছে এগিয়ে! কাউকে দেখেই তো মনে হয় না যে কোন কষ্ট হচ্ছে! কোথা থেকে তারা পেল এই প্রচণ্ড প্রাণশক্তি? এ কি কেবলই পরমার্থকে পাবার প্রত্যাশায়? হয়তো তাই, কারণ এই প্রত্যাশাই মানুষকে ভগবানের কাছে নিয়ে যায়। মানুষ যেমন মিথ্যে নয়, তেমনি মিথ্যে নয় মানুষের ভগবান।

মানুষ আর মানুষ—সামনে পেছনে বাঁয়ে ডাইনে কেবল মানুষ। সেই অগণিত মানুষের সঙ্গে তাল রেখে ধীরে ধীরে চলেছি এগিয়ে। পায়ে পায়ে এগোতে হচ্ছে।

নানা কথা কানে ভেসে আসছে। কেউ বলছে, 'মা একটি পয়সা, বাবু একটি পয়সা!'

'হে মা-গঙ্গা, আমার বাতটা কমিয়ে দাও!'

'বাবা কপিলমুনি, অনেক কষ্ট করে এসেছি। তুমি আমার ছেলেটাকে ফিরিয়ে দাও বাবা!'

দাও দাও আর দাও! তাহলে সবাই কি কিছু না কিছু চাইতে এসেছে,

কিছু নিতে এসেছে, পেতে এসেছে? ভগবানের কাছেও মানুষ তাহলে নিঃস্বার্থ ভাবে আসে না?

কিন্তু আমি তো কিছু চাইতে আসি নি। তাহলে আমি এত পেলাম কেন? আমি পেয়েছি ভুজাওয়ালা ফুলওয়ালা ও আলতাবকে, পেয়েছি দি'মা আর শ্যামাকে, পেয়েছি আমার চারিপাশের এই অগণিত মানুষকে।

"বড্ড আস্তে হাঁটছ গোসাঁই, জোরে পা চালাও।" শ্যামা তাগিদ দেয়।

হেসে বলি, "পা ফেলার জায়গা পাচ্ছি নে, জোরে হাঁটব কেমন করে?"

"এরই মধ্যে দেখে-শুনে আরেকটু জোরে হাঁটা যায় বৈকি।"

বাধ্য হয়ে দি'মাকে বলি, "একটু তাড়াতাড়ি চল।"

"তাড়াতাড়ি!" দি'মা যেন আঁতকে ওঠেন। বলেন, "এখেনে এসেও তাড়াতাড়ি? 'সব তীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর একবার।' না বাবা, তুই তাড়াতাড়ি করতে বলিস নে। তীর্থে এসে তাড়াতাড়ি করতে নেই।"

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি। বলি, "ডালা কিনবে না?"

"কিনব বৈকি।" দি'মা বলেন।

"তাহলে চল ঐ পাশের দোকানে।"

"চল।"

দুহাতে দি'মা ও শ্যামাকে ধরে অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলে দোকানের কাছে আসি। এখান থেকে মন্দির পর্যন্ত পথের দুদিকে ডালা ও মালার দোকান। প্রত্যেকটি দোকানের সামনে প্রচণ্ড ভিড়। যারা কিনছে তাদের চোখে ভক্তির ভাষা, আর যারা বেচছে তাদের চোখে তস্করের দৃষ্টি। এক টাকার ডালা মানে ছোট একখানি মাটির সরায় কয়েকটি ফুল, একটু সিঁদুর আর খানপাঁচেক বাতাসা। ভিড় ঠেলে অতিকষ্টে তারই তিনখানি কিনে আনল শ্যামা। আর সে আসা মাত্র দি'মা বলে উঠলেন, "সে কি! মালা আনিস নি?"

শ্যামা আঁচলে মুখ মুছে জবাব দেয়, "না। ঐ একরত্তি গাঁদাফুলের মালা চাইছে দু'টাকা।"

"তাই বলে তুই মালা আনবি নে? এত পয়সা খরচ করে এখানে এলাম, আর দুটো টাকার জন্য বাবা কপিলমুনিকে একটা মালা দেব না?"

শ্যামা অপ্রস্তুত। তার ভুল হয়ে গেছে। পয়সার মায়ায় সাগরমেলার মালা না কেনা নিঃসন্দেহে অপরাধ। অথচ সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করা

সহজসাধ্য নয়। শ্যামার পক্ষে আবার এই প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে মালা কিনে আনা রীতিমত কষ্টকর। আমার পিঠে ব্যাগ ও বিছানা। নামিয়ে রাখার জায়গা নেই কোথাও। চারিদিকে কেবল মানুষ। আর দি'মার দোকানে যাবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও শ্যামাকেই মালার জন্য যেতে হয়। দি'মা আমাকে ধরে কোনমতে দাঁড়িয়ে থাকেন পথের পাশে।

মেলার মাইকে ক্রমাগত হারিয়ে যাওয়া যাত্রীদের নাম ঘোষণা হচ্ছে। অসংখ্য নাম—ঘোষক যেন মুখস্থ বলে যাচ্ছেন। প্রতি মিনিটে বোধ করি একাধিক যাত্রী হারাচ্ছেন। যাঁরা হারিয়েছেন এবং যিনি হারিয়েছেন, সবাইকেই 'ইনফরমেশান টাওয়ার'-য়ের নিচে চলে যেতে বলা হচ্ছে।

টাওয়ারটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি একটি মঞ্চ—মাটি থেকে অনেকটা ওপরে। পেছনে একটা বড় মই। নিচে ও চারিপাশে সামান্য জায়গা। কিন্তু যে সংখ্যায় যাত্রীরা হারাচ্ছেন, তাতে তাঁরা এবং তাঁদের সঙ্গীরা সবাই ওখানে গিয়ে হাজির হলে, আবার যে নতুন করে নিরুদ্দেশের ঘোষণা করতে হবে! হয়তো হচ্ছেও তাই।

কিন্তু আমি এ কথা ভাবছি কেন? আমার তো কেউ হারায় নি। দি'মা পাশেই রয়েছেন। আর ঐ তো শ্যামা মালার দোকানে।

টাওয়ার-য়ের পাশেই মন্দির—কপিলমুনির মন্দির। শ্বেতপাথরের সুরম্য অট্টালিকা নয়, টিন অ্যাজ্‌বেস্টস ও কাঠ দিয়ে তৈরি মাঝারি আকারের একখানি ঘর। মন্দিরচূড়ায় বাঁশের সঙ্গে একটি লাল পতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। পতাকার নিচে শিখর-কলস ও একটি চক্র। প্রথমটি পেতলের আর দ্বিতীয়টি টিনের। দুটিই খুব ছোট।

গম্বুজাকৃতি মন্দিরচূড়া। টিনের চাল ও এ্যালুমিনিয়মের গম্বুজ। পৌষালী প্রভাত-সূর্যের উজ্জ্বল কিরণে রূপোর মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। গম্বুজের সঙ্গে সামনের দিকে অ্যাজ্‌বেস্টস-য়ের বারান্দা। তার নিচেই মন্দিরের বৃহত্তর অংশ।

১৯১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে কলকাতার কোন এক এস. চক্রবর্তী এ্যাণ্ড কোম্পানী এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন। এমন শ্রীহীন মন্দির সচরাচর চোখে পড়ে না। আর তাই হয়তো নির্মাতারা নিজেদের নাম লিখে রেখেছেন। এর আগের মন্দির যেখানে ছিল এখন সেখানে

সাগর

অষ্টাদশ শতকে সাগরদ্বীপ প্রায় তিরিশ মাইল দীর্ঘ ছিল। এখন মাত্র মাইল বিশেক। তার মানে বিগত দু'শ' বছরে সাগরদ্বীপের এক-তৃতীয়াংশকে সাগর গ্রাস করেছে। এতেও কিন্তু সাগরের ক্ষুধা মেটে নি। প্রতি বছরই সে খানিকটা করে গ্রাস করছে। আজ যেখানে মেলা বসেছে, আগামী বছর হয়তো সেখানে আর মেলা বসতে পারবে না। কপিলমুনির মন্দিরকেও সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তৈরি করতে হবে নতুন মন্দির। অথচ এই বিজ্ঞানের যুগে এমনটি হওয়া উচিত নয়।

আপাতদৃষ্টিতে অর্থাভাবই সাগরদ্বীপের দুর্দশার কারণ। অথচ এই মেলা থেকে মন্দিরের যা আয় হয়, তার কিয়দংশকে এই দ্বীপের উন্নয়নে ব্যয় করলেও সাগরদ্বীপের এমন দুরবস্থা হত না। কিন্তু মন্দিরের টাকা সবই বস্তা বোঝাই হয়ে অযোধ্যার শ্রীসীতারাম দাসজী মহারাজের গদিতে চলে যায়। অযোধ্যার সেই 'পঞ্চায়তী আখড়া হনুমান গঢ়ী শ্রীরামা নন্দী নির্বাণী-সভা' পুরুষানুক্রমে এই মন্দিরের মালিক। কারণ রামায়ণের যুগে 'বঙ্গ' অযোধ্যা রাজমণ্ডলের একটি রাজ্য ছিল। বিচিত্র ব্যবস্থা। কিন্তু অন্য কোন ব্যবস্থা করার উপায় নেই। একে তো ধর্ম, তার ওপর বাংলার টাকা উত্তর প্রদেশে চলে যাচ্ছে। উত্তর প্রদেশ বংশপরম্পরায় 'ভারতভাগ্যবিধাতা'।

ভিড়ের জন্য মন্দিরের নিম্নাংশ দেখতে পাচ্ছি না। তবে তা যে উল্লেখযোগ্য কিছু নয় বেশ বোঝা যাচ্ছে। অথচ শুনেছি সেকালের কপিল-মুনির মন্দিরটি প্রাচীন স্থাপত্যকলার একটি আদর্শ নিদর্শন ছিল। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সে মন্দিরটি ছিল অক্ষত। 'Friend of India' গ্রন্থে সেই মন্দির ও গঙ্গাসাগর সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"...a mere sandbank, about a mile in length and about a quarter mile broad, of a crescent form with the wide sea opening in front and the back coverd by dense jungle. At one corner stands the solitary temple of the celebrated Sanyasi Cupil Mani...'

'The temple is the last remnant of what has evidently been a large monastic institution for devotees, the ruins of which may be walked over at low water. These ruins show

that the building must have been very extensive as well as a massy...Temple itself was built ;of Concha stone brought from Orissa but such is the encroachment at the sea that the last relic of this evidently once extensive building if not officially repaired will soon moulder away...' "

সাংবাদিকের সে আশঙ্কা সত্য হয়েছে। কারণ বিদেশী রাজা এদেশের সেই প্রাচীন মন্দিরটিকে রক্ষা করবার কোন চেষ্টাই করেন নি। দেশের রাজারাও চেষ্টা করেন নি গঙ্গানগরকে রক্ষা করতে। করলে আজ নতুন দ্বারকার মতো নতুন একটি গঙ্গানগর গড়ে উঠতে পারত এখানে। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা বহুকাল বিলীন হয়েছে আরব সাগরে। পরে তার কাছে গড়ে উঠেছে নতুন দ্বারকা—সে-ও সেকালের মতই একালের একটি সর্বভারতীয় তীর্থ। আর গঙ্গানগর ধ্বংস হয়ে গেছে চিরকালের মতো।

যাক গে সে কথা, গঙ্গাসাগরের কথাই ভাবা যাক,—উনবিংশ শতাব্দীর গঙ্গাসাগর। 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'-র সাংবাদিক লিখেছেন—সেই মন্দিরে কপিল-মুনি ও মহাদেবের দুটি প্রস্তর-মূর্তি এবং একটি শিলালিপি ছিল। তাঁর মতে শিলালিপিটি ৪৩০ থেকে ৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত।

শ্যামা মালা নিয়ে ফিরে আসে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হচ্ছে। ভিড়ের চাপে বেচারী আধমরা হয়ে এসেছে। একটু ম্লান হেসে সে মালাটি দি'মার হাতে দেয়।

"বাঃ, বেশ মালা! বেঁচে থাক্ মা।" দি'মা আশীর্বাদ করেন।

শ্যামার শ্রম সার্থক হয়।

হাত বাড়িয়ে দি'মা মালাটি আমার সামনে ধরে বলেন, "নে ধর।"

"আমি আবার কেন ধরব? ও তো তোমার।" প্রতিবাদ করি।

দি'মা হাসেন। বলে, "আমার তো শেষ হয়ে গেছে রে, তোর যে কেবল শুরু! তুই নে।"

আমার জন্য দি'মা জোর করে শ্যামাকে মালা আনতে পাঠিয়েছিলেন! কিন্তু আমি কপিলমুনিকে মালা দিলে, তাঁর কি লাভ? আমি তাঁর কে?

আজ বোধ হয় আমার চেয়ে বেশি তাঁর কেউ নয়। তাই আমার মঙ্গলের জন্য নিজের টাকায় মালা আনিয়েছেন তিনি। সত্যি মানুষ কতো মহৎ, স্নেহ কতো মধুর, জীবন কতো মনোহর!

অনেকটা এগিয়ে এসেছি আমরা। মন্দিরের নিম্নাংশ এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। খোলা মন্দির। সামনে দেওয়াল নেই। মেঝে প্রায় মানুষ-সমান উঁচু। সামনের দিকে ছয়টি কাঠের খুঁটি। টিনের পাত দিয়ে মুড়ে সাদা রঙ করে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত মেঝে জুড়ে ফুল বেলপাতা মালা ও নারকেলের স্তূপ। পুণ্যার্থীরা বহুদূর থেকেই তাঁদের ডালা ও মালা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন। কি করবেন, ভিড়ের জন্য কাছে এগোতে পারছেন না।

মন্দিরের দূরত্ব খুব বেশি হলে শ'খানেক গজ। কিন্তু মাটি মেপে কি সব সময় দূরত্বের পরিমাপ করা যায়? মন্দির এখনও বহুদূরে। হাজার হাজার লোক রয়েছে আমার সামনে। তাদের দর্শন হলে আমি দর্শন করতে পারব।

তিন দিক থেকে তিনটি পথ এসে মিলেছে মন্দিরের সামনে। কিন্তু সামনের চত্বরটুকুর সাধ্য নেই ঐ বিরাট জনতাকে আশ্রয় দেয়। তাই তার ঢেউ এসে আঘাত করছে এখানে। এতক্ষণ তবু যা হোক্ মন্থর গতিতে পথের ভিড় সামনের দিকে এগোচ্ছিল, এবারে তাও বন্ধ হয়ে গেল। ফলে আমরা আর সামনে এগোতে পারছি না। বরং মাঝে মাঝে সামনের চাপে পেছনে হটতে চাইছি, কিন্তু পারছি না। পেছনেও অসহ্য চাপ। দুপাশের চাপও কিছু কম নয়। বেশিক্ষণ এভাবে চললে অজ্ঞান হয়ে যাবো যে!

পথের দুদিকে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য শালবল্লীর বেড়া। বেড়ার ওপাশে সারি বেঁধে স্বেচ্ছাসেবকরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশন, মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি, সেন্ট জন্‌স্ এম্বুলেন্স, সুন্দরবন জনকল্যাণ সঙ্ঘ, বজরঙ্গ পরিষদ, কলকাতা যুবক সঙ্ঘ, পশ্চিমবঙ্গ রেডক্রস, আর. ডাবলু এ. সি., কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতি ও শ্রীহনুমান সমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন বে-সরকারী সেবা-প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবকরা দিবারাত্রি যাত্রীদের সেবা করছেন। স্টীমার ও লঞ্চের যাত্রী আনা থেকে ভিড়-নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত সবই করছেন তাঁরা। তাঁদের সাহায্য ছাড়া এই মেলা পরিচালনা অসম্ভব। কিন্তু যাত্রীদের নিরাপত্তার চেয়ে বেড়ার নিরাপত্তার দিকে তাঁদের যেন নজর বেশি।

'হট্ যাও, হট্ যাও, যোগীরাজ আতী হ্যায়। হট্ যাও, জল্‌দি হট্ যাও।'

কারা যেন চীৎকার করছে। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পারার আগেই আচম্‌কা একটা ধাক্কায় দি'মাকে নিয়ে বেড়ার ওপরে পড়ে গেলাম। আর

শ্যামা পড়ল আমার ওপরে।

এভাবে থাকলে ভিড়ের চাপে পিষ্ট হয়ে যাব। অনেক কষ্টে ওদের নিয়ে উঠে দাঁড়াই। বেড়ার ফাঁক দিয়ে গলে পথের বাইরে স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য নির্দিষ্ট অংশে চলে আসি। অবস্থা বিবেচনা করে ওঁরা আর বাধা দেন না। বরং একজন আমাকে পিঠের বোঝা নামাতে সাহায্য করেন। দি'মা আর শ্যামাও নিজেদের মাল নামায়। বোধ হয় বেঁচে গেলাম এযাত্রায়।

দোকানঘরের পেছনে পথ। ঘর ও বেড়ার মাঝে দু-তিন হাত ফাঁকা জায়গা—স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য নির্দিষ্ট। মা-গঙ্গার কৃপায় সেখানে দাঁড়াবার ঠাঁই পেয়েছি আমরা। এ পাওয়া প্রাণ ফিরে পাওয়ার সামিল।

'হট্ যাও, হট্ যাও…'

আবার সেই চীৎকার।

'যোগীরাজ আ গয়ি। হট্ যাও…'

তাড়াতাড়ি পথের দিকে তাকাই। হ্যাঁ। ঐ তো আসছেন। মনুষ্যবাহিত চতুর্দোলায় বসে আছেন ভস্মবিভূষিত জটাজুটধারী জনৈক দিগম্বর সন্ন্যাসী। মাথায় মুকুট, গলায় মুক্তো বসানো হার। বাহুতে বাজু ও তাগা, কব্জিতে বালা আর পায়ে মল। সবই সোনার। ভদ্রলোক এত মূল্যবান অলঙ্কারই যখন পরতে পেরেছেন, তখন একটুকরো কাপড় কোমরে জড়িয়ে রাখলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত?

কিন্তু থাক্ গে সেকথা, তার চেয়ে যোগীরাজকে আর একবার দেখা যাক। উজ্জ্বল রক্তিম দুটি চোখ—পলকহীন উদাস দৃষ্টি মেলে রয়েছেন। গায়ের রঙ কাঁচা হলুদের মত। মাথায় হিরণ্যবর্ণ জটাভার। মুখে সাদা সাদা দাড়িগোঁফ। স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ। শান্ত সমাহিত জ্যোতির্ময় মূর্তি।

চতুর্দোলার বাহক ও সহযাত্রী শিষ্যগণ সোচ্চার কণ্ঠে বলে উঠলেন, "যোগীরাজকি…

'জয়।' উপস্থিত, পুণ্যার্থীরা পরমানন্দে সাড়া দিলেন।

গঙ্গার জয়গান, কপিলমুনির প্রশস্তি ও গঙ্গাসাগরের যশোগাথা হারিয়ে গেল যোগীরাজের জয়ধ্বনিতে।

জনৈক যাত্রী যোগীরাজের প্রতি আপন ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের নিমিত্ত সহসা গলাফাটা চীৎকার করে উঠলেন—'যোগীরাজ কি…জয়।'

আমার হাসি পাচ্ছে। কিন্তু হাসতে পারছি না। হাসলে নাস্তিক

বলে নির্দিষ্ট হব।

কিন্তু শ্যামা হাসছে। তার নাস্তিকতার ভয় নেই। সে বৈষ্ণবী।

দি'মা কপালে হাত ঠেকালেন।

আচ্ছা এই যোগীরাজ কে? কাকে জিজ্ঞেস করব? যাঁরা তাঁর জয়ধ্বনি দিচ্ছেন, পাগলের মত চতুর্দোলার পেছনে ছুটছেন, পথের ধুলো গায়ে মাখছেন, তাঁরা কেউ আমার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না। ওরা কেউ ভক্ত নয়, ওরা সবাই হুজুগপ্রিয়।

পথের যা অবস্থা তাতে আরও কিছুক্ষণ এখানে অপেক্ষা করা উচিত। বহুভাগ্যে জায়গাটুকু যখন পাওয়া গেছে, তখন ভিড়টা একটু কমুক। অন্তত যোগীরাজের দর্শন শেষ হোক্। এই অবসরে একটু মন্দির ও মেলার কথা ভেবে নিই।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এইচ. এইচ. উইলসন-য়ের 'Essays on Religion of Hindus' থেকে জানা যায়—তখন এখানে কোন স্থায়ী মন্দির ছিল না। 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'-র বর্ণিত সেই প্রাচীন মন্দিরটি সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হবার পরে প্রতি বছর মেলার আগে ফুট-চারেক উঁচু বালির বেদীর ওপরে মাটি বাঁশ ও খড় দিয়ে অস্থায়ী মন্দির নির্মাণ করা হত। তখনও এখানে ভিড় হত, তাই ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য মন্দিরের সামনে থাকত বাঁশের বেড়া।

উইলসন্ বলেছেন, মন্দিরচত্বরে নাকি একটি বটগাছ ছিল। আজকের শ্রীধাম গঙ্গাসাগরে দাঁড়িয়ে কথাটা একটু কেমন ঠেকছে। এই বালুকাবেলায় বটগাছ! কিন্তু সে মন্দির কোথায় নির্মিত হত আর তখন সেখানকার মাটি কেমন ছিল, কিছুই যে জানা নেই আমাদের!

যাই হোক, সেই বটবৃক্ষের পাদমূলে শ্রীরামচন্দ্র ও হনুমানজীর দুটি মূর্তি ছিল। পুণ্যার্থীরা কপিলমুনির কাছে আপন আপন প্রার্থনা জানিয়ে মন্দিরগাত্রে নিজেদের নাম লিখে দিতেন। তারপরে বটগাছের ডালে একটি ঢিল বেঁধে দিয়ে তীর্থদেবতার কাছে মনস্কামনা জানাতেন। কেউ স্বাস্থ্য, কেউ অর্থ আর কেউ বা সন্তান কামনা করতেন। মনোবাসনা পূর্ণ হলে অন্য কোন তীর্থদেবতার পূজা দেবার প্রতিশ্রুতি থাকত তাঁদের প্রার্থনায়। পথকষ্টের কথা ভেবেই বোধ করি তাঁরা আর এখানে আসার প্রতিশ্রুতি দিতেন না।

মন্দিরের পেছনে ছিল ছোট্ট একটি বাঁধানো জলাশয়। সীতাকুণ্ড।

পুরোহিতকে পয়সা দিলে পুণ্যার্থীরা তা থেকে একটুখানি জলপান করে পরম পুণ্যসঞ্চয় করতে পারতেন। ফলে প্রতিদিন সন্ধ্যের পর কুণ্ড জলশূন্য হয়ে যেত, কিন্তু পরদিন প্রত্যূষে পুণ্যার্থীরা সবিস্ময়ে দেখতেন, সীতাকুণ্ড পুণ্যবারিতে পুনরায় পরিপূর্ণ। তাঁরা পুণ্যতীর্থের অলৌকিক মাহাত্ম্যে মোহিত হতেন।

উইলসন্ কিন্তু লিখেছেন, 'This reservoir was probably filled from the tank, and kept full by the contrivances of mendicants, who persuaded the people that it was a perpetual miracle being constantly full for the use of the temple.'

"আমরা কি দর্শন করতে পারব না বাবা?"

দি'মার প্রশ্নে বাস্তবে ফিরে আসি। বটেই তো, এখানে দাঁড়িয়ে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করলে দর্শন হবে কেমন করে?

পথের দিকে তাকাই। যোগীরাজের আগমন উপলক্ষে যে অতিরিক্ত ঠেলাঠেলির ঢেউ এসেছিল সেটি চলে গেছে। কিন্তু ভিড় এখনও রয়েছে। থাকবেই তো। এ ভিড় থাকবে দুপুররাত অবধি। এরই মধ্যে দর্শন করতে হবে। কিন্তু মালপত্রের বোঝা বয়ে কেমন করে এই ভিড়ে মন্দিরে যাব?

সব শুনে একজন স্বেচ্ছাসেবক বলেন, "আপনারা বরং মালপত্র এখানে রেখে যান, যাবার সময় নিয়ে যাবেন।"

স্টেট লটারির প্রথম পুরস্কার পেলেও বোধ করি এখন এর চেয়ে বেশি খুশি হতাম না। কিন্তু ভয় হচ্ছে দি'মা আবার না আপত্তি করে বসেন। ভয়ে ভয়ে কথাটা বলি তাঁকে। আর আশ্চর্য, তিনিও রাজী হয়ে যান।

স্বেচ্ছাসেবকদের ধন্যবাদ দিয়ে আমরা বেড়া ডিঙ্গিয়ে আবার পথে নেমে আসি। দি'মা আবার আমার চাদর ধরতে চান। হেসে বলি, "চাদর নয়, যা ভিড়, চাদর সমেত হারিয়ে যাবে। আমার হাত ধরো।"

"তাই ভাল বাবা।" দি'মা আমার একখানি হাত ধরেন।

শ্যামাও বাদ যায় না। সে-ও নিঃশব্দে আমার অন্য হাতখানি ধরে চলতে শুরু করে। আমরা হাত-ধরাধরি করে ভিড় ঠেলে এগোতে থাকি।

কোনমতে আমরা মন্দিরের সামনে এসে পৌঁছেছি। এখানেই তিন দিকের তিনটি পথ এসে মিলেছে, আর এখান থেকেই একটি পথ গিয়েছে

মন্দিরপ্রাঙ্গণে। তাই এখানে আর বাঁশ কিংবা কাঠ নয়, কংক্রিট ও লোহার পাইপের বেড়া। যা ভিড়, তাতে বোধ করি এ বেড়াও ভেঙে যাবে।

মন্দিরের দিকে যে পথটি গিয়েছে, তার মুখে তৈরি হয়েছে একটি তোরণ। স্বেচ্ছাসেবকরা সেখানে দাঁড়িয়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করছেন। কিছু যাত্রী প্রবেশ করার পরে একখানি বাঁশ দিয়ে প্রবেশপথ বন্ধ করে দিচ্ছেন। ভেতরের ভিড়টা একটু কমলে পথ খুলে যাচ্ছে। জলস্রোতের মতো পুণ্যার্থীরা প্রবেশ করে মন্দিরপ্রাঙ্গণ পূর্ণ করে ফেলছেন। আবার পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ধাক্কার প্রভাবে প্রবেশ ও প্রস্থান পর্বটি আপনা থেকেই সম্পন্ন হচ্ছে। দর্শন শেষ করতে পারার আগেই পেছনের চাপে সামনের যাত্রীরা মন্দিরের পেছনে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

একে তো তিনটি পথের সঙ্গম, তার ওপরে নিষ্ক্রমণের চেয়ে আগমনের বেগ বেশি। কাজেই তোরণের বাইরে প্রচণ্ড ভিড়। ভীষণ ঠেলাঠেলি। চারদিকেই অসহ্য চাপ। দি'মা ও শ্যামা আমার আড়ালে থেকে চাপমুক্ত হবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। আমার সাধ্য কি ওদের রক্ষা করি! কিন্তু এরকম চলতে থাকলে তো দমবন্ধ হয়ে মারা যাব। অথচ প্রাণ বাঁচাবার জন্য যে পালিয়ে যাব তারও উপায় নেই। এখন সামনে যাওয়া আর পেছিয়ে আসা একই কথা।

"বাবুজী! জ্যারা তাকত কিজীয়ে।"

পাশের দুই বিহারী জওয়ান পরামর্শ দেয়। ওদের কথা শুনে এত কষ্টেও হাসি পাচ্ছে। বলি, "তাকত যে শেষ হয়ে গেছে ভাই!"

কি যেন একটু ভাবে ওরা। তারপরে ওদের একজন আর একজনকে বলে, "মন্নুয়া, তু বুড়ী মাঈকি পিছে যা।" তারপরে সে আমাকে বলে, "বাবুজী, আপ হমারা পিছে আইয়ে।"

সে ধাক্কা দিতে দিতে এগিয়ে চলল আর মন্নুয়া পেছনের ধাক্কার কবল থেকে দি'মাকে রক্ষা করতে থাকল। শ্যামা রয়েছে আমার পেছনে—একেবারে গায়ের সঙ্গে লেগে।

এসে পৌছলাম তোরণদ্বারে। তোরণ বন্ধ। অসহ্য চাপ। চারিদিকের চাপকে একই সঙ্গে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। একটি মিনিট যেন একটি ঘণ্টা। পারিপার্শ্বিক অবস্থা সময়কে দীর্ঘতর করে তোলে।

কিন্তু কোন কিছুই অফুরন্ত নয় এ সংসারে। সুখের মতো দুঃখও নয়

চিরস্থায়ী। তাই একসময় আমাদের প্রতীক্ষার অবসান হল। স্বেচ্ছাসেবকরা বাঁশ সরিয়ে নিলেন। তোরণদ্বার হল উন্মুক্ত। পেছনের চাপে আমরা এগিয়ে চললাম সামনে। প্রবেশ করলাম কপিল-সদনে। মুখে সেই মহামুনির প্রশস্তি—'কপিলমুনিকি…জয়।'

প্রাঙ্গণটি পথের চেয়ে প্রশস্ততর, এখানে চাপ কিছু কম। তবু দাঁড়াবার উপায় নেই। একটু দাঁড়াতে পারলে মন্দিরটা ভাল করে দেখে নেওয়া যেত। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। চলতে চলতেই দেখে নিতে হচ্ছে।

আমরা মন্দিরের সামনে উপস্থিত হলাম। সামনের দিকে ভিতের গায়ে দুদিকে গদাহাতে দুটি মহাবীরের মূর্তি খোদিত। উন্মুক্ত মন্দিরে তিনটি প্রস্তর-মূর্তি। বাঁদিকে গঙ্গা—মকরবাহিনী। হাতে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম। তাঁর কোলে ভগীরথ। ফুট-তিনেক লম্বা ও চওড়া চৌকোণা একখানি পাথরে খোদাই করা মূর্তি। ভক্তদের সিঁদুরে কালো পাথর লাল হয়ে গেছে। পেছনের দেওয়ালে হিন্দীতে লেখা—'শ্রীগঙ্গাজী তথা শ্রীরাজা ভগীরথজী।'

গঙ্গাজীর বাঁয়ে অর্থাৎ মাঝখানে তেমনি সিঁদুর-প্রলিপ্ত কালোপাথরের কপিলমূর্তি। এটিও তেমনি খোদাই করে নির্মিত। তবে আকারে বড়। লম্বায় ফুট-পাঁচেক ও চওড়ায় চার ফুটের মতো। পদ্মাসন করে বসে মালাসহ ডান হাতখানি উঁচু করে আছেন, বাঁ হাতে কমণ্ডলু। পেছনের দেওয়ালে লেখা—'শ্রীকপিলমুনি মহারাজজী'।

কপিলমুনির বাঁদিকে সগর রাজা। একই ভাবে নির্মিত। তবে মূর্তিটি ছোট, ফুট-তিনেকের চেয়ে বড় হবে না। পিছনের দেওয়ালে রঙ দিয়ে হিন্দীতে লেখা—'শ্রীরাজা সগরমহারাজজী'। মন্দিরের সামনে সগরমূর্তির বাঁয়ে একটি ঘণ্টা ঝুলছে। আর কপিলমুনির মূর্তির সামনে কয়েকটি শালগ্রামশিলা ও পুজোর উপকরণ।

এই তিনটি মূর্তিই প্রধান। কিছুকাল আগেও এদের কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হত। মেলার কয়েকদিন আগে পঞ্চায়তী আখড়ার কর্মকর্তারা তাঁদের এখানে নিয়ে আসতেন। আবার মেলার শেষে নিয়ে যেতেন কলকাতায়। কিন্তু কয়েক বছর হল সে নিয়ম উঠে গেছে। এখন মূর্তি এখানেই থাকে। সেই সঙ্গে থাকেন চারজন ব্রহ্মচারী। তবে তাঁদের কথা না ভাবাই ভাল।

মূর্তি তিনটি মন্দিরের যে অংশে স্থাপিত রয়েছে সেটিই গর্ভমন্দির। কিন্তু পেছনে ছাড়া কোনদিকে দেওয়াল নেই। বাকি তিনদিকে কোলাপসিবল

গেট। এখন খোলা। মন্দিরের মেঝে সিমেণ্ট দিয়ে তৈরি। তবে মূর্তি-ত্রয়ের সামনে কয়েকখানি শ্বেতপাথরের টালি বসানো আছে।

কপিলমুনি সগর রাজা ও গঙ্গাজীর জয়ধ্বনিতে আকাশবাতাস মুখরিত। উচ্ছ্বসিত যাত্রীদের সামান্য অংশই মন্দিরের মেঝে স্পর্শ করতে পারছেন। যাঁরা কাছে যেতে পারছেন না, তাঁরা দূর থেকে তাঁদের নৈবেদ্য—ডালা মালা ও টাকা ছুঁড়ে দিচ্ছেন। কোনটি গিয়ে মন্দিরে পড়ছে, কোনটি পড়ছে পথে অথবা যাত্রীদের গায়ে। এতে কেউ কিন্তু ক্ষুব্ধ কিম্বা দুঃখিত হচ্ছেন না। আসল হচ্ছে ভক্তি। ভক্তিপূর্ণ অন্তরে ভক্ত তাঁর ভগবানের উদ্দেশে যে অর্ঘ্য নিবেদন করছেন, তা ঐ প্রস্তরমূর্তির কাছে না পৌঁছলেও ভগবানের চরণে পৌঁছচ্ছে। ভগবান সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বত্র বিরাজমান।

তাহলে এত দুঃখ-কষ্ট সয়ে কেন এসেছি এখানে? আমার চারিপাশের এই অগণিত মানুষ কেন এখানে এসে এমন 'দাও দাও' করছে? তারা তো ঘরে বসেও ভগবানের কাছ থেকে তাঁদের পাওনা বুঝে নিতে পারতেন? কেন দি'মা অমন করুণ কণ্ঠে বার বার বলছেন, "হে বাবা, আমাকে ভক্তি দাও, তোমার চরণে একটু ঠাঁই দাও ঠাকুর!" কেন শ্যামার দু-চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে? কম্পিত স্বরে সে শুধু বলছে, "মা, তুমি তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ কর।" কেন, কেন, কেন?

অন্যমনস্কতার ফল পেয়ে যাই হাতে হাতে। প্রচণ্ড ধাক্কায় প্রায় ছিটকে পড়ি। কোনমতে সামলে নিই নিজেকে। তাড়াতাড়ি ডালা ও মালা ছুঁড়ে দিই। কোথায় গিয়ে পড়ল দেখতে পেলাম না। আবার একটা ধাক্কা এলো, আবার একটা, আবার···

অনেকটা এগিয়ে এসে একটু সামলে নিতে পারলাম। কিন্তু ওরা কোথায় —দি'মা ও শ্যামা? ওরা যে আমার সঙ্গেই ছিল, গেল কোথায়? যাত্রীদের পায়ের নিচে পড়ে যায় নি তো?

না, সেরকম কিছু তো দেখছি না। তবে গেল কোথায়? "দি'মা···শ্যামা ···শ্যামা···দি'মা!" আমি পাগলের মতো চীৎকার করতে থাকি। এত চীৎকারের মধ্যে আমার চীৎকার ওরা শুনতে পাবে কি?

পেয়েছে, শুনতে পেয়েছে, সাড়া দিয়েছে। ওরা দেখতে পেয়েছে আমাকে, ঐ তো আসছে।

দি'মা এসে জড়িয়ে ধরেন আমাকে। ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠেন।

শ্যামারও চোখে জল। ওরা কাঁদছে কেন? আমাকে ফিরে পাবার জন্য?

একটু বাদে দি'মা বলেন, "বাবা কপিলমুনির অশেষ করুণা, তোকে আবার খুঁজে পেলাম।"

মনে মনে ভাবি, কপিলমুনি, তুমি সত্যই করুণাময়। নইলে আজ এমন আন্তরিক স্নেহ, এমন নিষ্কাম ভালোবাসা আমার অদৃষ্টে জুটবে কেন? ধন্য আমার জীবন, আমি আজ মুক্তিতীর্থ কপিল-সদনে এসেছি, এসেছি গঙ্গাসাগরে।

আবার তেমনি করে ওদের দুজনার হাত ধরে এগিয়ে চলি। হঠাৎ নজরে পড়ে দি'মার। বলেন, "এই ছোট মন্দির দুটি কিসের বাবা?"

কপিলমুনির মন্দির ছাড়িয়ে খানিকটা এসে ছোট ছোট দুটি মন্দির। প্রথমটিতে ফুট-তিনেক উঁচু সিঁদুরমাখা বিশালাক্ষী মূর্তি—দেবী সিংহবাহিনী অষ্টভূজা। দ্বিতীয় মন্দিরে বিশালকায় একটি অশ্ব ও ক্ষুদ্রকায় ইন্দ্রমূর্তি।

দি'মা আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠেন, "ও, ইন্দ্র বুঝি সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া এইখানে এনে বেঁধে রেখেছিলেন?"

কি উত্তর দেব? চুপ করে থাকি। শ্যামাও নির্বাক। কিন্তু আমাদের নীরবতার বাঁধ দি'মার উচ্ছ্বাসের বন্যাকে রোধ করতে পারে না। তিনি বলতে থাকেন, "আহা, কত বড় পুণ্যময় স্থান! সার্থক হল আমার জীবন। বাবা কপিলমুনি, তুমি করুণাময়। তোমাকে প্রণাম করি।" দি'মা ঘোড়াটিকে প্রণাম করলেন। ভুলে কি ভক্তিতে বুঝিতে পারছি না।

"এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অযথা ধাক্কা খাচ্ছ কেন? বেলাও যে অনেক হল, ঘরে ফিরতে হবে না?" শ্যামা বলে ওঠে।

ওর ঘরের কথা মনে হয়েছে। তাই হয়। মানুষ ঘরকুনো জীব, কতক্ষণ আর সে ভগবানের জন্য ঘরকে ভুলে থাকতে পারে?

বলি, "চলুন, কিন্তু ওরা কোথায়?"

"কারা?" শ্যামা জিজ্ঞেস করে।

"সেই বিহারী বন্ধুরা, যাঁদের সাহায্য ছাড়া আমরা আজ দর্শন করতে পারতাম না!"

"হ্যাঁ, তাই তো! তাদের যে দেখতে পাচ্ছি না!" শ্যামাও আমার মতো চারিদিকে তাকায়।

কিন্তু কোথায়? এই ভিড়ে কেমন করে খুঁজে পাব তাদের? মনটা ভারী

হয়ে ওঠে। ভারাক্রান্ত স্বরে বলি, "ওরা এত উপকার করল, অথচ ওদের একটা ধন্যবাদ জানাবার পর্যন্ত সুযোগ পেলাম না।"

"ধন্যবাদ দিলে ওদের ছোট করা হত বলেই কপিলমুনি তোমাকে সে সুযোগ দিলেন না গোসাঁই। তবে তিনি নিশ্চয়ই তাদের আশীর্বাদ করেছেন। সার্থক হয়েছে ওদের তীর্থযাত্রা।"

॥ চৌদ্দ ॥

ঘরে ফিরে চলেছি। দি'মা চলেছেন আগে আগে। না, বুড়ীর তাকত আছে বলতে হবে। এই বয়সে এত ধকল সইবার পরেও কেমন জোরে জোরে হাঁটছেন—যেন ছুটছেন! কিন্তু কেন, কেন তিনি এমন জোরে জোরে হাঁটছেন?

ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে ওঠেন দি'মা, "আছে।"

কি আছে বুঝতে পারি না। ভেতরে এসে দেখি তিনি অপত্যস্নেহে মুড়ির টিনটা আঁকড়ে ধরে আছেন। এতক্ষণে তাঁর ছুটে আসার কারণ বুঝতে পারি।

টিন খুলে আরও খুশি হন তিনি। বলেন, "যাক্ বড়ির কৌটোটাও আছে। বাবা কপিলমুনি, তুমি করুণাময়।" হাত জোড় করে প্রণাম করেন দি'মা।

শ্যামা মৃদু হাসছে, বলছে না কিছু।

আমি হেসে বলি, "পাওয়া যখন গেছে, চারটি মুড়ি মেখে দাও দেখি। বড্ড খিদে পেয়েছে।"

খুশিতে ভেঙে পড়েন দি'মা। বাটি বের করে মুড়ি মাখতে আরম্ভ করে দেন, শ্যামাকে বলেন, স্টোভটা ধরিয়ে একটু চা কর না।"

শ্যামা স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চড়ায়। আমি নীরবে মুড়ি-চর্বণ করতে থাকি।

"বাবু!"

"কে?"

"আমি মান্না।"

"ভেতরে এসো।"

মাল্লা ঘরে আসে। বলি, "কি ব্যাপার? কাল কখন নৌকো ছাড়বে?"

"সেই কথাই বলতে এলাম। কাল সন্ধ্যায় নৌকো ছাড়া হবে না।"

"কেন?" আমি কিছু বলতে পারার আগেই শ্যামা চিৎকার করে ওঠে।

"মাঝি বলছেন, আজ বিকেলে ঝড়-বৃষ্টি হবে, কাল সকালেও সাগর শান্ত থাকবে না।"

"বিকেলে শান্ত হবে কি?"

"বাবা কপিলমুনি বলতে পারেন।"

"তার মানে, কালও নৌকা ছাড়া না হতে পারে?" শ্যামা তিক্তস্বরে প্রশ্ন করে।

মাল্লা মাথা নাড়ে।

শ্যামা ক্ষেপে যায়, "তোমার মাঝির দেখছি আলিপুর আবহাওয়া অফিসে কাজ নেওয়া উচিত ছিল।" সে একটু থামে। তারপরে অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে আমাকে বলে, "নৌকার যা অনিশ্চয়তা দেখছি, তাতে আমাকে লঞ্চে যেতে হবে। আর আজ যেতে পারলেই ভাল হয়।"

"আজ!" আমি আঁতকে উঠি। শ্যামা চলে যাবে? সে আজই যেতে চাইছে?

দি'মা এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি। এবারে বলেন, "আজ যাবি কেন? কাল সকালে যা হক্ করা যাবে।"

"না, দিদিমা।" শ্যামা আপত্তি করে। বলে, "সন্ধ্যায় ঝড়-বৃষ্টি হলে, কাল সকালেও রওনা দেওয়া যাবে না। আর আজ যেতে পারলে যে খুবই ভাল হয়। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পৌছবার আগেই আমার আশ্রমে যাওয়া দরকার।"

"কিন্তু আবহাওয়া খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা জেনেও লঞ্চ ছাড়বে কি? ছাড়লেও তাতে বোধ হয় জায়গা পাবেন না।"

"তা পেয়ে যাবেন বাবু।" শ্যামা আমার কথার জবাব দেবার আগেই মাল্লা বলে ওঠে। সে আরও বলে, "ঘাটে গেলেই লঞ্চ পেয়ে যাবেন।"

শ্যামা বলে ওঠে, "না গোসাঁই, আমার মন যখন যেতে চাইছে, তুমি বাধা দিও না, আমাকে যেতে দাও। আমার যাবার ব্যবস্থা করে দাও।"

কি বলব বুঝতে পারছি না। তাকাতেও পারছি না ওর দিকে। আমি

অন্যদিকে চেয়ে চুপ করে থাকি।

দি'মা কথা বলেন, "আজ কি তোর না গেলেই নয় মা?"

শ্যামা নিরুত্তর।

দি'মা আবার বলেন, "ভেবেছিলাম একসঙ্গে ফিরব।"

এবারে কথা বলে শ্যামা। বলে, "আমারও কি সে ইচ্ছে ছিল না দিদিমা, আমারও কি আপানাদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে না!" শ্যামার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। একটু থেমে সে আবার বলে, "তবু আমাকে চলে যেতে হবে।"

আমরা চুপ করে থাকি। শ্যামা চা ছাঁকে। আমাকে চা দিয়ে নিজে এক কাপ চা নিয়ে পাশে এসে বসে। একটু বাদে আমাকে বলে, "কি গোসাঁই, চুপ করে আছ কেন? যাচ্ছি তো কলকাতায়। আবার দেখা হবে।"

কথাটা মিথ্যে নয়, তবু মন মানে না। আসন্ন বিচ্ছেদটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাহলেও আর চুপ করে থাকা ভাল দেখায় না। বলি, "যাবেনই যখন, তখন চলুন একবার ঘাটে গিয়ে দেখা যাক, কি ব্যবস্থা করা যায়।"

চা খেয়ে শ্যামাকে নিয়ে বেরিয়ে আসি বাইরে। মাল্লা চলেছে আমাদের সঙ্গে, তার সব জানা আছে।

বুড়ো মাঝির ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হতেও বা পারে। সকালের সোনালী সূর্য মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। বাতাসের বেগ বেড়েছে। যে কোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে—ঝড় উঠতে পারে।

তাই বলে মেলার মানুষ ঘরে বন্দী হয়ে নেই। তারা ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছে। না বেরিয়েই বা কি করবে? ঘর যে জল-ঝড় কোনটাই ঠেকাতে পারবে না। ঘর যেখানে পথের সামিল, সেখানে ঘরের চেয়ে পথ ভাল।

যাঁরা কোন কারণে সকালে স্নান করতে পারেন নি, তাঁরা এখন স্নান করে নিচ্ছেন। যাঁদের এখনও দর্শন করা হয়ে ওঠে নি, তাঁরা মন্দিরে চলেছেন। যাঁরা কেনাকাটার জন্য মেলায় এসেছেন, তাঁরা দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর যাঁদের কোন কাজ নেই, তারা মেলা দেখছেন—এ দেখার শেষ নেই।

কালো মেঘের ছায়া পড়ছে সাগরে। ঘোলাজল কালো হয়েছে। ফুলে ফুলে উঠছে। সমুদ্র যেন দুলছে, একটা চাপা আক্রোশে গর্জে উঠতে চাইছে। কেন এই আক্রোশ? ক্রুদ্ধ সমুদ্রের মনে কি আছে কে জানে?

"ওখানে অমন করে কে শুয়ে আছে গোসাঁই ?" শ্যামা জিজ্ঞেস করে। ইশারায় দূরের বেলাভূমিতে শায়িত একজনকে সে দেখায়।

একজন উলঙ্গ মানুষ উবুড় হয়ে বালির ওপরে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝেই ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে তার গায়ে। কিন্তু শীতল সমুদ্রজলের সেই উচ্ছ্বসিত আঘাতে তার ঘুম ভাঙছে না।

"কোনদিন আর ওর ঘুম ভাঙবে না।" বলেন একজন যাত্রী। তিনি ওদিক থেকেই এলেন।

"মানে ?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে শ্যামা।

"লোকটি মৃত।" ভদ্রলোক উত্তর দেন, "কোথায় কখন কিভাবে মারা গিয়েছে জানি না। তবে মৃতদেহটা সকাল থেকেই পড়ে আছে ওখানে।"

"সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না কেন ?" আমি বলে উঠি।

ভদ্রলোক হাসেন। বলেন, "সাগরমেলায় মানুষ যে কত মূল্যহীন, হয়তো তাই বোঝাবার জন্য।"

শ্যামা নিরুত্তর। আমারও মুখে কথা যোগায় না। ভদ্রলোক চলে যান। ভেবে চলি ঐ হতভাগ্য মানুষটির কথা। কে সে ? সাধু কি সংসারী ? মারা গিয়েছে, না তাকে মেরে ফেলা হয়েছে ? কেন ? কোন বৈষয়িক বিরোধ ? কোন আদর্শগত সংঘাত ? আচ্ছা, যারা তাকে হত্যা করেছে তারা কি একবারও ভেবে দেখেছে যে মানুষের মঙ্গলের নামে মানুষকে মেরে ফেলা যায় না। তারা কি একবারও ভাবে নি 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

না, ভাবে নি। কারণ পশুত্ব আজ মনুষ্যত্বকে বন্দী করে ফেলেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্বেও মনুষ্যত্ব মুক্তি পাচ্ছে না। তবে একদিন সে মুক্তি-লাভ করবেই। সেই শুভদিনকে স্বাগত জানাই।

"এমন আনমনা হয়ে পড়লে তো চলবে না গোসাঁই, মৃত্যুর চেয়ে যে বড় সত্য নেই এ জগতে।" শ্যামা আমাকে বলে।

"কিন্তু এ তো মৃত্যু নয়, অপমৃত্যু ?"

শ্যামা চুপ করে থাকে। হয়তো বলার মতো কোন কথা পাচ্ছে না খুঁজে। আর তাই সে অমন করে তাকিয়ে আছে সীমাহীন সাগরের দিকে।

কি ভাবছে শ্যামা ? ঐ মৃত মানুষটির কথা, কি বাবাজীর কথা ? এই সাগরে স্নান করার জন্য বাবাজী সমস্ত দৈহিক দুর্বলতাকে অবহেলা করে

সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন। তিনি কি একবারও ভেবেছিলেন, সে যাত্রা তাঁর অন্তিম যাত্রায় পরিণত হবে? সেই মানস-সাগরতীরে বসেই শ্যামা তাঁর শ্রাদ্ধ করবে?

আচ্ছা শ্যামা যে এই শ্রাদ্ধ করল, এতে তাঁর আত্মা মুক্তি পেল কি? আত্মা বলে কি সত্যই কিছু আছে?

নেই। বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্র গম্ভীর গর্জন করে বলে ওঠে—নেই। আত্মা বলে কিছু নেই, স্বর্গ বলে কিছু নেই। দেহ-সর্বস্ব মানুষ আর স্বার্থ-সর্বস্ব জগৎ। তা না হলে কেন মানুষে মানুষে এত হানাহানি? পৃথিবীতে কেন এত স্বার্থপরতা?

"গোসাঁই?"

শ্যামার ডাকে আমার সম্বিৎ ফিরে আসে। ভাবনার সূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি উত্তর দিই, "কি?"

"ঐ দেখো, মাল্লা ফিরে আসছে। সঙ্গে একজন লোক। বোধ হয় কিছু করতে পেরেছে।"

মাল্লা আসে। সঙ্গের লোকটিকে দেখিয়ে বলে, "বাবু, এদের লঞ্চ ডায়মণ্ড-হারবার যাচ্ছে।"

"কখন?"

"ঘণ্টা দুয়েক বাদে, জোয়ার এলেই।" লোকটি উত্তর দেয়।

"কখন পৌঁছবে?"

"রাত একটার মধ্যে পৌঁছে যাব বাবু!"

"তাতে লাভ কি? সকালের আগে তো ট্রেন নেই। সারারাত স্টেশনে বসে থাকতে হবে।"

লোকটি হাসে। বলে, "বাবু, এখন মেলার সময়। সারারাত বাস চলে। ট্রেনও পাবেন। সকালের আগে কলকাতায় চলে যাবেন।"

"আমি তাই যাব।" শ্যামা আমাকে বলে, "তুমি ব্যবস্থা করে দাও।"

"কোন অসুবিধে হবে না, আপনি মালপত্র নিয়ে আসুন।" আমি কিছু বলতে পারার আগেই লোকটি শ্যামাকে ভরসা দেয়।

আমি আর বলবই বা কি! সে-ই তো বলে দিল সব। দু-ঘণ্টা বাদে ওদের লঞ্চ ছাড়বে। শ্যামা সেই লঞ্চে চলে যাবে। দু-ঘণ্টা, আর মাত্র দুটি ঘণ্টা শ্যামা আমাদের সঙ্গে থাকবে। তারপরে?

তারপরে শ্যামা চলে যাবে আমাদের ছেড়ে, সাগরমেলা ছেড়ে, গঙ্গাসাগরের মায়া কাটিয়ে। আর কি কখনও দেখা হবে ওর সঙ্গে?

কেন হবে না? নিশ্চয়ই হবে। শ্যামা যাচ্ছে কলকাতায়। আমি যাব তার আশ্রমে। আবার দেখা হবে আমাদের।

লোকটির হাতে একখানি পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলি, "ভাড়া নয়, আপনার পকেটখরচ। ভাড়া পরে দেব। ভাল জায়গা চাই। ঘণ্টা-দুয়েক বাদে এখানে আসছি।"

নোটখানি পকেটে রেখে নমস্কার করে লোকটি। বলে, "আসুন গে, কোন অসুবিধে হবে না। আমি সঙ্গে থাকব, মা যদি বাসে যান, বাসে তুলে দেব। আর রেলে গেলে রিকশা করে স্টেশনে যাবার ব্যবস্থা করব। রিকশাওয়ালা রেলে ভাল জায়গায় বসিয়ে দেবে।"

খুশিমনে ফিরে চলি ঘরে। মাল্লাও চলেছে আগে আগে। ওকে ছাড়ি নি। সকালে মাল বয়ে ঘাড়টা এখনও ব্যথায় টনটন করছে। ওর সাহায্যেই শ্যামার মালপত্র ঘাটে আনতে হবে।

চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় শ্যামা। সপ্রশ্ন নয়নে আমি তার মুখের দিকে তাকাই। সে জিজ্ঞেস করে, "তুমি তো লেখক?"

"হ্যাঁ।"

চোখ নামিয়ে নেয় শ্যামা। সে আবার চলতে শুরু করে। একটু বাদে বলে, "এই যাত্রার কথা লিখবে?"

"ইচ্ছে আছে।"

"আমার কথা লিখবে?"

"নিশ্চয়ই।"

"কি লিখবে? ভাল কি মন্দ?"

"আপনি যেমন।"

"আমি কেমন?"

"মন্দের ভাল।"

হো হো করে হেসে ওঠে শ্যামা। চারিপাশের লোকের নজর পড়ে আমাদের দিকে। কেউ কেউ বিদ্রূপের দৃষ্টি হানে। কিন্তু শ্যামার সেদিকে নজর নেই। সে হাসতে হাসতেই বলে, "তবু ভাল বলবে না!"

"বললেই বা আপনার কি এসে যাচ্ছে? আপনি যে ভাল-মন্দর বাইরে।"

"আমাকে খুশি করতে চাইছ?''

"না। কারণ সে সাধ্য আমার নেই।"

"তাহলে আমার কথা তুমি কেমন করে লিখবে?" শ্যামা আবার প্রশ্ন করে।

"আপনি যেমন, ঠিক তেমনি করেই লিখব আপনার কথা।"

"তাই লিখো।" শ্যামা ক্ষীণস্বরে বলে, "তাতেই আমি খুশি হব। তোমার লেখা যখন ছাপা হবে, আমি যদি তখন এ জগতে নাও থাকি, তবু সে লেখার কথা জানতে পারব। আর তা জেনে আমার আত্মা শান্তিলাভ করবে।"

একবার ভাবি শ্যামার কথার প্রতিবাদ করি। কিন্তু কেন যেন কিছুই বলতে পারি না। আমি কেবল নীরবে পথ চলি—গঙ্গাসাগরের পথ।

এসে দেখি দি'মা রান্নার পাট চুকিয়ে ফেলেছেন। সেদ্ধ-ভাত হয়ে গেছে।

সব শুনে দিমা শ্যামাকে বলেন, "যাবিই যখন, তখন আর বাধা দিয়ে অমঙ্গল ডেকে আনব না। গোছগাছ করে নিয়ে যা হোক চারটি খেয়ে নে। কখন আবার খাওয়া জোটে মা-গঙ্গাই জানেন'।"

"কিন্তু তাতে আবার কোন দোষ-টোষ হবে না তো?" শ্যামা হেসে বলে।

দি'মা ক্ষেপে ওঠেন, "দোষ! কিসের দোষ? আমি বামুনের বালবিধবা। ভারতের তাবৎ তীর্থ দর্শন করেছি, আমার হাতের রান্না খেলে দোষ! বেয়াদবি করিস নে। যা বলছি, তাই কর্।"

"করছি।" শ্যামা আত্মসমর্পণ করে। সে গোছগাছ শুরু করে দেয়। আমি তাকে সাহায্য করি।

দি'মা ভাত বাড়েন। আমরা খেতে বসি। ঘি দিয়ে গরম-গরম সেদ্ধভাত, ভালই লাগছে।

মাল্লা মালপত্র বের করে। আমরা বাইরে আসি। দি'মাও আমাদের পেছনে ঘর থেকে বের হন। মাল্লার মাথায় জিনিসপত্র চাপিয়ে দিই। সে রওনা হয়ে যায়।

শ্যামা দি'মাকে প্রণাম করতে যায়, তিনি কাঁদতে কাঁদতে তাকে জড়িয়ে ধরেন বুকে। শ্যামাও কাঁদছে।

কেন কাঁদছ? শ্যামা তো কলকাতায় যাচ্ছে। আমরাও দু-এক দিনের মধ্যে ফিরব সেখানে। আবার দেখা হবে তার সঙ্গে। এ বিদায় তো চির-বিদায় নয়! এতে কান্নার কি আছে?

নিশ্চয়ই কিছু আছে। নইলে আমিই বা ঝাপসা দেখছি কেন? আমার চোখ দুটিও হঠাৎ এমন সজল হয়ে উঠল কেন?

চোখ মুছে বলি, "দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ, চল।" শ্যামা দি'মার বুক থেকে মুখ তোলে।

দি'মা তার চোখ মুছিয়ে দেন। শ্যামা চলতে শুরু করে। আমি তার সঙ্গী হই।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, তবু দি'মা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন—বিদায়বেলায় প্রিয়জন যেমন থাকে দাঁড়িয়ে।

আমরা চলি এগিয়ে। বৃষ্টি পড়ছে তবু শ্যামা ধীরে ধীরে হাঁটছে। চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন দেখছে।

কি দেখছে শ্যামা? মন্দির, মেলা, মানুষ?

সবই দেখছে। সে যে বিদায় নিচ্ছে সাগরমেলার কাছ থেকে—শ্রীধাম গঙ্গাসাগর থেকে। তার কতকালের আশা পূর্ণ হল আজ। মকর সংক্রান্তির পুণ্যপ্রভাতে সে সাগরসঙ্গমে স্নান করেছে—অক্ষয় পুণ্যলাভ করেছে। কিন্তু এজন্য তাকে যে হারাতে হল জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ!

শ্যামা যেন কাকে প্রণাম করল।

কপিলমুনিকে কি? এখান থেকে মন্দিরের চূড়াটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

মন্দির ও মেলাকে বাঁদিকে রেখে আমরা ডানদিকে এগিয়ে চলি। একটু বাদে মূলপথ থেকে বেলাভূমিতে নেমে আসি।

ভিড় তেমনি আছে। কাল ছিল আসার ভিড়, সকালে ছিল স্নানের ভিড়, এখন লেগেছে ঘরে ফেরার ভিড়। দলে দলে যাত্রী মালপত্র নিয়ে ছুটছেন। সেই একই আশঙ্কা, একই উৎকণ্ঠা, একই ব্যস্ততা। কোন পরিবর্তন নেই।

পরিবর্তন হয়েছে কেবল প্রকৃতির। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, প্রবল বাতাস বইছে। আমরা চলেছি বাতাসের বিপরীত দিকে। এগোতে কষ্ট হচ্ছে। বার বার শ্যামার আঁচল পড়ছে খসে। শাড়ি সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে সে। মত্তপবন যেন তাকে বলছে—'যেতে নাহি দিব'।

শ্যামা সেকথা শুনছে না। কেউ শোনে না। ঘরের টান যে বড় টান।

আচ্ছা তাই যদি হবে, তাহলে আসা কেন?

না এসেই বা উপায় কি? তখন যে আসার টানটাই প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। স্নান ও দর্শনের পরে সেই টানে ঢিলে পড়তে শুরু হয়েছিল। এখন সেটি একেবারেই নিঃশেষ হয়েছে। আর তার বদলে দেখা দিয়েছে ঘরের টান! মানুষ গৃহে পালিত প্রাণী।

ঝড়ের আশঙ্কায় অনেকে নৌকো নিয়ে গেছে সরিয়ে। তবে জাহাজগুলি যে যার জায়গায় আছে দাঁড়িয়ে। ওদের যে ঝড়ের ভয় নেই। আর ভয় নেই ঐ ডিঙি নৌকোগুলির। ওরাও নির্ভয়ে নিজেদের কাজ করে চলেছে। যাত্রী নিয়ে আসা-যাওয়া করছে মাঝদরিয়ায়—লঞ্চ ও স্টীমারে।

আমাদের দেখে খুশি হয় লোকটি। সে ছুটে এসে নমস্কার করে। জিজ্ঞেস করি, "আপনার লঞ্চ এলো?"

"হ্যাঁ। ঐ যে এসে গেছে।" সে সাগরের দিকে ইশারা করে।

একাধিক লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে। কোন্‌টি ঠিক বুঝতে পারি না। বলি, "কোথায়, কি নাম?"

"ঐ যে 'জয়'। সামনে দাঁড়িয়ে আছে।"

এবারে দেখতে পাই। কাছে গেলে কত বড় দেখব বলতে পারি না। তবে এখান থেকে বড়ই ছোট দেখাচ্ছে। বিক্ষুব্ধ সমুদ্র। ভয় হয়।

কিন্তু আমার ভয় করলে কি হবে? যে যাবে তার ভয় নেই। শ্যামা নির্ভয়ে লোকটিকে জিজ্ঞেস করে, "নৌকো কোথায়?"

সে ইশারায় একখানি ডিঙি দেখিয়ে দেয়। মাল্লা ইতিমধ্যে মাল নিয়ে ডিঙিতে পৌঁছে গেছে। তবু আমি লোকটিকে বলি, "আপনার লঞ্চ যে দেখছি বড্ড ছোট। ভয়-টয় নেই তো!"

"আছে।" সে কোন উত্তর দেবার আগেই শ্যামা হেসে বলে ওঠে, "খুব আছে, ডুবে মরবার ভয়।"

"তাহলে আমি যেতে দেব না।" তার একখানি হাত ধরে ফেলি।

হাতখানি ছাড়িয়ে নেয় না শ্যামা। একটু হেসে শুধু বলে, "তুমি কি পাগল হলে গোসাঁই? শত শত যাত্রী আসা-যাওয়া করছে, এঁরা প্রতিদিন যাচ্ছেন, আসছেন। আর আজ আমি উঠলেই লঞ্চ ডুবে যাবে?"

কথাটা মিথ্যে নয়। তাই চুপ্ করে থাকি। এইবার কথা বলার সুযোগ

পায় লোকটি। সে হেসে বলে, "বাবু, বিশ বছর এ লাইনে আছি। আপনি আমার ওপর ভরসা রাখুন। আপনার কোন ভয় নেই, মাকে আমি ঠিক পৌঁছে দেব।"

শ্যামা হাত ছাড়িয়ে নেয়। শান্তস্বরে ডাক দেয়, "গোসাঁই!"

চমকে উঠি। ওর এমন কণ্ঠস্বর আমি আর কখনও শুনি নি। উত্তর দিতে দেরি হয় আমার।

শ্যামা আবার বলে, "কথা বলছ না কেন? উনি তো কথা দিলেন, আমাকে পৌঁছে দেবেন? তোমার কোন ভয় নেই।"

তবু আমি চুপ করে থাকি।

শ্যামা প্রশ্ন করে, "তুমি আমার ওপর রাগ করেছ গোসাঁই?"

"না। রাগ করব কেন?"

"তোমার কথা না শুনে চলে যাচ্ছি বলে?"

"এতে রাগ করবার কি আছে? দরকার, তাই যাচ্ছেন।"

"সত্যি তাই। তুমি বিশ্বাস কর গোসাঁই, আমার মন বলছে—আজই যাওয়া উচিত।"

লোকটি তাগিদ দেয়, "দেরি করবেন না মা, এর পরে আর জায়গা থাকবে না। তাছাড়া বৃষ্টিটাও বাড়ছে।"

"হ্যাঁ। চলুন।" কিন্তু শ্যামা এগিয়ে আসে আমার কাছে। আমার একখানি হাত ধরে, "আমি তাহলে যাই।"

"আচ্ছা।" কম্পিত কণ্ঠে বলি।

"যা যা বলেছি মনে থাকবে তো?"

"হ্যাঁ।"

"কলকাতায় ফিরে গিয়েই একদিন আমার সঙ্গে দেখা করবে।"

"করব।"

"গঙ্গাসাগর নিয়ে বই লিখলে, আমার কথা লিখবে।"

"লিখব।"

সে আবার বলে, "গোসাঁই, একটা কথা বলে যাই তোমাকে। যারা আমাকে ভাল বলে, তারা বুঝতে পারে নি আমাকে। আর যারা আমাকে মন্দ বলে, তারাও বোধ হয় ভুল করে।"

আমার হাত ছেড়ে দেয় শ্যামা। আঁচল দিয়ে নিজের চোখ দুটি মুছে নেয়।

আর একবার আমার দিকে তাকায়। তারপর সেই লোকটির পিছনে চলতে শুরু করে। আমি কেবল অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি তার দিকে।

শ্যামা জলে নামছে—সাগরজলে।

শ্যামা ডিঙির কাছে চলে গিয়েছে।

শ্যামা নৌকোয় উঠেছে।

শ্যামা তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

নৌকোটা ভীষণ দুলছে। ডুবে যাবে নাকি! চিৎকার করে উঠি।

মাল্লা হাসে। বলে, "ভয় পাবেন না বাবু, ভয়ের কিছু নেই।"

আমি লজ্জা পাই।

নৌকোর যাত্রীরা চিৎকার করে উঠল, "কপিলমুনিকি…জয়, গঙ্গাসাগরকি …জয়, গঙ্গামাঈকি…জয়।"

শ্যামা কি গলা মিলিয়েছে সহযাত্রীর সঙ্গে?

না। শ্যামা শুধু তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

নৌকোটা চলতে শুরু করেছে। শ্যামা ক্রমেই চলে যাচ্ছে দূরে। তার শরীরটা ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

নৌকোটাকে দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি তার যাত্রীদের। কিন্তু শ্যামাকে আর আলাদা করে চিনতে পারছি না। তাহলেও বুঝতে পারছি সে বসে আছে। তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

নৌকো, শ্যামা ও সাগরকে আর আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। ওরা মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। শ্যামা মিশে গেছে সাগরে।

মাল্লার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসি ঘরে। এখনও টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

ঘরে আসতেই দি'মা বলেন, "জামাটা ছেড়ে ফেল্। চাদর গায়ে দিয়ে বস্, আমি চা করছি।"

প্রস্তাবটা ভাল। কাজেই আপত্তি করি না। আমি চাদর মুড়ি দিয়ে দি'মার বিছানায় বসি। সামনে খানিকটা জায়গা ফাঁকা পড়ে আছে। এখানে শ্যামা বিছানা পেতেছিল। শ্যামা নেই—শ্যামা চলে গেছে।

দি'মা চায়ের কাপটা সামনে দিতেই খেয়াল হয় আমার। বলি, "সে কি, শ্যামা তার চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে যায় নি?"

"না।" দি'মা বলেন, "আমি বলেছিলাম কিন্তু শ্যামা রাজী হল না। বলল—তুই চা ভালোবাসিস, তোর অসুবিধে হবে।"

নীরবে চায়ে চুমুক দিই।

দি'মা আবার বলেন, "কেমন লঞ্চ রে? বেশ বড় বুঝি?"

"না। ছোট।" আমি উত্তর দিই।

"ভয়-টয় নেই তো?"

সেই একই প্রশ্ন। আর সে প্রশ্নের উত্তর আমাকেই দিতে হবে এখন। বলি "না।"

"তুই কি লঞ্চ পর্যন্ত গিয়েছিলি?"

"না।"

"তাহলে?"

"আমি পাড়ে দাঁড়িয়েছিলাম।"

"লঞ্চ ছেড়ে দিল বুঝি?"

"না। একটু বাদেই ছাড়বে। বৃষ্টি পড়ছে বলে আমি চলে এলাম।"

"আহা! আর একটু দাঁড়িয়ে থেকে লঞ্চটার ছেড়ে যাওয়া দেখে এলি না!"

"তাতে কি লাভ হত দি'মা?"

"ওরে, সব লাভের কথা কি বুঝিয়ে বলা যায়!" দি'মা বলেন, "লঞ্চটা ভাল ভাবে ছেড়ে গেছে জানতে পারলে ভাল লাগত, এই আর কি।"

শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা সরিয়ে রাখি। স্লীপিং-ব্যাগের ভেতরে ঢুকে শুয়ে পড়ি। বড্ড শীত পড়েছে। ঘরে এখনও জল পড়ছে না, তবে আর একটু জোরে বৃষ্টি নামলেই ঘর-বার এক হয়ে যাবে। রাতে কি অদৃষ্টে আছে কে জানে! হয়তো বসে বসে ভিজতে হবে। এখন একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

দি'মা নিজের বিছানায় এসে বসেন। চলা-ফেরা করতে আর অসুবিধে হচ্ছে না। ঘরে এখন অনেক জায়গা। শ্যামা নেই।

দি'মা আবার কথা বলেন, "ওকে এভাবে একা একা ছেড়ে দেবার আমার একদম ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কোন্ অধিকারে আমি ওকে ধরে রাখব? আমি যে ওর কেউ নই!"

আমিও সেই কথাই ভাবছি। ধরে রাখার ইচ্ছে আমারও হয়েছিল।

কিন্তু কেমন করে রাখি ? আমারও তো সে অধিকার নেই।

শ্যামার ভাবনার মাঝে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে পড়ছে না। একটা আকস্মিক আর্তনাদে ঘুম ভেঙে যায়।

"বাবু! বা…বু ঘরে রয়েছেন ?"

"কে ?" ধড়মড় করে উঠে বসি।

"আমি মাল্লা বাবু।" সে ভেতরে আসে। পাগলের মতো চীৎকার করে ওঠে, "সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

"কি, কি হয়েছে ?" দি'মা বলে ওঠেন।

"কি হয়েছে মাল্লা ?" আমি বলি।

"বাবু!" মাল্লা বলে, "বাবু, লঞ্চটা ডুবে গেছে।"

"অ্যাঁ!" দি'মা কেঁদে ওঠেন।

"তুমি কি বলছ মাল্লা ? কোন্ লঞ্চ ?"

"হ্যাঁ বাবু, যে লঞ্চে মা-ঠান যাচ্ছিলেন।"

"জয় ?"

"হ্যাঁ বাবু, জয়। জয় ডুবে গেছে। বাবু…" মাল্লা আর কিছু বলতে পারে না, সে কাঁদতে থাকে।

কাঁদতে কাঁদতে দি'মা বলে ওঠেন, "ওরে তুই এখনও শুয়ে আছিস্, চল্ গিয়ে দেখি, কি হয়েছে ?"

তাই তো, শুয়ে রয়েছি কেন ? মাল্লা বলছে, শ্যামার লঞ্চ ডুবে গেছে। কোথায় ডুবেছে, কখন ডুবেছে, কেমন করে ডুবেছে ? যাত্রীরা বেঁচে আছে তো ? শ্যামা ? শ্যামা কেমন আছে ? তাকে যে নিয়ে আসতে হবে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসি। টর্চটা হাতে নিয়ে মাল্লাকে বলি, "চল।"

মাল্লা ঘর থেকে বের হয়। আমি দরজার কাছে আসি।

দি'মা কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "ওরে, তুই আমাকে এখানে রেখে কোথায় যাচ্ছিস ?"

"সাগরতীরে।"

"আমি যাবো।"

"সন্ধ্যে হয়ে গেছে, বৃষ্টি পড়ছে। এর মধ্যে তুমি সেখানে গিয়ে কি করবে! তার চেয়ে বরং তুমি ঘরে থাক। স্টোভে জল চড়াও, আমি তাকে

নিয়ে আসছি।''

"না বাবা, তুই আমাকে নিয়ে চল্। এ খবর শুনে একা ঘরে থাকলে, আমি দমবন্ধ হয়ে মারা যাব। আমাকে তুই একা ফেলে যাস নে বাবা।'' দি'মা আমার একখানা হাত ধরেছেন।

আর নিষেধ করতে পারি না। বলি, "চল।"

আমার হাত ধরে দি'মা বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। পড়ে থাকে তাঁর মালপত্র, বড়ির কৌটো আর মুড়ির টিন। একবার ফিরেও তাকান না ঘরের দিকে। আমাদের সঙ্গে এগিয়ে চলেন তিনি।

"কখন ডুবেছে মাল্লা ?"

''ঠিক করতে পারব না বাবু। তবে সবাই বলছে, ছাড়ার ঠিক পরেই। সেই সঙ্গে কয়েকখানা নৌকোও ডুবে গেছে।"

"কেমন করে ডুবল বলতে পার ?"

"ঠিক জানি না বাবু। তবে অনেকেই বলছেন, বেশি লোক নেবার জন্য।...এখন কি হবে বাবু! মা-ঠানের যদি কিছু হয় ?" মাল্লা আবার কেঁদে ফেলে। আমি চুপ করে থাকি।

"ওরে খোকা, একটু পা চালিয়ে চল্ বাবা। এই শীতে সে ভিজে কাপড়ে বসে আছে।" দি'মা আমাকে তাগিদ দেন।

অবাক হয়ে যাই। পথে পর্যাপ্ত আলো নেই। তার ওপর টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, প্রবল বাতাস বইছে। কিন্তু দি'মার যেন পথ চলতে কোন কষ্ট হচ্ছে না। তিনি রীতিমত ছুটছেন। বাধ্য হয়ে আমাদেরও ছুটতে হয়। আর কথাটা তো মিথ্যে নয়। এই শীতে ভিজে কাপড়ে সাগরতীরে বসে থাকা সত্যই কষ্টকর। শ্যামার কষ্ট হচ্ছে।

চেঁচামেচি ও কান্নাকাটিতে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। পুলিস আর স্বেচ্ছাসেবকরা ইতস্তত ছুটোছুটি করছেন। আনন্দমেলায় নিরানন্দের ছায়া নেমেছে। জলের কাছে ভীষণ ভিড়। দি'মাকে নিয়ে আর এগোনো অসম্ভব। বলি, "তুমি এখানে বসো।"

"ওরে, সত্যি সত্যি কি সেই লঞ্চটাই ডুবে গেছে ?"

"সবাই তো তাই বলছে।"

"শ্যামা, আমার শ্যামা কি বেঁচে আছে ?"

কেমন করে আমি তাঁর এ প্রশ্নের উত্তর দেব! আমারও যে এই একই

প্রশ্ন। আমি চুপ করে থাকি।

"কথা বলছিস না কেন? সে কি বেঁচে আছে? ওরে তার যদি কিছু হয়, আমি কি বলব সবাইকে? আমি যে তাকে বাধা দিই নি, জোর করে ধরে রাখি নি? বাবা কপিলমুনি, এ তুমি কি করলে বাবা! তুমি এত নিষ্ঠুর! ঠাকুর তুমি তাকে ফিরিয়ে দাও। আমি সামনের বছর আবার তাকে নিয়ে গঙ্গাসাগরে আসব, তোমার পূজো দেব। আমার শ্যামাকে তুমি ফিরিয়ে দাও ঠাকুর।"

"তুমি একটু শান্ত হও দি'মা। আমি যাচ্ছি, তার খোঁজ পেলেই তোমাকে খবর দেব।"

"তাই দিস বাবা। তাকে একবার চোখে না দেখতে পারলে যে আমি শান্ত হতে পারছি নে।"

"তাকে আমি তোমার কাছে নিয়ে আসছি দি'মা। তুমি এখানে একটু বসো।"

"তাই আসিস বাবা। আমি এখেনে বসছি। আমি তার পথ চেয়ে বসে থাকব, যতক্ষণ সে না আসে, ততক্ষণ বসে থাকব। তুই যা বাবা, তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে আয় আমার কাছে।"

আমি ভিড় ঠেলে জলের ধারে আসি। একজন পুলিস অফিসার বলছেন, "আপনারা সরে যান, এই জায়গাটা খালি করে দিন।"

জলপুলিসের লঞ্চে করে কয়েকজন উদ্ধারপ্রাপ্ত যাত্রীকে নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের একে একে তীরে আনা হচ্ছে। প্রায় প্রত্যেকেই অচৈতন্য। আমি টর্চ জ্বেলে ওদের দেখি। না, নেই। শ্যামা নেই ওদের মাঝে।

কাউকে যে কিছু জিজ্ঞেস করব, তারও উপায় নেই। একে তো ওরা সবাই ব্যস্ত, তার ওপর নানা জনের প্রশ্ন অস্থির করে তুলছে তাঁদের।

হঠাৎ নজর পড়ে বিভূতির দিকে। সে ডাক্তার। তাকে তো আসতেই হবে এখানে। এত দুঃখের মধ্যেও ওকে দেখে হাসি পাচ্ছে আমার। কাল সাধু সেজে মেলায় ভিক্ষে করেছে, আর আজ ডাক্তার হয়ে যাত্রীদের সেবা করছে।

অনেক কষ্টে এগিয়ে আসি বিভূতির কাছে। বলি, "কি ব্যাপার বল্ তো?"

"আর বলিস নে। অদৃষ্ট মন্দ হলে যা হয়। সারাটা দিন ভাল কেটে,

দিনের শেষে এই দুর্ঘটনা !"

"কিন্তু ঘটল কেমন করে ?"

"প্রথম কারণ অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাই। দ্বিতীয় কারণ হঠাৎ জোয়ার আসায় আশেপাশে নৌকোর মাঝিরা ভয় পেয়ে ঐ লঞ্চের সঙ্গে নৌকো লাগায়। নৌকোর যাত্রীরা প্রাণভয়ে একসঙ্গে লঞ্চে উঠতে চায় আর লঞ্চের সারেং ঠিক তখুনি লঞ্চ দেয় ছেড়ে। লঞ্চখানি দুলতে থাকে। কাত হয়ে পড়ে। যাত্রীরা চিৎকার করতে থাকেন। লঞ্চ ডুবে যায়।"

"লঞ্চে কতজন যাত্রী ছিলেন ?"

"তা কম করেও শ' ছয়েক।''

"তাঁদের কি হয়েছে ?"

"অনেকেই মারা গেছেন। তবে লঞ্চখানাকে ডুবে যেতে দেখে জলপুলিসের একটি লঞ্চ ও কয়েকখানি ডিঙি নৌকো ছুটে গিয়েছিল। যে সব যাত্রীরা তাড়াহুড়ো করে ঐ সব নৌকো কিংবা লঞ্চে উঠতে পেরেছেন, তাঁরা বেঁচে গেছেন। এখন পর্যন্ত ২১৯ জন যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে আর মৃতদেহ পাওয়া গেছে বিশটা। বহু লোক ভেসে গেছে।...কিন্তু তুই এখানে কেন ?"

আমি তাকে শ্যামার কথা বলি।

সব শুনে বিভূতি জিজ্ঞেস করে, "ভদ্রমহিলা সাঁতার জানতেন ?''

"না।''

"তাহলে বোধ হয় আর নেই।'' নির্বিকার কণ্ঠে বিভূতি উত্তর দেয়। ওরা ডাক্তার, নির্দয় নয় তবে নিষ্ঠুর সন্দেহ নেই।

আমি চুপ করে থাকি। বিভূতি বলে, "এ পর্যন্ত যে কটি মৃতদেহ আনা হয়েছে, তা সবই শিশু ও মেয়েদের। তবে আর খানিকক্ষণ দেখ্।''

"সরে যান, আপনারা সরে যান।'' সেই পুলিস অফিসার চিৎকার করছেন।

স্বেচ্ছাসেবক ও জলপুলিস কর্মীরা আরও কয়েকজন যাত্রীকে বয়ে নিয়ে আসছেন। এরা কি মৃত না জীবিত ?

না, নেই। শ্যামা নেই ওদের মাঝে। আমার পা কাঁপছে। সারা শরীর টলমল করছে। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। আমি বসে পড়ি।

সাগরে সূর্যোদয় হচ্ছে– গঙ্গাসাগরে যেখানে আমার দেশের মাটি হয়েছে শেষ। সেই স্বর্বণ গোলকখানি অতল সাগরের বুক চিরে একটু একটু করে উঠে আসছে ওপরে—ঠিক কালকের মতো। কাল লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সঙ্গে আমিও প্রণাম করেছিলাম তাঁকে। শ্যামা ছিল আমার সঙ্গে। সে সূর্যসাক্ষী রেখে স্বামীর শেষ কাজ সম্পন্ন করেছিল। আর আজ?

আজ সূর্যোদয় হচ্ছে, কিন্তু শ্যামা নেই। হ্যাঁ, শ্যামা নেই। আমি সারারাত তাকে খুঁজে বেড়িয়েছি। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। পাই নি—শ্যামাকে খুঁজে পাই নি আমি। শ্যামা নেই।

সূর্য আছে, সাগর আছে—শ্যামা নেই। মন্দির আছে, মেলা আছে—শ্যামা নেই। মানুষ আছে, আমি আছি—শ্যামা নেই। সব আছে—শ্যামা নেই।

না, আছে···শ্যামা আছে। সে মিশে আছে ঐ প্রভাতরবির কিরণে, এই অসীম সাগরের তরঙ্গে আর গঙ্গাসাগরের মাটিতে। সে রয়েছে তার প্রাণ-পুরুষের পাশে।

—শেষ—

এই লেখকের

(গিরি-কান্তার)

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা

পুণ্যতীর্থ-প্রভাস

(পঞ্চপ্রয়াগ)

(গহন-গিরি-কন্দরে)

(রাজভূমি-রাজস্থান)

(মানালীর-মালঞ্চে)

(চতুরঙ্গীর অঙ্গনে)

তমসার তীরে তীরে

মন-দ্বারকায়

(গোরো পাহাড়ের পাঁচালি)

(লীলাভূমি লাহুল)

(কেঁদুলীর মেলায়)

মধু-বৃন্দাবনে (ব্রজপর্ব, বনপর্ব ও মহাবনপর্ব)

(গঙ্গা-যমুনার দেশে)

। কৃতজ্ঞতা স্বীকার ।

শ্রীদেবকীনন্দন দে, শ্রীবিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য, শ্রীতপন চৌধুরী, ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ